প্রথম সংস্করণ :
আশ্বিন, ১৩৬৭ :

প্রকাশক :
ডি. মেহ্‌রা
রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী
১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা-১২
৯৪ সাউথ মালাকা, এলাহাবাদ-১
১১ ওক্ লেন, ফোর্ট, বোম্বাই-১

প্রচ্ছদশিল্পী :
গণেশ বসু

মুদ্রক :
মনোতোষ পোদ্দার
শশধর প্রিন্টিং ওয়ার্কস
১৩/১ হায়াৎ খাঁ লেন
কলকাতা-৯

প্রজাপতি জীবন

খ্যাতিমান লেখক সেবাস্তিয়ানের মৃত্যু হল। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল তাঁর জীবনী-রচনার কাজ। কিন্তু উপাদান সংগ্রহ—সে যে এক দুরূহ ব্যাপার! ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত ছিন্নভিন্ন সূত্রগুলি থেকে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে লাগল হারানো-কাহিনী—আশ্চর্য সুন্দর এক প্রণয়-কাহিনী। সুচিত্রিত ডানা মেলে, কোমল দ্যুতি ছড়িয়ে যেন উড়ে ফিরতে লাগল এক চঞ্চল প্রজাপতি।

নায়ক সেবাস্তিয়ান নাইট-এর সেই রোমান্টিক জীবন-কাহিনী রচনা করলেন তাঁরই বৈমাত্রেয় ভাই। কি আশ্চর্য, রচনা শেষে দেখা গেল নায়ক আর জীবনীকার কখন হয়ে গেছেন একাত্ম আর অভিন্ন!

॥ এক ॥

আমার জন্মভূমির প্রাক্তন রাজধানীতে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ৩১শে ডিসেম্বর সেবাস্তিয়ান নাইটের জন্ম। কোনো এক বৃদ্ধা রাশিয়ান মহিলা প্যারিসে একবার আমাকে তাঁর অতীত দিনের রোজনাম্‌চাটা দেখতে দিয়েছিলেন। কিন্তু কোনো রহস্যজনক কারণে তিনি তাঁর নাম প্রকাশ করতে বারণ করেছিলেন। এই বছরগুলো ঘটনার দিক থেকে এতোই নিঃস্ব (অবশ্য আপাত দৃষ্টিতে) ছিল যে, দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি কুড়িয়েও (আত্মসংরক্ষণের এ এক অতি দীন কৌশল!) নিত্যকার আবহাওয়া বিবরণের সীমিত আয়তনটা ছাপিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে।

সৌভাগ্য ব্যাপারটাই একটা অঘটন, তাই এই বৃদ্ধার রোজনাম্‌চায় অভাবিতই এমন কিছু পেয়ে গেলাম যা আমি সন্ধানের কোনো নির্দিষ্ট সূত্র ধরে আবিষ্কার করতে পারতেম না। তাই আমার পক্ষে বলা সম্ভব হোলো যে, সেবাস্তিয়ানের জন্মের সেই নির্মেঘ প্রভাতে বায়ুর বেগ ছিল না, আর তাপমাত্রা ছিল শূন্যেরও প্রায় বারো ডিগ্রী নীচে (রয়মার স্কেলে)। শুধু এই বিবরণটুকুকেই ভদ্রমহিলা টুকে রাখার যোগ্য বিবেচনা করেছিলেন।

যে পাঠকের দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নেই তাঁর পক্ষে বোঝা শক্ত এই দিনটার এই বর্ণনার অন্তরালে লেখিকার কী খুশির ইঙ্গিত রয়ে গেছে। কল্পনা করুন, মেঘচিহ্নহীন আকাশ যেন নিছক বিলাস, দেহে তাপ সঞ্চার করার জন্য নয়, সে শুধুই নয়ন রঞ্জনের উদ্দেশ্যে আবির্ভূত। তুষার-কঠিন পথ কেটে শ্লেজ গাড়ী চলে গেছে, সেই কাটার দাগ ঝক্‌ঝক্ করছে পথের ওপর। চওড়া রাজপথের মাঝ বরাবর তুষারের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ঘোড়ার নাদ মিশে

তাতে এক ধরনের বাদামী রঙের আভাস এনেছে। এপ্রন-পরা ফেরিওয়ালার হাতে রঙিন খেলনা বেলুনের গুচ্ছ। গম্বুজের ঘের যেন আলতো করে আঁকা, আর ধূলোর মতো কুয়াশার আস্তরণ তার সোনার বর্ণকে আবছা করে দিয়েছে। শহরের সাধারণ বাগানের বার্চগাছগুলো সবচেয়ে ছোটো ছোটো ডালপালাকেও শাদা শাদা রেখায় সুস্পষ্ট করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। শীতের যানবাহনের ঘর ঘর আর টুংটাং শব্দ। সে এক বিচিত্র অনুভূতি! কোনো পুরোনো পোস্টকার্ড ছবির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে (স্মৃতির শিশুটাকে কিছুক্ষণের জন্যে ভোলাবার উদ্দেশ্যে এমনি একখানা ছবিওলা পোস্টকার্ড আমি টেবিলে ফেলে রেখেছি) মনে পড়ে রাশিয়ান ঘোড়ার গাড়ীর সেই এলোমেলো, যখন যেদিকে-খুশি মোড় ফেরা। আমার সামনে এই রঙিন ফটোগ্রাফে আধুনিক কালের যানবাহনের সোজা সরলরেখায় আত্মসচেতন গতির বদলে চোখে ভেসে উঠ্‌ছে স্বপ্নের মতো ছড়ানো এক পথে অনেক "দ্রাস্কি" গাড়ী, যার যেদিকে খুশি সেদিকে মুখ, আর, এ সবের মাথার ওপর অবিশ্বাস্য রকম নীল আকাশ। এই নীল আকাশ আবার দূরে আপনা থেকেই ম্লান হয়ে মিলিয়ে গেছে, স্বাদহীন স্মৃতির উদ্রেকে ঈষৎ গোলাপী গালের আভায়।

সেবাস্তিয়ান যে বাড়ীটায় জন্মেছিলেন সেই বাড়ীটার ছবি সংগ্রহ করতে না পারলেও আমি সেটাকে বিলক্ষণ চিনি, কারণ তাঁর জন্মের ছ'বছর পরে আমি নিজেই সেই বাড়ীতে জন্মেছি। আমাদের বাবা এক। সেবাস্তিয়ানের মায়ের সঙ্গে বাবার বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবার পর তিনি আবার বিয়ে করেন। আশ্চর্য! মিঃ গুড্‌উইন তাঁর 'সেবাস্তিয়ান নাইটের ট্র্যাজেডি' বইয়ে (এ বই ১৯৩৬-এ প্রকাশিত হয়, বিভিন্ন উপলক্ষে বিস্তারিতভাবে আমি এই বইয়ের উল্লেখ করব) এই দ্বিতীয় বিবাহের কোনো উল্লেখই করেননি। ফলে ঐ বইয়ের পাঠকদের কাছে আমার কোনো অস্তিত্বই থাকতে পারে

না। এরা আমাকে সেবাস্তিয়ানের জাল আত্মীয় আর প্রগ্‌লভ প্রতারক বলে মনে করতে পারে। কিন্তু, সেবাস্তিয়ানের যে বই আত্মজীবনীর সবচেয়ে কাছাকাছি সেই 'হারানো সম্পত্তি'তে সেবাস্তিয়ান নিজেই আমার মায়ের সম্বন্ধে কিছু সপ্রশংস বিবরণ লিপিবদ্ধ করে গেছেন। আমার ধারণা, আমার মা তাঁর এই প্রশংসার সম্পূর্ণ যোগ্য ছিলেন।

সেবাস্তিয়ানের বাবা ১৯১৩য় ডুয়েল লড়তে গিয়ে মারা যান—এই মর্মে সেবাস্তিয়ানের মৃত্যুর পর ব্রিটিশ সংবাদপত্রে যে সংবাদ পরিবেশিত হয় তা সম্পূর্ণ সত্য নয়। আসলে, যখন গুলির আঘাত সবে নিরাময় হয়ে আসছে, তখন, ঘটনার প্রায় পুরো এক মাস পরে হঠাৎ তাঁর ঠাণ্ডা লাগে। তাঁর অর্ধেক সেরে-ওঠা ফুস্‌ফুস্‌ এই আক্রমণ সামলে উঠ্‌তে পারেনি।

আমাদের বাবা ছিলেন সাহসী সৈনিক, দিলখোলা মানুষ, রসিক ও আত্মমর্যাদা সচেতন। তাঁর চরিত্রে অভিযাত্রী সুলভ যে চরত্ব ছিল লেখক সেবাস্তিয়ান তা পেয়েছিলেন উত্তরাধিকারসূত্রে। যখনই আমি তাঁর বই খুলে বসি তখনই মনশ্চক্ষে দেখতে পাই—আমাদের বাবা যেন ঝড়ের বেগে ঘরে ঢুকছেন তাঁর বিশেষ ভঙ্গীতে দরজার দুপাল্লা সজোরে ঠেলে দিয়ে। মনে পড়ে, ঘরে ঢুকেই তিনি যা খুঁজছেন বা যাকে খুঁজছেন তা বা তাকে দেখতে পেয়েই ছোঁ মেরে টেনে নিচ্ছেন।

তাঁর উপস্থিতির প্রথম অভিজ্ঞতাটা ছিল সব সময়েই যেমন শ্বাস-রোধকারী তেমনি হতচকিত করে দেওয়া—হঠাৎ মেঝে থেকে উঠে গেছি শূন্যে, খেলার ট্রেনটার অর্ধেকটা ঝুলছে আমার হাতে, আমার মাথাটা ওপরে দোদুল্যমান আলোর ঝাড়টা ছুঁই ছুঁই—যেমন ছোঁ মেরে আমাকে তোলা তেমনি ধপ করে হঠাৎ নামিয়ে দেওয়া। যেন সেবাস্তিয়ানের গদ্য—পাঠককে হঠাৎ উপ্‌ড়ে নিয়ে গিয়ে পর মুহূর্তেই পরবর্তী উদ্দাম অনুচ্ছেদের মস্করার মাটিতে দুম্‌ করে

ফেলে দেওয়া। বাবার কিছু কিছু মস্করা নাইটের 'কালোরঙের আলবিনো' 'মজার পাহাড়' ইত্যাদি বিশিষ্ট রচনায় বিচিত্রভাবে পুষ্পিত হয়ে উঠেছে।

যতদূর জানি, বিদেশে, সম্ভবত ইতালিতে, ছুটি ভোগের অবসরে বাবার সঙ্গে ভার্জিনিয়া নাইটের দেখা। তিনি তখন যুবক, সেনাবাহিনীতে কাজ করেন। নবম দশকের প্রথম দিকে রোমে একটা শৃগাল শিকার অভিযানের সময়ে তাঁদের দুজনের প্রথম দেখা। ভার্জিনিয়ার সঙ্গে তাঁর কোর্টশিপ পর্বটা বেশ দীর্ঘ। ভার্জিনিয়া ছিলেন এডওয়ার্ড নাইটের পুত্রী। এডওয়ার্ড নাইট ছিলেন সম্পন্ন অভিজাত ব্যক্তি। তাঁর সম্বন্ধে আমি এর বেশী জানি না। তবে, আমার কড়ামেজাজী, একগুঁয়ে ঠাকুমা (তাঁর হাতপাখা, দস্তানা আর ফ্যাকাসে হিম আঙুলগুলো আমার এখনো মনে আছে!) তাঁদের এই বিয়েতে প্রবল বাধা দিয়েছিলেন। এমন কি, বাবার দ্বিতীয় বিয়ের পরও তিনি তাঁর আপত্তির কথা সোচ্চারে উল্লেখ করতেন। এর থেকে আমার মনে হয়েছে যে, নাইট পরিবার আভিজাত্যের মাপে রুশিয়ার ওল্ড রেজিম বা পুরোনো রাজতন্ত্রের প্রচলিত মানটা ছুঁতে পারেনি। বাবার প্রথম বিয়েও তাঁর নিজের সামরিক বাহিনীর ঐতিহ্যের সঙ্গে খাপ খেয়েছিল বলে মনে হয় না। তাঁর সামরিক জীবনের সাফল্য শুরু হয় মাত্র জাপানীযুদ্ধের সময়ে তাঁর প্রথমা স্ত্রীর থেকে বিচ্ছেদের পর।

আমার বাবার যখন মৃত্যু হয় তখনও আমি শিশু। অনেক দিন পরে ১৯২২এ আমার মা তাঁর শেষ ও চরম অস্ত্রোপচারের পর আমাকে এমন কতকগুলো বিষয় জানিয়ে গিয়েছিলেন যা তাঁর মতে আমার জানার প্রয়োজন ছিল। বাবার প্রথম বিয়ে সুখের হয়নি। তাঁর প্রথমা স্ত্রী ছিলেন অদ্ভুত-প্রকৃতির, অস্থির চিত্ত, হঠকারিণী। তবে, তাঁর অস্থিরতা বাবার অস্থিরতা থেকে

জাতে আলাদা। বাবার অস্থিরতায় ছিল অবিরাম এক সন্ধান; কোনো লক্ষ্যে উপনীত হবামাত্রই তাঁর এই সন্ধান অপর এক লক্ষ্যের দিকে ধাবিত হোতো। অপরদিকে, তাঁর প্রথমা পত্নীর অস্থিরতার মূলে যে সন্ধান ছিল তা যেমন দ্বিধাগ্রস্ত, বিশৃঙ্খল তেমনি লক্ষ্যহীন। তিনি লক্ষ্যকে কখনো পাশে ফেলে দূরে সরে যেতেন, কখনো বা সেটা ভুলেই যেতেন। যেমন করে ট্যাক্সীর যাত্রী ভুলে ছাতা ফেলে আসে গাড়ীতে। বাবার প্রতি তাঁর একটা চলনসই ধরনের টান ছিল—কখনো আছে, কখনো নেই। ফলে, একদিন যখন তাঁর ধারণা জন্মাল যে তিনি অন্য পুরুষে আসক্তা হয়েছেন (এই পরপুরুষের নামটা আমার বাবা কোনোদিন জানতে পারেননি) অমনি তিনি তাঁর স্বামীপুত্রের বাঁধন থেকে টুপ্ করে খসে পড়ে, যেমনটি আগে ছিলেন তেমনটি হয়ে গেলেন। জলপাই পাতা যেমন নিচু হয়ে বৃষ্টির ফোঁটাকে গা বেয়ে গড়িয়ে যেতে দেয়, তারপর উজ্জ্বল ফোঁটার ভারটা যেই ঝরে পড়ে অমনি গাঝাড়া দিয়ে খাড়া হয়ে ওঠে। তেমনি তিনি হাল্কা হয়ে খাড়া হয়ে উঠলেন বটে, কিন্তু আমার বাবা পেলেন তীব্র আঘাত। প্যারিসের হোটেলের সেই দিনটার স্মৃতির ওপর আমার মন বসতে চায় না। সেই দিনের সেই ঘটনা: নার্সের তত্ত্বাবধানে চার বছর বয়সের সেবাস্তিয়ান, হতচকিত; নার্স নিজেই বিভ্রান্ত তাই শিশুর প্রতি তেমন নজর নেই। বাবা তাঁর ঘরে বন্ধ। আর সে কী ঘর! এই ধরনের হোটেলের ঘর যেন জগতের সবচেয়ে মর্মন্তুদ নাটক অভিনয়ের সেরা রঙ্গমঞ্চ। বিচিত্র তার সরঞ্জাম: অগ্নিকুণ্ডের ওপরকার তাকে কাঁচের ঘেরাটোপের ভেতর বার্নিস করা ঘড়িটা বন্ধ (মোম দিয়ে পালিশ করা গোঁফ-জোড়ার মতো দুটো কাঁটা দুটো বাজতে দশে অচল); জানালায় মসলিন আর কাঁচের মাঝখানে এলোমেলো কাটা-পর্দা। হোটেলের নাম ছাপা কয়েকখানা চিঠি লেখার

কাগজ পড়ে আছে ব্লটিং প্যাডের ওপর। ব্লটিং প্যাড্টার ওপর অনেক কালির দাগ। এটা 'কালো রঙের আলবিনো' থেকে উদ্ধৃত বর্ণনা। এই বর্ণনাটা সেই বিশেষ পরিস্থিতির সঙ্গে অক্ষরে অক্ষরে হয়তো মিলবে না; কিন্তু এই বিবরণের মধ্যে বিধৃত হয়ে আছে একটি শিশুর আব্ছা অতীত স্মৃতির আভাস। হোটেলের বিবর্ণ কার্পেটে ঘ্যান্ঘ্যেনে একটি শিশু। সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়। সময়ও অদ্ভুত একটা ব্যাপ্তিতে আড়ষ্ট। সময় যেন পথ হারিয়ে, মুখ থুবড়ে, হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে।

দূর প্রাচ্যের যুদ্ধ আমার বাবাকে তাঁর মনোমতো কাজ জুগিয়ে দিয়ে ভার্জিনিয়াকে ভুলতে না হলেও নতুন করে বাঁচতে সাহায্য করেছিল। তাঁর পৌরুষের একটা দিক ছিল প্রবল আত্মাভিমান এবং এই আত্মাভিমান তাঁর উচ্ছল প্রকৃতির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে খাপ খেয়ে গিয়েছিল। আত্মহত্যা দূরে থাক্, কোনো চিরস্থায়ী দুঃখ বয়ে বেড়ানো তাঁর কাছে নিশ্চয়ই খুব হীন ব্যাপার কিংবা নির্লজ্জ পরাজয় বলে মনে হোতো। তাই ১৯০৫এ আবার যখন বিয়ে করলেন তখন ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে জিতেছেন ভেবে নিশ্চয়ই আত্মপ্রসাদ অনুভব করে থাকবেন।

১৯০৮এ ভার্জিনিয়ার পুনরাবির্ভাব ঘটল। বেড়ানোর নেশায়-পাওয়া মানুষ, অনবরত চলমান, ছোট হোক বড় হোক সব রকম হোটেলেই তাঁর ঘরের আরাম। তাঁর কাছে ঘরের আরাম মানে সব সময়ে বদলে বেড়ানোর সুখ। সেবাস্তিয়ান উত্তরাধিকারসূত্রে তাঁর কাছ থেকে পেয়েছিলেন শ্লিপিং কোচ আর গ্রেট ইউরোপীয়ান এক্স্প্রেস্ ট্রেনের প্রতি তাঁর অদ্ভুত, প্রায় রোমান্টিক আকর্ষণ। "নীলছায়ামগ্ন রাত্রিতে গাড়ীর মসৃণ দেওয়ালের গায়ে কাঠের ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজ; ঘুমের ঘোরে আন্দাজ করা স্টেশনে দীর্ঘশ্বাসের মতো ব্রেক কষা ট্রেনের শব্দ; জানালায় চিত্রবিচিত্র চামড়ার পর্দা উঁচু করে তুলে প্লাটফর্ম দেখা;

মালভর্তি হাতগাড়ি ঠেলে-নিয়ে যাওয়া মানুষ, দুধের মতো শাদা গোল বাতি আর তার চারপাশে চক্কর দেওয়া আলোর পোকা; চাকা পরীক্ষায় অদৃশ্য হাতুড়ির ঘা, অন্ধকারে মসৃণবেগে গড়িয়ে যাওয়া; আলো জ্বালা কামরায় চকিতে দেখা ছবি: সীটের নীল পুরু কাপড়ের ওপর একাকিনী কোনো মহিলার ট্রাভেলিং ব্যাগটা খুলে ভেতরে রূপোর মতো ঝক্ঝকে জিনিসগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখা।" এটা সেবাস্তিয়ানেরই বর্ণনা।

একদিন শীতের মধ্যে আগে থেকে কোনো কিছু না জানিয়েই নর্থ-একস্‌প্রেসে এসে ছোট্ট একটা চিরকুট পাঠিয়ে তিনি তাঁর ছেলের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। বাবা সেদিন বনশূয়োর শিকারে বেরিয়েছেন দূর গ্রামাঞ্চলে। আমার নিজের মা তাই কাউকে কিছু না বলে সেবাস্তিয়ানকে একটা হোটেলে নিয়ে হাজির করলেন। ভার্জিনিয়া এখানে উঠেছিলেন। এখানে হলঘরে মা তাঁর স্বামীর প্রথমা স্ত্রীকে দেখলেন। ছিপ্‌ছিপে গড়ন শরীরটা সম্পূর্ণ পূরন্ত নয়, কোথাও কোথাও ভাঁকচুরগুলো স্পষ্ট। প্রকাণ্ড কালো টুপির নিচে ছোট্ট একটা থরথর করে কাঁপা মুখ। মুখের ওপর পাতলা ঘোমটাটাকে ঠোঁটের ওপর পর্যন্ত তুললেন ছেলেকে চুমু খেতে। ঠোঁট দিয়ে তাকে ছুঁতে না ছুঁতেই ডুক্‌রে কেঁদে উঠলেন। যেন এই বালকের কোমল গণ্ডেই তাঁর সব দুঃখের উদ্ভব আর অবসান।

মুহূর্ত পরেই দস্তানা পরে নিলেন। তারপর কোন্ একদিন 'ডাইনিং কারে' কে একজন পোলিশ স্ত্রীলোক কেমন করে তাঁর ভ্যানিটি ব্যাগটা চুরি করার চেষ্টা করেছিল সেই অপ্রাসঙ্গিক তুচ্ছ ঘটনাটাকে ফলাও করে বলতে শুরু করলেন মাকে। ভুল ফরাসীতে। তারপর সেবাস্তিয়ানের হাতে চিনিমোড়া বেগুনে রঙের মেঠাইয়ের একটা ছোট্ট প্যাকেট গুঁজে দিয়ে, মায়ের দিকে একটা উদ্‌ভ্রান্ত হাসি ছড়িয়ে কুলির পিছু পিছু বেরিয়ে গেলেন। কুলিটা ইতিমধ্যেই

তাঁর মাল তুলে নিয়েছিল হাতে। ব্যস্ এখানেই শেষ! পরের বছরেই মারা যান।

আমার বাবা-মা ছিলেন সুখী দম্পতি। তাঁদের দাম্পত্য জীবনে সরসতা ও শান্তি উভয়ই ছিল। এই শান্তি কুৎসাতেও বিঘ্নিত হয়নি। আমাদের কিছু আত্মীয় পরিজন এই নিয়ে কানা-ঘুষা আলোচনা করতেন যে, আমার বাবা নাকি অনুরক্ত স্বামী হওয়া সত্ত্বেও মাঝে মাঝে অন্য স্ত্রীলোকে আসক্ত হয়ে পড়তেন। ১৯১২র ক্রীশমাসের কাছাকাছি একদিন তাঁর পরিচিতা এক দায়িত্বজ্ঞানহীনা সুন্দরী তরুণী নেভা নদীর তীর ধরে তাঁর সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে কথায় কথায় বলে ফেলে তার (এই তরুণীর) ভগিনীর প্রণয়ী কে এক 'পালচিন' তাঁর প্রথমা স্ত্রীকে চিন্তো। বাবা বলেছিলেন লোকটাকে তাঁর মনে ছিল। ওর সঙ্গে "বিয়ারিজ" শহরে বছর নয় দশ আগে তাঁর আলাপ।

মেয়েটা বলল, "তাই নাকি! কিন্তু অনেক পরেও পালচিনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল। আমার বোনের কাছে তিনি বলেছিলেন যে, আপনার বিচ্ছেদ ঘটার পরও তিনি ভার্জিনিয়ার সঙ্গে ছিলেন। এরপর, একদিন সুইজারল্যাণ্ডের কোনো এক জায়গায় ভার্জিনিয়া তাঁকে ছেড়ে চলে যান……অবাক কাণ্ড! এ ব্যাপারটা কিন্তু কেউ জানতো না!"

শান্ত স্বরে বাবা বললেন, "ব্যাপারটা যদি তখন জানাজানি না হয়ে থাকে তো, বছর দশেক পরে এই ব্যাপারটা নিয়ে লোকের মুখরোচক আলোচনার কী প্রয়োজন থাকতে পারে তা বুঝি না!" অদৃষ্টের ক্রুর ষড়যন্ত্রে ঠিক এর পরের দিনই কাপ্তেন বেলভ নামে আমাদের এক পারিবারিক বন্ধু কথাচ্ছলে বাবাকে জিজ্ঞাসা করে বসলেন, তাঁর প্রথমা স্ত্রী অস্ট্রেলিয়ান ছিলেন কী না। কাপ্তেন বরাবর ভেবে এসেছিলেন উনি ইংরেজ মহিলা। বাবা উত্তর দিলেন, উনি যত দূর জানতেন, ভার্জিনিয়ার মা বাবা কিছুদিন 'মেলবোর্নে' ছিলেন বটে

কিন্তু তাঁর জন্ম ইংলণ্ডের 'কেণ্টে' ; তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করে বসলেন : "কিন্তু, হঠাৎ একথা জিজ্ঞাসা করার মানে ?" কাপ্তেন প্রসঙ্গটাকে পাশ কাটিয়ে যাবার চেষ্টায় বললেন, "তাঁর স্ত্রী একদিন কোন্ পার্টিতে গিয়ে কাউকে কিছু একটা বলতে শুনেছিলেন……"

বাবা দৃঢ়স্বরে ঘোষণা করলেন, "এই কিছু বলাটাকে বন্ধ করতে হবে !"

পরের দিন সকালে তিনি পালচিনের সঙ্গে দেখা করলেন। পালচিন তাঁকে মাত্রাতিরিক্ত সম্ভ্রমের সঙ্গে অভ্যর্থনা করে বললেন, বহু বছর বিদেশে কাটানোর পর পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় তিনি কৃতার্থ।

বাবা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললেন : "একটা কুৎসিত কুৎসা ছড়িয়ে পড়ছে ! আমার ধারণা ব্যাপারটা ঠিক কী তা আপনি জানেন !"

পালচিন উত্তরে বলেন "দেখুন, আপনি কী বলছেন তা না বোঝার ভান করে কোনো ফায়দা নেই। লোকে এই নিয়ে কথা বলাবলি করছে, এটা অবশ্য আফসোসের কথা। কিন্তু, এই ব্যাপার নিয়ে খামোকা আমাদের মেজাজ খারাপ করার কী কারণ থাকতে পারে ? আপনি আর আমি একদিন একই ক্ষুরে মাথা কামিয়েছি ! এটা একটা ঘটনামাত্র ! তাতে কার কী দোষ বলুন ?"

"ব্যাপারটা যদি তাই-ই হয়, তাহলে ডুয়েলের জন্যে তৈরী থাকুন, আমার সাক্ষীরা এসে আপনার সঙ্গে দেখা করবে !"

মায়ের কাছ থেকে শোনা গল্পটা থেকে আমি এইটুকু বুঝেছিলেম যে. পালচিন ছিলেন নির্বোধ আর স্থূল প্রকৃতির (মা দুজনের কথোপকথনকে যেভাবে উদ্ধৃত করে বলেছিলেন আমি প্রায় সেই রকমভাবেই বিবৃত করেছি) কিন্তু পালচিন নির্বোধ ও স্থূল প্রকৃতির ছিলেন বলেই আমার পক্ষে এটা বোঝা খুব শক্ত কেন বাবা এর সঙ্গে বিরোধে নেমে তাঁর জীবনকে বিপন্ন করেছিলেন। সে কি ভার্জিনিয়ার সম্মান রক্ষার জন্যে কিংবা নিজের প্রতিশোধ স্পৃহাকে

তৃপ্ত করতে? ভার্জিনিয়া তাঁকে পরিত্যাগ করায় তাঁর সম্মান ডুবে গিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু দ্বিতীয় পরিণয়ের পরিতৃপ্তিতে তাঁর প্রতিশোধ বাসনার বিলুপ্তি ঘটা উচিত ছিল অনেক আগেই। কিংবা এতকাল যা একটা নিরীহ অস্পষ্টমুখ ভৌতিক সত্তার মতো ভাসাভাসা ছিল তাই কি একদিন হঠাৎ একটা নাম পেয়ে গেল? একটা মুখ পেয়ে গেল? কিংবা এই অস্পষ্ট ভূতুড়ে অনুভব নিজস্ব একটা কিম্ভূত-কিমাকার চেহারা পেয়ে গেল? বিগত দিনের এ প্রতিধ্বনির (ধ্বনি যতই স্পষ্ট কণ্ঠের হোক প্রতিধ্বনি মাত্রই ভাঙা ভাঙা) মধ্যে কী এমন ধার ছিল যার ঘায়ে একটা পরিবার চুরমার হয়ে গেল, ঘটে গেল আমার মায়ের সর্বনাশ?

একদিন শীতে জমে যাওয়া একটা ছোট্ট নদীর ধারে তুষার ঝড়ের ভেতর এই ডুয়েল লড়াইটা ঘটে গেল। দুটো গুলি ছোঁড়া হতেই বাবা মুখ থুবড়ে সামনে পড়ে গেলেন বরফের ওপর ছড়িয়ে পড়া নীলচে ছাই রঙের একটা মিলিটারি কোটের ওপর। কাঁপা হাতে পালচিন একটা সিগারেট ধরালেন। কাপ্তেন বেলভ গাড়োয়ানদের ডাকলেন। ওরা কিছুদূরে বরফডোবা পথে সসম্ভ্রমে অপেক্ষা করছিল। এই বীভৎস ব্যাপারটা ঘটতে সময় লাগল মাত্র তিন মিনিট!

সেবাস্তিয়ান তাঁর 'হারানিধি' বইয়ে জানুয়ারির এই আবছা দিনটার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। "এই ঘটনার পূর্বাভাস কেউই পায়নি; না আমার সৎমা, না পরিবারের অন্য কেউ। সেদিন সন্ধ্যায় ডিনারে বসে বাবা আমার দিকে রুটির গুলি পাকিয়ে পাকিয়ে ছুঁড়ে মজা করছিলেন। ডাক্তারবাবু আমাকে সঙের মতো একটা উলের জামা পরতে বাধ্য করেছিলেন বলে সারাদিন আমি ব্যাজার হয়ে ছিলেম। তাই তিনি আমার গোমড়ামুখ ভাবটা ভেঙে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর এই কৌশলে কোনো কাজ হোলো না। মুখ লাল করে কপাল কুঁচকে ঘাড় ফিরিয়ে গোঁজ হয়ে বসে রইলেম আমি।"

॥ দুই ॥

গুড্ম্যান তাঁর যেন তেন প্রকারেণ লেখা, ভুলেভরা সেবাস্তিয়ানের জীবনচরিতে তাঁর বাল্যজীবনের একটা হাস্যকর ভুল ছবি এঁকেছেন কতকগুলো যেমন-তেমনভাবে বাছাই করা বাক্য জুড়ে জুড়ে। লেখকের সেক্রেটারী হওয়া এক কথা, আর তাঁর জীবন-চরিতকার হওয়া আর এক। সদ্য মাটিচাপা কবরের ওপর ছড়ানো ফুলগুলোকে জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে যে কদিন বাঁচিয়ে রাখা যায় সেই কদিনের মধ্যে তাড়াহুড়ো করে জীবনচরিত লিখে বাজারে বের করা এক ব্যাপার, আর বাজারের আগ্রহের সঙ্গে তাল রেখে, সততা, পরিণত বুদ্ধি এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান একত্রে মেলানো সম্পূর্ণ আর এক ব্যাপার।

বালক বয়সের সেবাস্তিয়ানকে আমার মনে আছে। আমার চেয়ে ছ'বছরের বড়, বেশ জমকালো একটা কেরোসিন ল্যাম্পের নরম আলোয় জলরঙে তুলি ভিজিয়ে খেলা করছেন। এই বাতিটার গোলাপী রঙের ঢাকাটা যেন তাঁরই ভিজে তুলি দিয়ে আঁকা। ছবিটা এখনো আমার স্মৃতিপটে জ্বল্‌জ্বল্ করছে। মনে আছে নিজে আমি তখন বছর চার পাঁচের। শরীরটাকে টেনে, খুঁড়িয়ে উঠে, আমার সৎ দাদার কনুইয়ের আড়ালে যে রঙের বাক্সটা সেটা দেখার চেষ্টায় ছট্‌ফট্ করছি। চট্‌চটে লাল আর নীল রঙের দলাগুলোকে ব্রাশ দিয়ে মেড়ে মেড়ে খাল করে দেওয়া হয়েছে। সেই মসৃণ খালগুলো থেকে আলো ঠিক্‌রে বেরোচ্ছে, যেন এনামেল থেকে। সেবাস্তিয়ান যতবার টিনের ঢাকনিটার গায়ে রঙ মেশাচ্ছেন ততবারই খুট্‌খুট্ আওয়াজ উঠ্‌ছে, আর তাঁর সামনে জলের গ্লাস আশ্চর্য রঙে রঙে ঘোলা হয়ে যাচ্ছে। মাথায় কালো চুল ছোটো ছোটো করে

ছাঁটা, গোলাপী লাল স্বচ্ছ স্বচ্ছ কানের ঠিক ওপরেই আঁচিলের মতো একটা চিহ্ন (ইতিমধ্যে আমি একটা চেয়ারে উঠে দাঁড়িয়েছি—কিন্তু আমার দিকে তাঁর নজর নেই)। হেঁট হয়ে তাঁর বাক্সের সবচেয়ে গাঢ় নীল রঙের ছোট্ট বরফিটায় থাবা মারবার চেষ্টা করতেই তিনি কাঁধের এক ঝট্‌কায় আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন। ব্যস্‌, ঐ পর্যন্তই! ঘাড় না বেঁকিয়ে আগের মতোই নীরব রয়ে গেলেন, আমার উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে। তিনি চিরদিন আমার থেকে এমনি দূরেই রয়ে গিয়েছিলেন। মনে আছে, আমি সিঁড়ির রেলিংএর ওপরে ঝুঁকে দেখছি, স্কুলের ছুটির পর সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌ছেন। পরনে কালো রঙের ইউনিফর্ম; কোমরে চামড়ার বেল্‌ট; (এই বেল্‌টটার প্রতি আমার একটা সুপ্ত লোভ ছিল।) ধীরে ধীরে উঠে আসছেন। থপ্‌থপ্‌ করতে করতে, পিঠে রঙ্‌বেরঙের কাপড়ের ব্যাগটাকে বয়ে। কখনো রেলিংয়ের গায়ে হাত বুলোচ্ছেন, কখনো হঠাৎ দু'তিনটে সিঁড়ি টপ্‌কে আসছেন এক লাফে। আমি ঠোঁট দুটো গোল করে মুখ থেকে একদলা থুথু ফেলে দিই। থুথুর দলাটাকে বরাবরই নীচে পড়তে দেখতাম, কোনোদিন সেটা সেবাস্তিয়ানের গায়ে পড়েনি। আসলে ওঁকে উত্যক্ত করবো বলে থুথু ফেলতেম না। থুথু ফেলার উদ্দেশ্য ছিল আমার দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা। আমার মনোগত এই বাসনা কিন্তু বরাবরই ব্যর্থ হয়ে গেছে। আর একটা ছবি আমার মানসপটে স্পষ্ট রয়ে গেছে। সেবাস্তিয়ান একটা নীচু হ্যান্‌ডেলওলা বাইসাইকেলে চড়েছেন আমাদের গ্রামের বাড়ীর বাগানের একটা পথে। পথের ওপর ছায়ায় ছোপ্‌-ছোপ্‌ আলোর দাগ। সেবাস্তিয়ান ধীরে ধীরে ঘুরপাক খাচ্ছেন। প্যাডেল দুটো স্থির আর আমি কখনো তাঁর পিছন পিছন হাঁটছি কখনো ছুট্‌ছি। যেই চটিপরা পা দিয়ে প্যাডেলে চাপ দিচ্ছেন অমনি আমার বেগ বাড়ছে। পিছনের চাকা সাঁ সাঁ ফট্‌ফট্‌ করে চলেছে। আর তার সঙ্গে তাল রেখে আমি ছুটেছি।

তবু তিনি আমার দিকে নজর দিচ্ছেন না। তারপর, আমাকে অনেক পিছনে রেখে হঠাৎ সাঁ করে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে ধরতে গিয়ে আমার দম ফুরিয়ে এল, তবু আমি পিছু পিছু ছুটছি তো ছুটছিই।

উনি যখন ষোল আর আমি দশ, তখনো উনি মাঝে মাঝে আমাকে পড়া বুঝিয়ে দিতেন বটে, কিন্তু এতো অসহিষ্ণু হয়ে, এতো তাড়াতাড়ি বোঝাতেন যে তাঁর এই সাহায্যে কোনো উপকারই হোতো না আমার। কিছুক্ষণ পরে পেন্সিলটা পকেটে পুরে ঘর ছেড়ে টক্‌টক্ করে বেরিয়ে যেতেন। এই সময়েই তিনি বেশ ঢ্যাঙা হয়ে উঠেছেন, রঙটা একটু ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে, ওপরের ঠোঁটের গায়ে কালো একটা রেখা দেখা দিয়েছে। মাথার ওপর চুলের মাঝ বরাবর টেরী। চক্‌চক্ করছে তার দুপাশ। এই সময় তিনি একটা কালো রঙের খাতায় কবিতা লিখতেন। এই খাতাটাকে রেখে দিতেন নিজের দেরাজে চাবিবন্ধ করে।

একবার এই চাবি রাখার জায়গাটার সন্ধান পাই। (তাঁর ঘরে শাদা রঙের ডাচ স্টোভটার কাছে দেওয়ালের একটা ফাটলে চাবিটা থাকতো)। দেরাজটা খুলেও ছিলাম।

দেরাজে একটা খাতা, তাঁর স্কুলের এক বন্ধুর বোনের একখানা ফটো, কয়েকটা মোহর, আর মসলিনের একটা ছোট্ট ব্যাগে বেগুনি রঙের শুকনো একটা মিঠাই। কবিতাগুলো ইংরেজীতে লেখা। আমাদের বাবার মৃত্যুর অনেক আগে থেকেই বাড়ীতে আমাদের ইংরেজী তালিম আরম্ভ হয়েছিল এবং যদিও আমি এই ভাষায় কোনোদিনই স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারলেম না তবু সেই সময়েই আমি এই ভাষায় সহজে লিখতে ও পড়তে পারতেম। ভাসা ভাসা মনে আছে। কবিতাগুলো খুবই রোমান্টিক ধাঁচের। ঘোর রঙের গোলাপ, তারা আর সমুদ্রের ডাকে ঠাসা। একটি কবিতা আমার স্মৃতিতে স্পষ্ট উজ্জ্বল হয়ে আছে। প্রত্যেক কবিতার নিচে দস্তখতটা

অদ্ভুত ধরনের। দাবা খেলার ছোট্ট ঘোড়ার আকারের একটা চিহ্ন, কালো কালি দিয়ে আঁকা।

১৯১০ (প্রথম জ্ঞানোন্মেষের সময়) থেকে ১৯১৯ (যে বছর সেবাস্তিয়ান ইংলণ্ডে চলে গেলেন) পর্যন্ত আমার বাল্যজীবনের যে কাল সেই কালে দাদার যতটুকু দেখেছিলেম তাই সাজিয়ে গুছিয়ে একটা সুষম ছবি তৈরি করার চেষ্টা করেছি মাত্র। মাত্র চেষ্টাই করেছি, সফল হতে পারিনি। এই ছবিটা আমার কাছে এসেছে মাত্র কয়েকটা ঝল্‌মলে টুক্‌রোতে। মনে হয় উনি যেন আমাদের পরিবারের কোনো স্থায়ী পরিজন নন। উনি যেন অপ্রত্যাশিত কোনো অতিথি। আলো ঝলমল ঘরের মধ্য দিয়ে ওঁকে একবার যেতে দেখা গেল, তারপর বহুদিনের মতো বিলীন হয়ে গেলেন অন্ধকার রাত্রির গহ্বরে। এর কারণ এই নয় যে, আমি আমার শৈশবের খেয়ালে ছিলেম বলে তাঁর সঙ্গে কোনো সম্পর্কে সজ্ঞানে ঘনিষ্ঠ হতে পারিনি। উনি না ছিলেন সঙ্গী হবার মতো বয়সে আমার কাছাকাছি, না ছিলেন গুরু হবার মতো বয়সে বড়। আসল কারণ সেবাস্তিয়ান সব সময় আমার থেকে মানসিক দূরত্বে বিরাজ করতেন। এই দূরত্বের ফলে, আমার তরফ থেকে যথেষ্ট টান থাকলেও, আমার সেই টান তাঁর দৃষ্টিতে পড়েনি কিংবা তাঁর তরফ থেকে কোনো সাড়া জাগায়নি। আমি হয়তো তাঁর বলার ধরন, হাসির ধরন, এমন কি হাঁচির ধরনের বর্ণনা করতে পারি, কিন্তু এই সব দিয়ে যে ছবি তৈরী হবে মূল নাটকটার সঙ্গে তার কোনো যোগাযোগ থাকবে না। কাঁচি দিয়ে কাটা সিনেমা ফিল্মের বিচ্ছিন্ন টুক্‌রো দিয়ে তৈরী একটা ছবি হবে মাত্র।

সেবাস্তিয়ান তাঁর মাকে কোনোদিন ভুলতে পারেননি। কোনোদিন ভুলতে পারেননি যে তাঁর মা-ই বাবার মৃত্যুর কারণ। আমাদের পরিবারে কোনোদিন তাঁর মায়ের নাম উল্লেখ করা হোতো না। এর ফলে তাঁর কোমল মন স্মৃতির যে মোহে মগ্ন

ছিল, সেই মোহে ধরে ছিল এক ধরনের রুগ্নতা। তিনি কোনোদিন সুস্পষ্টভাবে তাঁর মাকে তাঁর বাবার দাম্পত্য জীবনের অংশীদাররূপে স্মরণ করতে পারতেন কিনা তা আমি জোর করে বলতে পারিনে। হয়তো, এই স্মৃতিটা তাঁর জীবনের পশ্চাদ্‌পটে একটা স্নিগ্ধ দীপ্তির মতো ছড়িয়ে ছিল। ন'বছর বয়সে মায়ের সঙ্গে দেখা হলে তাঁর চিত্তে কী ধরনের অনুভূতি জেগেছিল তা বলতে পারিনে। আমার মা বলেছেন, সেদিন তাঁকে দেখা গিয়েছিল আনমনা, নির্বাক। পরে কোনোদিনই তিনি অসম্পূর্ণতার বেদনায় টাটানো সেই ক্ষণস্থায়ী সাক্ষাৎকারের কথাটা উচ্চারণ করেননি। তাঁর 'হারানিধি' বইয়ে সেবাস্তিয়ান তাঁর দ্বিতীয় বিবাহে সুখী পিতার প্রতি ঈষৎ তিক্তকষায় মনোভাবের ইঙ্গিত দিয়েছেন বটে, কিন্তু যেদিন তিনি পিতার মরণদ্বন্দ্বের মূল কারণ জানতে পারলেন সেদিন থেকে এই তিক্ততা মুগ্ধ আরতিতে পরিবর্তিত হয়ে গেল। সেবাস্তিয়ান লিখছেন: "আমার নতুন করে আবিষ্কার করা এই ইংলণ্ড আমার গোপনে লালিত স্মৃতিতে যেন নতুন জীবন সঞ্চার করলে"...

"কেমব্রিজ পর্ব শেষ করে আমি কন্টিনেণ্টে বেড়াতে বেরিয়ে পড়ি। এই সময়ে মণ্টিকারলোতে দিন পনেরো নিরিবিলিতে কাটালেম। শুনেছিলেম ওখানে একটা জুয়োর আড্‌ডা আছে, কিন্তু তার সঙ্গে আমার কোনো পরিচয় ঘটেনি। কারণ, ঐ সময়ে আমি আমার প্রথম উপন্যাস রচনায় ব্যস্ত। উপন্যাসটায় নতুন কিছু করার উচ্চাশা ছিল, কিন্তু আমার পরবর্তী বই যতজন পাঠকের অভিনন্দন পেয়েছে আমার এই প্রথম উপন্যাস প্রায় ততজনই প্রকাশকের প্রত্যাখ্যান পেয়েছে। একদিন অনেক দূর বেড়াবো বলে বেরিয়ে হাঁটতে হাঁটতে 'রোকেব্রুন' বলে একটা জায়গায় এসে পৌঁছলেম। এই জায়গায় প্রায় তেরো বছর আগে আমার মা মারা গিয়েছিলেন। বাবা যেদিন আমাকে মায়ের মৃত্যু সংবাদ দিলেন সেই দিনটার কথা আমার মনে আছে। যে ছোট্ট হোটেলটায় তিনি

মারা যান তার নামও স্মৃতিতে আছে। এর নাম ছিল 'লে ভায়োলেতে' অর্থাৎ 'ভায়োলেতফুলের গুচ্ছ'। গাড়ীর ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলেম সে বাড়ীটা চেনে কিনা। সে বললে, না। তারপর একজন ফলওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করতে সে রাস্তাটা দেখিয়ে দিলে। অবশেষে একটা বেগুনি রঙের ছোট্ট বাড়ীতে এসে পৌছলেম। প্রভাঁস অঞ্চলের বিশেষ আকারের লাল টালি ছাওয়া বাড়ী। গেটের ওপর অপটু হাতে একগুচ্ছ 'ভায়োলেত' ফুল আঁকা। তাহলে এই সেই বাড়ী! বাগান পেরিয়ে গিয়ে বাড়ীউলির সঙ্গে কথা বললেম। তিনি জানালেন আগের মালিকের কাছ থেকে এই সেদিন তিনি হোটেলটা কিনেছেন, তাই আগেকার কোনো ঘটনাই তিনি জানেন না। বাগানে কিছুক্ষণ বসে থাকার অনুমতি চেয়ে নিলেম তাঁর কাছ থেকে। দেখলেম উপরে ঝুলবারান্দায় এক বুড়ো দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার শরীরের যতটা দেখা গেল তার সবটাই আদুড়। সে ছাড়া আর কেউ নজরে পড়ল না। একটা প্রকাণ্ড ইউক্যালিপটাস গাছের নিচে নীলরঙ্-করা একখানা বেঞ্চিতে বসে পড়লেম। গাছটার গায়ের প্রায় আধখানায় কোনো ছাল নেই। এই জাতের গাছের এটাই দস্তুর। ভাবতে চেষ্টা করলেম—মা যখন এখানে ছিলেন তখন এই বেগুনি রঙের বাড়ীটা, এই গাছটা আর এই গোটা জায়গাটা দেখতে কেমন ছিল। মায়ের ঘরের জানালাটা চিনে বের করতে পারলেম না বলে মনটা খুঁতখুঁত করল। বাড়ীটার নাম থেকে অনুমান করলেম: আমার সামনে এই ঘোর লাল রঙের ফুলের কেয়ারিটা ঠিক আজকের মতোই তাঁর চোখের সামনে হাজির ছিল সেদিন। ধীরে ধীরে অনুভবের এমন একটা স্তরে পৌছে গেলেম যে, মুহূর্তের জন্যে এই বেগুনি আর সবুজ দূরে ঝিলমিল করতে করতে চোখের ওপর ভাসতে রইল। যেন কুয়াশার ঘোমটা ভেদ করে দেখছি এই বর্ণবিলাসকে। মায়ের আবছা ছোট্ট দেহটা মাথায় একটা প্রকাণ্ড টুপি পরে সিঁড়ি বেয়ে ধীরে ধীরে উঠছে। উঠতে

উঠতে মিলিয়ে গেল। যেন জলের মধ্যে মিলিয়ে গেল। হঠাৎ নিজের ভেতরে একটা ধাক্কা খেয়ে সংবিৎ ফিরে পেলেম। আমার কোলের ওপর কাগজের যে ঠোঙাটা ছিল তার থেকে একটা কমলালেবু গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। কমলাটাকে কুড়িয়ে বাগান থেকে বেরিয়ে এলেম। এর কয়েক মাস পরে লণ্ডন শহরে মায়ের ভাই সম্পর্কের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। কথায় কথায় তাঁকে বললেম মায়ের মৃত্যুর জায়গাটা আমি দেখে এসেছি। উনি শুনে বললেন, "তাই নাকি! কিন্তু সে তো অন্য 'রোকেব্রুন'! 'ভার' অঞ্চলের এক জায়গা!"

অদ্ভুত ঠেকে যখন এই অংশটাকে উদ্ধৃত করে গুডম্যান মন্তব্য করেন ঃ

"সেবাস্তিয়ান নাইট সংসারের সবকিছুর হাস্যকর ও লঘু দিকটায় এমনভাবে মজে ছিলেন এবং তাদের কেন্দ্রগত যে গুরুত্ব সেই গুরুত্ব উপলব্ধি করতে এমনি অক্ষম ছিলেন যে, স্বভাবের দিক থেকে সিনিক না হয়েও, মানুষের গভীরতম আবেগ নিয়ে তামাশা করতেন। যে সব অনুভূতি অন্য সব মানুষের কাছে সচরাচর পবিত্র অদৃশ্য বলে মান্য, সেগুলোই ছিল তাঁর তামাশার খোরাক।" এই গুরু গম্ভীর জীবনচরিতকার তাঁর নায়কের জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনার তাৎপর্য যে ধরতে পারেননি এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। সেবাস্তিয়ান যদি কোনো উপন্যাসের চরিত্র হতেন তাহলে তাঁকে কোনো একটা ছকের শৃঙ্খলার মধ্যে আট্‌কানো যেতো, কিন্তু তিনি তা নন বলে তাঁর বাল্যজীবনের কোনো ধারাবাহিক বর্ণনা দিতে পারলেম না। কেন পারলেম না তা আগেই বলেছি। সেবাস্তিয়ান যদি কোনো কাহিনীর চরিত্র হতেন তাহলে তাঁর বাল্য থেকে যৌবন পর্যন্ত জীবনক্রমকে একটা ঘটনাধারার স্বচ্ছন্দ বিকাশরূপে চিত্রিত করে পাঠককে তথ্য ও আনন্দ দুইই বিতরণ করতে পারতেম। সেবাস্তিয়ানকে নিয়ে এই ধরনের প্রচেষ্টায় নামলে আমিও আর

একটা "রোমান্টিক" জীবনচরিত লিখে ফেলতে পারি। **প্রসঙ্গত** বলে রাখি যে এই ধরনের রম্যরসাক্রান্ত জীবনচরিত নিকৃষ্টতম সাহিত্য। তাই, বন্ধ থাক দরজা, দরজার নিচে সরু সুতোর মতো আলোর একটা শীর্ণ রেখাই দেখা যাক। 'নেভা' নদীর তীরে মনোহরণ জলপাই সবুজ বাড়ীটার সীমারেখা ধূসর নীল কুয়াশায় বিলীন হয়ে যাক। দীর্ঘকায় ল্যাম্পপোস্টের খর জ্যোৎস্নার মতো আলোয় টুক্‌রো টুক্‌রো পাতের মতো তুষার ঝরতে থাকুক। আর, আমার বাবার ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে আসা বারান্দাটাকে 'অ্যাটলাসের' মতো লম্বা দাড়িওয়ালা যে মূর্তিরা কাঁধে ধরে রয়েছে তাদের অতি পরিস্ফুট অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সেই শাদা তুষার জমতে থাকুক। বাবা পরলোকে, পাশের ঘরে সেবাস্তিয়ান ঘুমন্ত কিংবা শুয়ে আছে নিথর হয়ে, আর আমি? আমি বিছানায় শুয়ে চোখ দুটোকে খুলে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছি বাইরে অন্ধকারে।

এর প্রায় কুড়ি বছর পরে আমি 'লসান' গিয়েছিলেম। উদ্দেশ্য ছিল, যে সুইস (গভর্নেস) প্রথমে সেবাস্তিয়ানকে পরে আমাকে মানুষ করেছিলেন তাঁকে খুঁজে বের করা।

১৯১৪তে তিনি যখন আমাদের ছেড়ে চলে যান তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। চিঠির আদান প্রদান অনেক আগেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাই ১৯৩৬এ তাঁকে যে আমি জীবিত দেখতে পাবো সে আশাই ছিল না। তবু আমি তাঁকে জীবিতই দেখতে পেয়েছিলেম।

আমার মায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানতেন না। সেবাস্তিয়ান যে মাস তিনেক আগে মারা গেছেন তাও জানতেন না। সেবাস্তিয়ান যে এতোবড় লেখক হয়েছিলেন তাও তিনি জানতেন না। হাপুস নয়নে নির্ভেজাল কান্না কাঁদলেন শুধু। আমিও তাঁর সঙ্গে কাঁদলেম না বলে কিছুটা বিরক্তও হলেন যেন। বললেন, "তুমি বরাবরই এমনি পাষাণ।" আমি তাঁকে জানালেম যে, আমি

সেবাস্তিয়ানের একটা জীবনী লিখছি আর তাঁর কাছে সেবাস্তিয়ানের ছেলেবেলার গল্প শুনবো বলে এসোছ। বাবার দ্বিতীয় বিয়ের পর তিনি আমাদের সংসারে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর স্মৃতি এমন অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, স্মৃতিতে ঘটনা পরম্পরা এমনভাবে জট পাকিয়ে গিয়েছিল যে, তিনি আমার বাবার প্রথমা স্ত্রীর কথা বললেন (সেই বজ্জাত ইংরেজ মেয়েটা!) যেন তিনিও আমার মায়ের মতোই তাঁর কত চেনা! মায়ের সম্বন্ধে বললেন, 'আহা, কী ভালো মেয়ে!' কাঁদতে কাঁদতে বললেন, "আহা, বাছা সেবাস্তিয়ান! কী মিষ্টি কী দরাজ ব্যাভার! মনে পড়ে—ছোটো ছোটো দু'হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে আমাকে বলতো,—'দিদি তুমি ছাড়া সবাই আমার কাছে বিষ, শুধু তুমিই আমার মনের কথা বোঝো!' একদিনের কথা মনে পড়ে, তোমার মায়ের অবাধ্য হওয়ার জন্যে সেদিন আমি সেবাস্তিয়ানের হাতে একটা ছোট্ট, প্রায় একটা টোকার মতো থাপ্পড় মেরেছি। ওঃ, সেকী চোখের চাউনি! আমি প্রায় কেঁদে ফেলি আর কি! আর গলার স্বর কেমন যেন হয়ে গেছে! বললে, 'ভালোই করেছো দিদি, আর কখনো একাজ করবো না'!"

অনেকক্ষণ ধরে এইভাবে বলতে রইলো। আমি পড়ে গেলেম ফাঁপরে। শেষে অনেকবার বিফল চেষ্টার পর ওঁর কথার মোড় ফেরাতে পারলেম। ইতিমধ্যে কখন কান থেকে শোনার যন্ত্রটা ভুলে নামিয়ে রেখেছেন! চুপ করলেন বটে কিন্তু ইতিমধ্যে চেঁচিয়ে আমার গলা ভেঙে গেছে! এরপর তিনি তাঁর এক প্রতিবেশিনীর প্রসঙ্গ তুললেন। বাড়ীতে ঢোকার সময় আমার দেখা হয়েছিল এঁর সঙ্গে। 'ভালো মানুষের মেয়ে, যেমন বদ্ধ কালা তেমনি ভীষণ মিথ্যুক। আমি ঠিক জানি ও রাজকুমারী দেমিদভের ছেলেদের পড়িয়ে চলে আসতো, ওঁদের বাড়ীতে থাকতো না!' এরপর আমি যখন ফিরে আসছি তখন বললেন, "শোনো, বইটা লিখে ফেল! সেবাস্তিয়ানকে রাজপুত্তর করে গল্পটা লিখো! স্বপ্নপুরীর রাজপুত্র! আমি

অনেকবারই তাকে বলেছি, 'সেবাস্তিয়ান, একটু হিসেব করে চলো, মেয়েরা তোমার পায়ে লুটিয়ে পড়বে!' সে হেসে জবাব দিতো, 'ভালোই তো, আমিও তাহলে ওদের পায়ে…!' ”

আমার ভেতরটা কেমন যেন গুলিয়ে উঠল। উনি সশব্দে আমাকে চুমু খেলেন, বারকতক আমায় হাত চাপড়ালেন, তারপর আবার তাঁর চোখের জলের বাঁধ ভাঙল। তাঁর জরাজীর্ণ ঘোলাটে চোখের দিকে চেয়ে দেখি। চেয়ে দেখি, তাঁর মুখে দু'পাটি নকল দাঁত ঝক্ ঝক্ করছে। চেয়ে দেখি, তাঁর বুকের ওপর স্বচ্ছ লাল পাথরের অতি পরিচিত সেই ব্রোচটা এখনো রয়ে গেছে। এরপর বিদায়। ইতিমধ্যে বাইরে তুমুল বর্ষণ শুরু হয়েছে। নিজের প্রতি বিরক্ত হলেম, ধিক্কার দিলেম নিজেকে। আমার বইয়ের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটা না লিখে কেন মিছিমিছি এতো দূরে এই শুনতে এলেম! উনি তো সেবাস্তিয়ানের পরবর্তী জীবনের একটা কথাও জিজ্ঞাসা করলেন না! জিজ্ঞাসা করলেন না তো—সেবাস্তিয়ান কেমনভাবে কোথায় মারা গেছেন! এসব কিছুই তো জিজ্ঞাসা করলেন না!

॥ তিন ॥

১৯১৮র নভেম্বরে সেবাস্তিয়ান ও আমাকে নিয়ে আমার মা রাশিয়ায় থাকার বিপদ এড়াতে বাইরে পালিয়ে যেতে মনস্থ করলেন। বিপ্লব তখন পুরোদমে চলেছে, সীমান্ত বন্ধ হয়ে গেছে। মা একজনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। এই ভদ্রলোক দেশত্যাগীদের গোপনে সীমান্ত পার করার ব্যাবসায়ে নেমেছিলেন। ঠিক হোলো টাকার বিনিময়ে (অর্ধেক অগ্রিম দেয়) তিনি আমাদের ফিন্‌ল্যাণ্ডে পৌঁছে দেবেন। সীমান্তের কাছে একটা জায়গায় (এখান পর্যন্ত আমাদের আইনত যাওয়া চলবে) নেমে

পড়তে হবে, তারপর গুপ্ত পথ দিয়ে সীমান্তটা পেরিয়ে যেতে হবে। দারুণ তুষারপাতের দরুন এই জনবিরল গুপ্ত পথগুলোর গোপনীয়তা দ্বিগুণ তিনগুণ বেড়ে গিয়েছিল। যে স্টেশন থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হবার কথা সেই স্টেশনে মা আর আমি দাঁড়িয়ে আছি। দুঃসাহসী কাপ্তেন বেলভের সাহায্যে সেবাস্তিয়ান বাড়ী থেকে স্টেশন পর্যন্ত মাল বয়ে আনার বন্দোবস্তে রয়েছে। ৮.৪০ মিনিটে ট্রেন ছাড়ার কথা। সাড়ে আটটা বেজে গেল, সেবাস্তিয়ানের দেখা নেই। আমাদের গাইড ইতিমধ্যে ট্রেনে চড়ে চুপচাপ খবরের কাগজ পড়ছিলেন। তিনি মাকে আগেই সাবধান করে দিয়েছিলেন, মা যেন কোনো ক্রমেই প্রকাশ্যে তাঁর সঙ্গে কথা না বলেন। সময় পেরিয়ে যায়। ট্রেন ছাড়ার মুখে। আমার হাত পা ঠাণ্ডা উদ্‌বেগে। আমরা জানতেম, ঐ লোকটা ওর ব্যাবসায়ের রীতি হিসেবে এই বন্দোবস্তটা আর দ্বিতীয়বার করতে চাইবে না। বন্দোবস্তটা যদি গোড়াতেই বানচাল হয়ে যায়, তা হলেও না। এও জানতেম যে, এই পালানোর খরচ দ্বিতীয়বার বহন করার সাধ্য ছিল না আমাদের। মিনিটের পর মিনিট কেটে যেতে লাগল। মনে হোলো আমার পেটের মধ্যে কি একটা ঘুলিয়ে উঠছে, সেটাকে কিছুতেই চাপতে পারছি না। আর দু'এক মিনিট বাদেই ট্রেনটা ছেড়ে দেবে আর আমাদের ফিরে যেতে হবে ফেলে আসা সেই অন্ধকার হিম ছাদের কুঠরিতে (কারণ, বাড়ীর বাকীটা সরকার দখল করে নিয়েছে)। এই চিন্তাটা ভয়ংকর হয়ে দেখা দিলে। স্টেশনের দিকে আসতে আসতে দেখেছিলেম সেবাস্তিয়ান আর বেলভ একটা মালভর্তি ঠেলাগাড়ী ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসছে মচ্‌মচে বরফের ওপর দিয়ে। এই ছবিটা অমর হয়ে আমার চোখের ওপর দাঁড়িয়ে গেল (আমি তখন তেরো বছরের, অত্যধিক কল্পনাপ্রবণ), যেন জাদুতে জমে অনন্তকালের মতো অমর হয়ে গেল। মা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, জামার হাতার মধ্যে হাত দুটোকে লুকিয়ে। তাঁর পশমের

টুপির নিচে থেকে গোছাখানেক শাদা চুল বেরিয়ে পড়েছে। প্ল্যাটফর্মের ওপর এদিক ওদিক পায়চারী করছেন, জানালার পাশ দিয়ে চলে যাবার সময় গাইডের চোখে পড়বার ভরসায়। আটটা পঁয়তাল্লিশ, আটটা পঞ্চাশ। ট্রেনটা লেট করছে। কিন্তু শেষে বাঁশী বাজলই। হুস্ করে ইঞ্জিনের মাথা থেকে এক রাশ শাদা ধোঁয়া বেরিয়ে এল। এই ধোঁয়ার কুণ্ডলীর ছায়াটা প্লাটফর্মের বাদামী রঙের জমা বরফের ওপর দিয়ে চলে গেল। ঠিক এই মুহূর্তে সেবাস্তিয়ান ছুটতে ছুটতে এলেন। তাঁর ফার টুপিটার দুপাশে দুটো কান-ঢাকা পত্ পত্ করে উড়ছে হাওয়ায়। আমরা তিনজন হুড়মুড় করে ট্রেনে উঠে পড়লেম।

কিছুক্ষণ দম নিয়ে সেবাস্তিয়ান বললেন: পথে আসতে আসতে বেলভ, আগে যে বাড়ীটাতে থাকতেন সেই বাড়ীর সামনে গ্রেফতার হয়েছেন। তাই দেখে মালপত্রের কথা না ভেবে তিনি প্রাণপণে স্টেশনের দিকে ছুটেছেন। কয়েক মাস পরে আমরা জেনেছিলেম যে, আমাদের শুভানুধ্যায়ী বেলভ গুলির মুখে প্রাণ দিয়েছেন।

বিপ্লববিধ্বস্ত রুশ দেশ থেকে সেবাস্তিয়ানের পালানো প্রসঙ্গের উল্লেখ করলেম তাঁর আত্মজীবনীর সবচেয়ে কাছঘেঁষা উপন্যাস 'হারানিধি' থেকে কয়েকটা বাক্য উদ্ধৃত করবো বলে। সেবাস্তিয়ান লিখেছেন: "সব সময় আমার মনে হয় মানুষের সমস্ত অনুভূতির মধ্যে যা নির্মলতম নির্বাসিত মানুষের স্বদেশের জন্য আকুলতা। ইচ্ছা হয় চিত্রিত করে দেখাই কীভাবে নির্বাসিত মানুষ তার অতীতকে জীবন্ত ও উজ্জ্বল রাখার প্রচেষ্টায় অহরহ স্মৃতিকে উজ্জীবিত রাখতে চায়। তার স্মৃতিপটে জেগে থাকে পাহাড় পর্বত, সুখস্মৃতিবিজড়িত পথঘাট, আপনা থেকে অযাচিত ফুটে ওঠা গোলাপকুঁড়িশুদ্ধ সবুজ বেড়া, খরগোসচঞ্চল মাঠ, দূরে দেখা কোনো অট্টালিকার চূড়া, আর কাছে দেখা নীল অপরাজিতার মতো কোনো ফুল...। কিন্তু যেহেতু আমার চেয়ে শক্তিমান আমার

পূর্বসূরীরা এই বিষয় নিয়ে আগেই লিখে গেছেন, আর যেহেতু আমি যা অতি সহজে প্রকাশ করতে পারি তার প্রতি আমার ঘোর সংশয়, তাই আমি চাই না যারা নিছক তরল আবেগ সমুদ্রের যাত্রী তারা যেন আমার এই নিষ্করুণ গদ্যের শক্ত ডাঙায় নোঙর ফেলে।"

এই বিশেষ অংশের বক্তব্য যাই হোক না কেন, এটা স্বতসিদ্ধ যে নির্বাসিতের অভিজ্ঞতায় যিনি পীড়িত একমাত্র তাঁর পক্ষেই এইভাবে স্বদেশের জন্য আকুলতা প্রকাশে প্রলুব্ধ হওয়া স্বাভাবিক। আমাদের পালানোর সময়ে রুশ দেশের মূর্তি যতই ভয়ংকর হোক না কেন, সেবাস্তিয়ান যে সেই দেশের বিচ্ছেদ বেদনা কখনো অনুভব করেননি তা বিশ্বাস করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

ফিন্‌ল্যাণ্ডে সন্তর্পণে প্রবেশ করে আমরা কিছুদিন হেলসিংফসে রইলেম। তারপর আমরা যে যার পথে বেরিয়ে পড়লেম। কোনো এক বন্ধুর পরামর্শে আমার মা আমাকে নিয়ে প্যারিসে চলে এলেন। এখানে আমার লেখাপড়া চলতে লাগল। সেবাস্তিয়ান চলে গেলেন লণ্ডনে, পরে কেমব্রিজে। তাঁর মা তাঁর জন্যে একটি নির্দিষ্ট আয়ের ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন। তাই পরবর্তী জীবনে অন্য যতো রকমের কষ্ট পেয়ে থাকুন না কেন, কোনোদিন অর্থ কষ্ট পাননি। মনে আছে, ওঁর যাত্রার সময় আমরা তিনজন একত্রে বসে পড়েছিলেম (রুশ দেশে যাত্রা করার আগে এটাই ছিল প্রথা !)। মায়ের বসার ভঙ্গীটা এখনো আমার মনে আছে। হাত দুটো কোলের ওপর। আঙুলে বাবার বিয়ের আংটিটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে খেলা করছেন (মা চুপ করে বসলেই এই আংটিটা নিয়ে এমনি খেলা করতেন !) আংটিটা হলহল করতো বলে একটা কালো সুতো দিয়ে সেটাকে তাঁর নিজের আংটিটার সঙ্গে বেঁধে রাখতেন। সেবাস্তিয়ানের বসার ভঙ্গীটাও মনে আছে। পরনে একটা কাল্‌চে নীল স্যুট। পায়ের ওপর পা। ওপরের পাটাকে আস্তে আস্তে দোলা দিচ্ছিলেন। প্রথমে আমি উঠে দাঁড়ালেম, তারপর সেবাস্তিয়ান, তারপর মা।

জাহাজ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে চাওয়ায় তিনি আমাদের বারণ করলেন। পাছে বারণ না শুনে যাই বলে, কথা আদায় করে নিলেন যাবো না বলে। সেই শাদা চুণকামকরা দেয়ালের ঘরে এইভাবে আমাদের বিদায় পর্বটা সাঙ্গ হোলো। সেবাস্তিয়ান মাথা হেঁট করলেন। তাঁর মুখের সামনে মা তাড়াতাড়ি একটা ক্রুশ চিহ্ন আঁকার ভঙ্গী করলেন। এর এক মুহূর্ত পরে জানালা দিয়ে চেয়ে দেখি সেবাস্তিয়ান ব্যাগ হাতে ট্যাক্সীতে উঠছেন বিদায় মুহূর্তের সেই হেঁট হওয়া ভঙ্গীটা নিয়ে।

সেবাস্তিয়ান আমাদের চিঠিপত্র লিখতেন খুব কম এবং যা বা লিখতেন তা খুব সংক্ষেপে। কেমব্রিজ থাকাকালীন তিনি দু'বার মাত্র প্যারিসে আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। ঠিক দু'বার নয়, একবার বলাই ঠিক, কেননা দ্বিতীয় বারে তিনি আমার মায়ের মৃত্যুকৃত্যতে—তাঁকে কবর দেওয়া উপলক্ষে—উপস্থিত ছিলেন। মায়ের জীবনের শেষ বছরগুলোতে মা ক্রমশ বুঝতে পারছিলেন যে, মৃত্যু গুটি গুটি এগিয়ে আসছে। এই সময়ে মা আর আমি তাঁর বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেম। মা-ই আমাকে সেবাস্তিয়ানের ১৯১৭র একটা অদ্ভুত এড্‌ভেঞ্চারের কথা বলেছিলেন। আমরা তখন ক্রিমিয়াতে বেড়াতে গেছি।

এরমধ্যে সেবাস্তিয়ান জনৈক ফিউচারিস্ট কবি আলেক্‌সিস্‌ প্যান ও তাঁর স্ত্রী লারিশার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছিলেন। এই বিচিত্র দম্পতি লুগার সন্নিকটে আমাদের গ্রামের বাড়ীর কাছাকাছি একটা বাড়ী ভাড়া নিয়েছিলেন। প্যান ছিলেন অতিরিক্ত বাচাল কিন্তু প্রাণবন্ত ছোটোখাটো মানুষ। সত্যিকারের প্রতিভা। কিন্তু তাঁর প্রতিভা তালগোলপাকানো দুর্বোধ্যতার মধ্যে চাপা পড়ে গিয়েছিল। সচরাচর অব্যবহৃত একগাদা পুরোনো কথার কিম্ভূতকিমাকার পাহাড় তৈরী করে সর্বশক্তি দিয়ে তিনি সেই পাহাড় সাধারণ মানুষের মাথায় ছুঁড়ে মারতেন।

এক গ্রীষ্মের সকালে সতের বছর বয়সের সেবাস্তিয়ান হারিয়ে গেলেন। মায়ের কাছে ছোট্ট একটা চিরকুট লিখে জানিয়ে গেলেন যে, তিনি প্যান ও তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে প্রাচ্য ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছেন। প্রথমে মা এটাকে মস্করা হিসাবে নিয়েছিলেন (সেবাস্তিয়ান মুখ গোমড়া করে থাকলে কি হবে, মাঝে মাঝে মজা করার একটা ভূতুড়ে ঝোঁক তাঁকে পেয়ে বস্‌তো। একবার ট্রামে যেতে যেতে টিকিট কালেক্টরের হাতে একটা চিরকুট লিখে গাড়ীর আর এক টেরে বসে থাকা এক মেয়ের হাতে দিতে বললেন। চিরকুটে লেখা ছিল, আমি গরীব টিকিট কালেক্টর তবু আমি আপনাকে ভালবেসেছি।) কিন্তু পরে প্যানদের খোঁজ নিতে গিয়ে মা দেখলেন, তাঁরা নেই। কিছুদিন পরে প্যানের এই 'টুর' বা পরিভ্রমণের ব্যাপারটার বিষয়ে জানা গেল। প্যানের মারকোপোলো মার্কা এই পরিভ্রমণের মূল পরিকল্পনা ছিল পূব থেকে পূবে একটার পর একটা মফঃস্বল শহরে ধাওয়া করে, প্রত্যেক জায়গায় একটা সুবিধে মতো হল ঘরে মুসায়েরার (একাই অবশ্য !) বন্দোবস্ত করে তাঁর নিজের, গৃহিণীর ও সেবাস্তিয়ানের পরের শহর পর্যন্ত ধাওয়া করার রাহাখরচ তুলে নেওয়া। এই ব্যাপারে সেবাস্তিয়া-নের ভূমিকা জানা যায়নি। কিংবা এমনও হতে পারে যে, তাঁর ভাগে পড়েছিল তল্পিদারি বা লারিশার মনোরঞ্জন। লারিশা ছিলেন অত্যন্ত বদ্‌রাগী। একবার তাঁর মেজাজ বিগড়ে গেলে তাঁকে বাগে আনা ছিল দুঃসাধ্য। আলেক্‌সিস্‌ প্যান সাধারণত মর্নিংকোট পরে মঞ্চে আবির্ভূত হতেন। সুতো দিয়ে তোলা গোটা কয়েক প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পদ্মফুল বসানো তাঁর এই কোটটা অবশ্য অন্য দিক থেকে পুরো কেতাদুরস্তই ছিল। তাঁর টাকপড়া মাথার সামনের দিকে রঙ দিয়ে একটা রাশিচক্র আঁকা থাকতো। কবিতা আবৃত্তি করতেন গুরুগম্ভীর গলায়। এই ছোটোখাটো মানুষটার গলা থেকে এই ধরনের স্বর বেরোতে শুনলে মনে হোতো একটা মূষিক যেন পর্বত প্রসব করছে। লারিশা মঞ্চের ওপর তাঁর পাশেই বসে থাকতেন। ঘোড়ার মতো

চেহারা, লাল্‌চে রঙের পোশাক। বসে বসে হয় বোতাম সেলাই করতেন, নয় পুরোনো ট্রাউজারে তালি মারতেন। এই সময়টায় তাঁর ছিল ঐ কাজ। এগুলো তাঁর দৈনন্দিন কাজের মধ্যে পড়তো না। কখনো কখনো প্যান দুটো কবিতা আবৃত্তির ফাঁকে জাভানি কায়দায় কব্জি ঘুরিয়ে তার সঙ্গে স্বউদ্ভাবিত কয়েকটা মুদ্রা মিশিয়ে নিয়ে এক ধরনের চটুল নাচ নেচে নিতেন। আবৃত্তি পর্ব শেষ হলে প্রাণ ভরে মদ টানতেন। আর, এতেই তাঁর সর্বনাশ ঘটতো। দলের এই পরিভ্রমণ পর্ব সাঙ্গ হোলো সিম্‌বিরকস্‌ পৌঁছে। আলেক্‌সিস্‌ বেহুঁশ হয়ে কপর্দকশূন্য অবস্থায় একটা নোংরা সরাইখানায় আশ্রয় নিলেন।

লারিশাও একটা পুলিস থানায় আটক হলেন। সম্বল শুধু বদ্‌মেজাজী চীৎকার। কোনো এক সরকারী কর্মচারী তাঁর স্বামীর প্রতিভার উপদ্রব সংযত করতে গিয়ে লারিশার হাতে এক চড় খেয়ে বসেন। ফলে লারিশার এই হাল। সেবাস্তিয়ান যেমন একদিন চুপিসাড়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন ঠিক তেমনি চুপিসাড়ে একদিন ফিরে এলেন। এ আর কী এমন—এমনি একটা ভাব নিয়ে। মা বলে-ছিলেন, অন্য ছেলে হলে মাথা হেঁট করে ফিরতো, কিন্তু সেবাস্তিয়ান তাঁর এই পরিভ্রমণ পর্বের এমন এক বর্ণনা দিলেন যেন এ একটা নাটকীয় মজার ব্যাপার, আর তিনি নিজে যেন নিছক দর্শক হয়েই ছিলেন। তিনি কেন যে এই বেয়াড়া দম্পতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ছিলেন তা একেবারেই রহস্য থেকে গেল। মা ভেবেছিলেন, ঐ লারিশাই তাঁকে বশ করেছেন, কিন্তু মহিলা স্বভাবে একেবারেই জোলো, তার ওপর বয়স্কা। আর, তাছাড়া স্বামীরূপ উদ্ভট প্রতিভাধরটির প্রতি ঘোর আসক্তা। অল্পদিনের মধ্যেই সেবাস্তিয়ানের জীবন থেকে তাঁরা সরে গেলেন। বছর দু'তিন পরে প্যান বলশেভিক পরিবেশে কিছুটা প্রচার লাভ করেন। আমার মনে হয় এই প্রচারের মূলে একটা বিচিত্র ধারণা কাজ করেছিল। বিচিত্র ধারণাটা এই

যে, চরমপন্থী রাজনীতির সঙ্গে চরমপন্থী শিল্পের কোথায় একটা সাজাত্য আছে। তারপর হয় ১৯২২এ কিংবা ১৯২৩এ প্যান আত্মহত্যা করেন—ট্রাউজারের গেলিসের সাহায্যে গলায় ফাঁস দিয়ে।

মা বলতেন, "আমার সব সময়েই মনে হোতো, আমি সেবাস্তি-য়ানের সত্য রূপটাকে ধরতে পারিনি। আমি জানতেম, সে স্কুলে ভাল ফল করেছে, রাশি রাশি বই পড়েছে। এমনিতেই খুব ছিম্‌ছাম। তার ফুস্‌ফুস্‌ এমন কিছু পোক্ত ছিল না, তবু সে রোজ সকালে জোর করে ঠাণ্ডা জলে স্নান করতো। তার সম্বন্ধে এমনি আরো সব জানতেম, কিন্তু মানুষটা আমার বোঝার বাইরেই রয়ে গেল। আজ সে প্রবাসে রয়েছে ইংরেজী ভাষায় আমাদের চিঠি লেখে। তাই আমি না ভেবে পারিনে যে, সে বরাবর রহস্যই থেকে যাবে আমার কাছে। তবু যিনি ওপরে আছেন তিনি জানেন আমি ওর প্রতি যথাসাধ্য কর্তব্য করার চেষ্টা করেছি।"

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর পড়া শেষ করে সেবাস্তিয়ান যখন প্যারিসে আমাদের সঙ্গে দেখা করলেন তখন আমি তাঁর বিজাতীয় পোশাক দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেম। টুইড কোটের নিচে হলুদ রঙের একটা জাম্পার। ফ্লানেলের ট্রাউজার ঢলঢল করছে, পুরু মোজা গলে নেমে এসেছে, তাকে ওপরে টেনে আটকে রাখার কোনো ব্যবস্থা নেই। টাইএর ডোরাগুলো কট্‌কটে রঙের। কী জানি কোন্‌ খেয়ালে রুমালটা গুঁজে রেখেছেন জামার হাতার মধ্যে। পাইপ খেতেন পথে যেতে যেতে, আর গোড়ালিতে চেপে তা নিভিয়ে ফেলতেন দরকার হলে।

ট্রাউজারের পকেটে হাত পুরে, আগুনের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে থাকার একটা বিশেষ ভঙ্গী ইতিমধ্যে আয়ত্ত করেছিলেন। রুশ বলতেন সন্তর্পণে, দুটো বাক্যের বেশী কথা বাড়লেই ইংরেজীর আশ্রয় নিতেন। উনি ঠিক একটা সপ্তাহ ছিলেন।

পরের বার যখন এলেন তখন মা নেই। মায়ের শেষকৃত্যের পর অনেকক্ষণ ধরে আমরা একত্রে বসেছিলেম। হঠাৎ শেল্‌ফের ওপর মায়ের ব্যবহৃত চশমাটা দেখে আমার এতক্ষণ চেপেরাখা কান্নাটা বাঁধ ভেঙে বেরিয়ে এল। তাই দেখে তিনি আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন কিন্তু এই চাপড়ানোও কেমন যেন আড়ষ্ট।' সমব্যথায় ও সান্ত্বনা দেবার জন্যে এগিয়ে এলেন বটে, কিন্তু কী রকম একটা দূরত্ব বজায় রেখে। যেন সব সময় অন্য কোনো চিন্তায় মগ্ন। আমাদের মধ্যে কিছু বৈষয়িক আলোচনাও হোলো। বললেন, 'রিভিয়েরায় চলে এসো, সেখান থেকে চলে যাও ইংলণ্ডে'। আমি তখন সবে স্কুলের পড়া শেষ করেছি। আমি বললেম, 'তারচেয়ে বরং প্যারিসে যাই— ওখানেই যা হয় কিছু করবো। ওখানে আমার কয়েকজন বন্ধু আছেন।' উনি জোর করলেন না। টাকার কথাও উঠল, তিনি তাঁর অদ্ভুত ছাড়াছাড়া ভাবে জানালেন আমার যা দরকার আমি নিতে পারি, তাতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই। মনে হয় টিন বা ঐ ধরনের কী একটা কথা যেন বলেছিলেন। ঠিক মনে পড়ে না। পরের দিন দক্ষিণ ফ্রান্সে চলে গেলেন। সকাল বেলায় আমরা অল্পক্ষণের জন্যে বেড়াতে বেরোলেম। পথে বেরিয়ে আমি কেমন অস্বস্তিবোধ করলেম। দুজনে নিরিবিলিতে আসায় আমি এই অস্বস্তিটা অনুভব করলেম। হঠাৎ বুঝতে পারলেম আমিই কথা খুঁজছি। তিনিও চুপ। চলে যাবার ঠিক আগেই বললেন, 'তা হলে ঐ কথাই রইল। যদি কিছুর দরকার পড়ে, আমাকে লণ্ডনের ঠিকানায় চিঠি দিয়ো।' ফরাসী 'সোরবোন' নামটার ইংরেজী 'সোরবোন' (হাড় ব্যথা) উচ্চারণ করে তার একটা ব্যঙ্গার্থের ইঙ্গিত করে বললেন, তোমার 'সোর-বোন' আমার কেম্‌ব্রিজের মতোই হবে। আর শোনো, খুঁজে পেতে যা হোক একটা বিষয় বেছে নিয়ো, আর, শেষ পর্যন্ত এই বিষয়টাতেই লেগে থেকো। অবশ্য যতদিন না ব্যাজার হয়ে যাও।' তাঁর কালো চোখে একটা ছোট্ট ঝিলিক

দেখলেম। 'আচ্ছা আসি, গুড্ লাক্।' হাত ধরে নাড়া দিলেন, আল্তো এক ধরনের আত্মসচেতন কায়দায়। এই কায়দাটা ইংলণ্ডে রপ্ত করেছিলেন। হঠাৎ তাঁর জন্যে, আপাতঃ বিনা কারণেই, আমার কী-রকম যেন কষ্ট হোলো। আমি কিছু একটা বলতে চাইলেম। এমন কথা বলতে চাইলেম—যে কথার মধ্যে দরদ ফুটে উঠবে, যে কথার পাখা থাকবে। যে কথায় হৃদয় থাকবে। কিন্তু উনি যখন চলে গেলেন, কথা বলার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল, তখন না বলা কথাগুলো পাখীর মতো উড়ে এসে বসল, কেউ আমার কাঁধে, কেউ আমার মাথায়!

॥ চার ॥

এই বই যখন লেখা আরম্ভ হোলো তার দু'মাস আগেই সেবাস্তিয়ান মারা গেছেন। মনে মনে বেশ জানি যে আবেগকে এই-ভাবে পানসে করে তুলতে দেখলে উনি ভীষণ চটে উঠতেন। কিন্তু একথা আমি না বলে পারি না যে, জীবন ভোর তাঁর প্রতি আমার যে ভালোবাসা ঘুমিয়ে ছিল, যে ভালোবাসার মুখ চাপা দেওয়া ছিল, সেই পরাঙ্মুখ ভালোবাসা সহসা অনুভবের দীপ্তিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এমনভাবে দীপ্তিমান হয়ে উঠল যে, তুলনায় আমার অন্যান্য ব্যাপার বিবর্ণ হয়ে গেল। তারা শুধু 'সিলুট' ছবিতে পরিণত হয়ে গেল। তারা সব ছায়া হয়ে গেল। আমাদের দেখা সাক্ষাৎ খুব অল্পই ঘটেছে, আর সেই দেখা সাক্ষাতের অবসরে আমরা কখনো সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করিনি। কিন্তু আজ যখন জীবনের মৃত্যুরূপ স্বাভাবিক অভ্যাসের আবির্ভাবে আমাদের মতবিনিময়ের সমস্ত সম্ভাবনা বিলুপ্ত তখন আমার আফসোস হতে লাগল কেন আমি তাঁকে কোনোদিন জানাইনি তাঁর বই আমার কতো ভালো লাগতো!

এখন এই ভেবে অসহায় বোধ করি যে, তিনি হয়তো জানতেনই না যে তাঁর বই আমি পড়তেম।

সত্য কথা বলতে সেবাস্তিয়ান সম্পর্কে আমি কতটুকুই বা জানতেম? তাঁর বাল্য ও যৌবন সম্পর্কে আমি সামান্য যা জানি তা দিয়ে বইয়ের দুটো পরিচ্ছেদ মাত্র লেখা যায়। কিন্তু তারপর?

এই বই লেখার কাজটা হাতে নেওয়ার পর আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে আমাকে অনেক খুঁজতে হবে। তাঁর জীবনের টুক্‌রোগুলোকে খুঁজে পেতে সংগ্রহ করে পরস্পরের সঙ্গে জুড়তে হবে। তাঁর চরিত্র সম্পর্কে আমার মনের যে গভীর উপলব্ধি তাই দিয়ে। হ্যাঁ, এই উপলব্ধিটুকুই আমার সম্পদ। এই উপলব্ধিটা ছড়িয়ে আছে আমার শিরায় শিরায়। এই উপলব্ধিকে আশ্রয় করে আমি যতই ভেবেছি, ততই এটা আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে আরও কোনো উপায় আছে।

তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর জীবনের যে সব ঘটনা আমি শুনেছি, কল্পনায় সেই সব ঘটনার মুখোমুখি হতেই আমি নিশ্চিত অনুভব করেছি যে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে তিনি যে রকম আচরণ করেছেন আমি হলেও ঠিক সেই রকম আচরণই করতেম। মনে আছে, একবার দেখেছিলেম দু'ভাই—দু'ভাইই টেনিস চ্যাম্পিয়ান—পরস্পরের সঙ্গে হারজিতের খেলায় নেমেছে। দুজনের মারের কায়দা সম্পূর্ণ আলাদা, একজন অপরের চেয়ে অনেক বেশী পটু, তবু কোর্টময় যখন তারা ছুটোছুটি করছে তখন দেখি তাদের দুজনেরই গতির ছাঁদ একই সূত্রে বাঁধা। দুজনের ছুটোছুটির ছক দুটোকে যদি কাগজে আঁকা সম্ভব হোতো তাহলে দুটোরই নক্সা হোতো একই রকম।

আমি এটা মানি যে সেবাস্তিয়ান আর আমার ছাঁদের মধ্যে মিল আছে কোথাও। তাই আমি তাঁর জীবনের বাঁকে বাঁকে যেই পৌঁছেছি, অমনি এটা তো আগেই ঘটে গেছে এই ধরনের একটা উপলব্ধি হয়েছে আমার।

তাঁর আচরণের কারণগুলো গণিতের সমীকরণের অজ্ঞাত রাশির মতো গুপ্ত থাকলেও আমার কাছে তাঁদের মান পরিস্ফুট হয়ে উঠতো আমার নিজের লেখা বাক্যবিশেষের অজ্ঞাতসার ইঙ্গিতের মধ্যে। এর অর্থ অবশ্যই এই নয় যে, আমরা উভয়েই একই চিত্তবৃত্তি বা একই প্রতিভার অধিকারী ছিলেম। আমার কাছে তাঁর প্রতিভা একটা দৈব ঘটনার মতো।

আমরা দুজনেই শৈশবে যে বিশেষ পরিবেশের অংশীদার ছিলেম, সেই পরিবেশের সঙ্গে তাঁর এই প্রতিভার সরাসরি কোনো কার্য-কারণ সম্পর্ক ছিল না। তিনি যা দেখেছিলেন, আমিও তা দেখতে পারতেম। তাঁর স্মৃতিতে যা জাগরূক ছিল তা' আমার স্মৃতিতেও জেগে থাকতে পারতো। কিন্তু তাঁর প্রকাশ ক্ষমতা আর আমার প্রকাশ ক্ষমতার মধ্যে যে পার্থক্য তা পিয়ানো আর বাচ্চার হাতের ঝুমঝুমির পার্থক্যের মতো। এই বইয়ের সব চেয়ে তুচ্ছ বাক্যটাও তাঁর চোখ থেকে আড়াল করে রেখে দিতেম এই ভয়ে যে পাছে ইংরেজী ভাষা ব্যবহারে আমার এই অপটুত্ব দেখে তাঁর চোখে ব্যঙ্গের ঝিলিক ওঠে। আর এই ব্যঙ্গের ঝিলিক উঠতই। তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই যে এই জীবনী লেখার আগে কোনো ইংরেজী সংবাদ পত্রের একটা ফলাও প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে 'লেখক হোন' নামের একটা কোর্স গ্রহণ করেছেন এই কথাটা তিনি যদি কোনো রকমে জানতে পারতেন তাহলে তাঁর মনের ভাব কী হোতো তা ভাবতেও আমার সাহসে কুলোয় না। যদি জানতে পারতেন তাঁর এই ভাইয়ের সাহিত্যিক অভিজ্ঞতার দৌড় কোনো মোটর কোম্পানির ফরমাশী খানকয়েক ইংরাজী অনুবাদ। একথা আমি স্বীকার করি এবং এতে আমার লজ্জা নেই।

সেবাস্তিয়ান যদি ডাকের মাধ্যমে এই ধরনের কোনো 'কোর্স' গ্রহণ করতেন, দেখা যাক্ কী হয় এই ধরনের এক মনোভাব থেকে, (এ রকম কৌতুকের প্রতি ওঁর আকর্ষণ ছিল বরাবরই)

তাহলে আমার ধারণা ছাত্র হিসেবে তিনি আমার চেয়েও খারাপ ফল করতেন। যদি তাঁকে বলা হোতো আপনি অন্য সকলের মতো লিখুন তা'হলে তিনি যা লিখতেন তা' কারুর লেখার মতোই হোতো না। তাঁর রীতির অনুকরণ তো আমি করতে পারি না। তাঁর লেখার রীতি তাঁর ভাষার রীতির মতোই। আর এই রীতি লেখার মধ্যে একটার পর একটা, এক সারি, এক সারি, 'উহ্য' থেকে যেতো। উহ্যেরাই অনুক্তেরাই জ্বল্ জ্বল্ করে উঠ্তো। যা অনুক্ত তাকে অনুকরণ করতে পারে না। কারণ এই অনুক্তির ফাঁসগুলোকে কোনো না কোনোভাবে পাঠক পূরণ করবেনই। কিন্তু সেবাস্তি-য়ানের লেখা বইগুলিতে কোনো বিশেষ মানসিক অবস্থা বা অভিজ্ঞতার বিবরণ পড়তে পড়তে যখন আমাদের উভয়ের যুগপৎ অথচ পরস্পরের অজ্ঞাতে দেখা বিশেষ কোনো জায়গার আলোর খেলা আমার মনে পড়ে, তখন আমি অনুভব করি যে প্রতিভার যোগ্যতায় আমি তাঁর কড়ে আঙ্ুলের সমকক্ষ না হলেও, আমাদের দুজনের চিত্তবৃত্তিতে কোথাও এমন একটা মিল রয়ে গেছে যার ফলে আমার বোধের বাধা অলক্ষ্যে দূর হয়ে যায়।

অর্থাৎ উপায়টা রয়েছে। যা দরকার তা এই উপায়টার যথাযথ ব্যবহার। সেবাস্তিয়ানের মৃত্যুর পর আমার প্রথম কর্তব্য হোলো তাঁর জিনিসপত্র ঘেঁটে দেখা। তিনি তাঁর সবকিছু আমাকেই দিয়ে গেছেন, আর, একটা চিঠিতে আমাকে লিখে নির্দেশ দিয়ে গেছেন তাঁর কোনো কোনো কাগজপত্র পুড়িয়ে ফেলতে। তাঁর চিঠির কথাগুলো এমন ধোঁয়াটে যে প্রথমে পড়ে আমার মনে হয়েছিল তিনি বুঝি কতকগুলো মুসাবিদা বা কতকগুলো ফেলে দেওয়া পাণ্ডুলিপির কথা বলেছেন। কিন্তু শিগ্গীর আমি বুঝতে পারলেম যে অন্যান্য কাগজ পত্রের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া কয়েকটা বিচ্ছিন্ন পাতা ছাড়া সমস্ত বর্জিত পাণ্ডুলিপিগুলো তিনি নিজেই নষ্ট করে গেছেন। এর কারণ, তিনি সেই জাতের লেখক যিনি লেখার চরম

রূপ অর্থাৎ মুদ্রিত আকারে ছাড়া কোনো কিছু রেখে যেতে চান না। এই ধরনের লেখক জানেন যে, পরিপূর্ণ সার্থক সৃষ্টির পাশে তার কঙ্কালটার অবস্থিতি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, জানেন যে অসম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি ছিন্নমস্তা ডাকিনীর মতো নিজের কাটা মাথাটাকে কোলে নিয়ে বিরাজ করে। এই জন্যে তিনি চান না যে, কারিগরের কারখানায় জঞ্জাল লোকচক্ষে প্রকাশ্যে পড়ে থাকুক। এই জঞ্জালের দরদমূল্য বা বাজার মূল্য যাই হোক্ না কেন। লণ্ডনে ৩৬নং ওক পার্ক-গার্ডেনে সেবাস্তিয়ানের ফ্ল্যাটে জীবনে প্রথম পদার্পণ করে বুঝলাম আমার বড্ড দেরি হয়ে গেছে। হৃদয়ে অদ্ভুত শূন্যতা অনুভব করলাম। তিনখানা ঘর, আগুন নিভে যাওয়া ফায়ার প্লেস আর সবার ওপর নিস্তব্ধতা। তাঁর জীবনের শেষ কয়েক বছরের বেশীর ভাগ সময় যে তিনি এখানে কাটিয়ে ছিলেন তা নয়, এখানেই যে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে মোকাবিলা, তাও নয়। ওয়ার্ডরোবে প্রায় আধ ডজন স্যুট ঝুলছিল। এদের বেশীর ভাগ পুরোনো। নিমেষের জন্য আমার মনে একটা অদ্ভুত ছবি তৈরী হয়ে গেল: মনে হোলো সেবাস্তিয়ানের দেহটা চৌকো কাঁধওলা অনেকগুলো দেহে পরিণত হয়ে শক্ত মড়ার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে। ঐ বাদামী রঙের কোটে আমি তাঁকে একদিন দেখেছিলেম। কোটের হাতাটা ছুঁয়ে দেখলেম, আমার হাতে ওটা নেতিয়ে পড়ল। স্মৃতির অস্ফুট আহ্বানে সাড়া দিলে না। জুতোগুলো পড়ে ছিল। অনেক, অনেক মাইল হাঁটা জুতোগুলো। ওদের হাঁটা শেষ। ভাঁজকরা সার্টগুলো পড়ে আছে চিৎ হয়ে। এই নির্বাক বস্তুগুলো আমার কাছে সেবাস্তিয়ানের কথা কীই বা বলবে? ঐ তাঁর বিছানা। তেলরঙের ঐ ফাটাফাটা ছোট্ট ছবিটায় দেখি কাদা প্যাচ্‌প্যেচে পথ, রামধনু আর সুন্দর ছোটো ছোটো খাল-খোন্দলে জল। দেওয়ালের হাতির দাঁতের মতো সাদা পটভূমিতে এই ছবিটা বসানো। ঘুম ভাঙ্‌লেই এই ছবিটাতেই তাঁর প্রথম চোখ পড়তো।

চারদিকে চোখ মেলতেই মনে হোলো এই শোবার ঘরের জিনিসগুলো যেন তড়াক্ করে লাফিয়ে কালের একটা ছোট্ট কুলুঙ্গির ভেতরে চলে গেল। ওরা যেন অসতর্ক মুহূর্তে ধরা পড়ে গিয়েছিল। ওরা ওখানে ঢুকে পড়ে ভীরু-ভীরু চোখ মেলে আমার দিকে তাকাতে আরম্ভ করেছে। যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে—আমি ওদের চম্‌কে-ওঠা ভাবটা ধরতে পেরেছি কি পারিনি। বিশেষ করে বিছানার কাছের নিচু সাদা চাকা দেওয়া আর্মচেয়ারটা এমনিভাবে তাকিয়ে রয়েছে। কিছু যেন চুরি করেছে এমনি একটা ভাব। এই আসনটা তার ভাঁজে ভাঁজে কী যেন সন্তর্পণে লুকিয়ে রেখেছে। হাত্‌ড়াতে হাত্‌ড়াতে হাতে কী একটা শক্ত ঠেকল। ওর হাতল দুটো ঠেলে সরিয়ে জিনিসটা বের করে দেখি ব্রাজিল দেশের একটা বাদাম। হাত সরিয়ে নিতেই চেয়ারটা আবার তার হাতল দুটো ভাঁজ করে রহস্যময় চাউনি নিয়ে বসে রইল। যেন আমাকে অগ্রাহ্য করে নিজের দেমাকে বসে রয়েছে।

স্নানের ঘর। কাচের শেল্‌ফ প্রায় খালি। ওপরে শুধু ট্যালকম পাউডারের একটা খালি টিন। ঘাড়ের ওপর ভায়োলেট ফুলের ছোপ নিয়ে একাই দাঁড়িয়ে রয়েছে। আয়নাতে তার রঙিন বিজ্ঞাপনের মতো প্রতিবিম্বটার দিকে চেয়ে।

এরপর দুটো ঘর। খাবার ঘরটা আশ্চর্যরকম নৈর্ব্যক্তিক। মানুষের খাবার জায়গাগুলো বোধহয় সবই এমনি। কারণটা বোধ হয় এই যে, আমাদের চারদিকে গড়ানে বিশৃঙ্খল যে বস্তুজগৎ তার সঙ্গে খাদ্যই একমাত্র যোগসূত্র।

কাচের ছাইদানে অবশ্য তখনো একটা সিগারেটের শেষ টুক্‌রো পড়ে ছিল। কিন্তু এই টুক্‌রোটা ফেলে গেছে বাড়ীভাড়ার দালাল কোন এক মিঃ ম্যাকম্যাথ। এর পর পড়ার ঘর। এখানে দাঁড়ালে বাড়ীর পিছনে বাগানটা দেখা যায়। দেখা যায় পাণ্ডুর আকাশ, একজোড়া এল্‌ম গাছ। কোনো ওক গাছ নেই। যদিও এর

ইঙ্গিত রয়েছে রাস্তার নামে। ঘরের একধারে একটা চামড়ামোড়া দিভান হাত-পা ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে। বই-এর তাকে বইগুলো ভিড় করে আছে। লেখার টেবিল। এর ওপর প্রায় কিছুই নেই। একটা লাল পেন্‌সিল, এক বাক্স কাগজ-আঁটা ক্লিপ। কেমন ছাড়াছাড়া বিমর্ষ ভাব এই টেবিলটার! কিন্তু তার পশ্চিম কোণে বসানো টেবিল ল্যাম্পটা চমৎকার। আমি এর আলো জ্বালার নাড়ীটা খুঁজে পেলেম। স্ফটিক বরণ টোপরটা আলোয় যেন গলে গেল। এই মায়াবী চাঁদটা সেবাস্তিয়ানের সাদা হাতের নড়াচড়ার দিকে অনিমেষে চেয়ে থাকতো।

এবার আসল কাজ। চাবিটা আমাকেই দিয়ে গিয়েছিলেন সেবাস্তিয়ান উত্তরাধিকার হিসেবে। সেই চাবি দিয়ে দেরাজটা খুললাম। প্রথমেই দু'বাণ্ডিল চিঠি বেরিয়ে এল। এদের ওপরে সেবাস্তিয়ানের হাতে যেমন-তেমন করে লেখা: 'নষ্ট করার জন্যে'। একটা বাণ্ডিল এমনভাবে ভাঁজ করা ছিল যে, বাইরে থেকে ভিতরের লেখা দেখা যাচ্ছিল না। লেখার কাগজগুলোর রঙ ডিমের খোলার মতো সামান্য নীল্‌চে, ঘোর নীলের বর্ডার দেওয়া। অন্য প্যাকেটটায় নোটলেখার কাগজগুলো অগোছালো। এগুলোতে মেয়েলি হাতের মোটা লেখা—লাইনের ঘাড়ে লাইন। এ লেখা কার হাতের তা অনুমানে বুঝলাম। এক নিমেষ উত্তেজিত কৌতূহল,—বাণ্ডিল দুটোকে খুঁটিয়ে দেখার লোভের সঙ্গে লড়াই। আফ-সোসের কথা, আমার মধ্যে যে মানুষটা ভদ্র তারই জয় হোলো। 'ফায়ার প্লেসে'র আগুনে বাণ্ডিল দুটো যখন পুড়ছে, তখন এক তা নীল কাগজ আপনা থেকেই খুলে গেল। দাহের যন্ত্রণায় কুঁকড়ে উল্‌টে গেল। পুড়ে কালো হয়ে আসার আগেই কয়েকটা কথা জ্বলন্ত হয়ে দেখা দিল। তারপর মূর্ছিত হয়ে পড়ল। সব শেষ।

আর্মচেয়ারে ঢলে পড়ে কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিলেম। যে কথা-গুলো চোখে পড়েছিল, সেগুলো রুশকথা—একটা রুশ বাক্যের অংশ।

ওরা যে অর্থটুকু প্রকাশ করলে তা একেবারেই অকিঞ্চিৎকর। (আমি অবশ্য অভাবিতের এই চকিত দীপ্ত প্রকাশ থেকে ঔপন্যাসিকের কোনো কাহিনীর আভাস পাবো বলে আশা করিনি)। ইংরেজীতে আক্ষরিক অনুবাদ করলে দাঁড়ায়: "thy manner always to find……" ('সব সময় খুঁজে পাওয়ার তোমার যে পদ্ধতি……")। এর অর্থটুকু আমাকে কিছু অবাক করলে না। আমি অবাক হলাম এটা রুশভাষায় লেখা বলে। যে রুশ ভদ্রমহিলার চিঠি সেবাস্তিয়ান এত যত্নে ক্লেয়ার বিশপের চিঠির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে জমিয়ে রেখেছিলেন সেই ভদ্রমহিলার পরিচয়ের ক্ষীণতম হদিসও আমি জানতেম না। এই দু'জনের চিঠির সহাবস্থান আমাকে শুধু বিভ্রান্তই করেনি, আমাকে উদ্‌বেজিতও করল।

ফায়ার প্লেসটি আবার কালো হিম হয়ে গেছে। তার পাশের চেয়ারে বসে আমি দেখছি, ডেস্কের ওপর ল্যাম্পের আলোটা সুন্দর গোল, খোলা ড্রয়ার থেকে একপ্রস্থ সাদা ফুলস্‌ক্যাপ কাগজ উথলে বেরিয়ে পড়েছে এবং আরো একপ্রস্থ ঐ ধরনের কাগজ মেঝেয় পড়ে রয়েছে। এর অর্ধেকটায় ছায়া। যেন আলোর সীমারেখাটা এই কাগজখানাকে তেরছাভাবে দু'ভাগে কেটে ফেলেছে। নিমেষের জন্য যেন দেখতে পেলেম, স্বচ্ছ সেবাস্তিয়ান ডেস্কে ঝুঁকে বসে রয়েছেন। কিংবা বুঝি মনে পড়ল, তাঁর ভুল 'রোকেব্রুনের' ওপর লেখা অংশটা। তিনি কি বিছানায় শুয়ে লেখা পছন্দ করতেন?

কিছুক্ষণ পরে আমি আমার কাজ নিয়ে পড়লেম। দেরাজের কাগজগুলোকে দেখেশুনে, ভাগে ভাগে গুছিয়ে রাখতে শুরু করলেম। অনেক চিঠি পেলেম। এগুলো পরে পড়বো বলে আলাদা করে রাখলেম। দেখি একটা খুব জমকালো খাতায় খবরের কাগজের কাটিং চিটোনো রয়েছে। খাতাটার মলাটে মস্ত একটা প্রজাপতির ছবি। না, এই কাটিংগুলোর কোনোটাতেই তাঁর নিজের বইয়ের কোনো সমালোচনা নাই। সমালোচনা জমানোর কাজ তাঁর

আত্মসম্মানে বাধতো। তাঁর মতো আত্মপ্রত্যয়ী মানুষের পক্ষে এসব সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। তা ছাড়া তাঁর এমনই মাত্রাবোধ ছিল যে, এসব তাঁর হাতের কাছে এলেও এগুলোকে সযত্নে একটি একটি করে চিটিয়ে রাখা তাঁর কাছে হাস্যকর মনে হতে বাধ্য। তবু কাটিং-এর একটা এলবাম দেখলাম। (পরে সময় মতো পড়ে দেখেছি এগুলোতে যা ছিল তা নিতান্ত মামুলী জায়গায় নিতান্ত মামুলী অবস্থায় ঘটা নানান ধরনের স্বপ্নের মতো অলীক ঘটনার বিবরণ)। এখন বুঝতে পেরেছি কেন তিনি পাঁচমিশেলি উপমায় আকৃষ্ট হতেন। তিনি সম্ভবত মনে করতেন যে, এই পাঁচমিশেলি উপমা আর ঐ ধরনের ছায়া-ছায়া দুঃস্বপ্নের মতো ঘটনা একই গোত্রে পড়ে। আইন সম্পর্কিত কতকগুলো কাগজপত্রের মধ্যে একখানা কাগজ পেলাম। এটার ওপর তিনি একটা গল্প ছকতে শুরু করেছিলেন। একটা মাত্র বাক্য দেখতে পেলেম—বাক্যটা চলতে চলতে থমকে গেছে। এই বাক্যটা পড়ে আমি সেবাস্তিয়ানের অদ্ভুত পদ্ধতির একটা হদিস পেলেম। লেখার সময় যে কথাগুলোকে বদলেছেন ও যা দিয়ে বদলেছেন সবগুলোকেই যেমনকার তেমনি বসিয়ে রেখেছেন। পড়ে দেখলাম লেখা রয়েছে: 'সে বড্ড,—বড্ড বেশী ঘুমোতো,—রোজার,—রোজারসন,—বুড়ো রোজারসন–কিনলে, —বুড়ো রোজার্স কিনলে,—অতিরিক্ত ঘুমকে এতো ভয় পেতো,—বুড়ো রোজার্স পরের দিনগুলোকে পাছে হারিয়ে ফেলে বলে এতো ভয় পেতো। সে বড্ড বেশী ঘুমোতো। তার ভীষণ ভয়, পাছে সে পরের দিনের ঘটনা—মহিমা,—ভোর বেলার ট্রেন 'মহিমা'—ধরতে না পারে—তাই তাকে কিনতে হোলো—কিনে বাড়ী আনতে হোলো —এক সন্ধ্যায় কিনে বাড়ী আনতে হোলো, একটা নয়, আটটা য়্যালার্ম ঘড়ি—ভিন্ন ভিন্ন আকারের,—নানান ছাঁদে টিক্‌টিক্-করা ঘড়ি,—ন'টা, আটটা, এগারোটা য়্যালার্ম ঘড়ি—টিক্‌টিক্-করা—যে য়্যালার্ম ঘড়িগুলো—ন'টা য়্যালার্ম ঘড়ি—যেন বেড়ালের ন'টা জীবন

—সে রাখলে,—সেগুলো তার শোবার ঘরের চেহারা এমন বদ্‌লে দিলে যেন তা একটা…'আফসোসের কথা এখানেই বাক্যটার শেষ।

একটা চকোলেট বাক্সের মধ্যে কয়েকটা বিদেশী মুদ্রা—ফ্রাঁ, মার্ক, শিলিং, ক্রাউন, আর কিছু খুচরো। অনেকগুলো ফাউনটেন পেন। প্রাচ্যের একটা পদ্মরাগ, আলগা, কিছুতে বসানো নেই। একটা ছোট্ট রবারের বন্ধনী। একটা কাচের টিউবে ওষুধের ট্যাবলেট, মাথাধরা, স্নায়বিক দৌর্বল্য, স্নায়ুর বেদনা, নিদ্রাহীনতা, দুঃস্বপ্ন আর দাঁতের ব্যথায় সেব্য। 'দাঁতের ব্যথা' কথাটা কেমন যেন উট্‌কো। ১৯২৬-এর একখানা পুরোনো নোটবুক, ঝাপসা-হয়ে-আসা, পুরোনো টেলিফোন নম্বরে ভর্তি।

আমি মনে মনে ক্লান্ততিক্ত হয়ে পড়ি। এসবে আমার দরকার ছিল না। সেই যিনি রুশ দেশ থেকে তাঁকে চিঠি লিখতেন তাঁর মুখখানা দেখতে চেয়েছিলেম, সেবাস্তিয়ানের নিজের কয়েকটা ছবি দেখতে চেয়েছিলেম, আরও অনেক কিছু চেয়েছিলেম। ঘরময় চোখ বুলিয়ে দেখতেই চোখে পড়ল বইয়ের শেল্‌ফের ওপর ছায়াছায়া একটা জায়গায় একজোড়া বাঁধানো ফটো।

উঠে পড়ে কাছে গিয়ে দেখি। এনলার্জ করা ফটো। একটা চীনাম্যান, কোমর পর্যন্ত (ঊর্ধ্বাঙ্গে পোশাক নেই) নগ্ন। তার শিরশ্ছেদ করা হচ্ছে। অপর ফটোটায় দেখি কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুল একটা বাচ্চা কুকুর ছানা নিয়ে খেলা করছে। নিতান্তই মামুলী ছবি। এ দুটোকে একসঙ্গে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখার পিছনে যে রুচি কাজ করেছে তাকে আমি সমর্থন করতে পারলেম না। তবু এ দুটোকে একত্রে পাশাপাশি রাখার মধ্যে হয়তো সেবাস্তিয়ানের নিজের কোনো যুক্তি থেকে থাকবে। তাকের ওপর বইগুলোর দিকে নজর দিলাম। অনেক বই। আগোছালো। নানান জাতের। একটা শেলফ্‌ অন্যগুলোর তুলনায় পরিপাটি করে সাজানো। দেখলাম, পর পর সাজানো রয়েছে 'হ্যামলেট', 'লা মর্ৎ দার্থার',

'দি-ব্রিজ অব্‌ সান লুইস রে', 'ডক্টর জেকিল মিঃ হাইড', 'মাদাম্‌ বোভারি'…'এংগ্লো পারসিয়ান ডিক্‌সনারি', 'এলিস ইন্‌ ওয়াণ্ডার ল্যাণ্ড', 'ইউলিসিস' 'এবাউট বেরিয়িং এ হর্স', সব নামগুলো যেন মিলে গেল কোনো একটা গানের কলিতে, এবং সেই গানটা যেন চেনা-চেনা। গানের এই কলিটা যেন একবার গুন্‌গুনিয়ে উঠল, তারপর মিলিয়ে গেল। ডেস্কে ফিরে এলাম। বাছাই করতে আরম্ভ করলাম। বেশীর ভাগই কাজকর্মের চিঠি। অতএব এগুলো পড়া যেতে পারে। কতকগুলোর সঙ্গে সেবাস্তিয়ানের ব্যবহারিক জীবনের যোগ ছিল বাকীগুলো এদিক থেকে অবান্তর। চিঠিগুলো এতো অগোছালোভাবে রাখা ছিল যে, এদের অনেকগুলোয় মর্মার্থ উদ্ধার করা আমার পক্ষে সম্ভব হোলো না।

অল্প কয়েকটা ক্ষেত্রে তিনি নিজের লিখিত চিঠির কপি রেখে-ছিলেন। এরই দৌলতে কোনো একটা বই উপলক্ষ্য করে তাঁর ও তাঁর প্রকাশকের মধ্যে একপালা পত্রালাপ পেয়ে গেলাম। এতো জায়গা থাকতে রুমানিয়া থেকে কে একজন খুঁত্‌খুঁতে লোক একটা বিশেষ অনুমতি চেয়েছে……ইংলণ্ড আর তার ডোমিনিয়নগুলোতে বিক্রীর অবস্থাও জানতে পারলেম খুব একটা কিছু নয়, তবু বেশ খুশী হবার মতো। একখানা বই লিখে বিখ্যাত কোনো এক বিনয়ী লেখক সেবাস্তিয়ানকে ভর্ৎসনা করেছেন (এপ্রিল ৪, ১৯২৮) তাঁর (অর্থাৎ সেবাস্তিয়ানের) 'কন্‌রাডিশ' ভঙ্গীর জন্য। ভবিষ্যতে 'কনরাডিশের' 'কন'টা বাদ দিয়ে 'র‍্যাডিস' অর্থাৎ মূলোর চাষ করতে বলেছেন তাঁর পরবর্তী লেখাগুলোতে। উজবুকের মতো কথা!

শেষে বাণ্ডিলটার একেবারে তলায় পেলেম আমার নিজের ও মায়ের লেখা চিঠিগুলো। এদের সঙ্গে রয়েছে তাঁর কলেজ জীবনের প্রথম দিকের এক বন্ধুর চিঠি। এই চিঠিগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে (পুরোনো চিঠিগুলো সহজে তাদের ভাঁজ খুলতে দেয় না) হঠাৎ আমার পরবর্তী সন্ধানের সূত্র পেয়ে গেলেম।

॥ পাঁচ ॥

সেবাস্তিয়ানের কলেজের বছরগুলো কিছু সুখের ছিল না। মনে হয়, প্রথম প্রথম যেমনভাবে চলা উচিত তেমনিভাবে পাছে চলতে না পারেন কিংবা চলতে গিয়ে বেকুব হয়ে পড়েন এই ভেবে তাঁর আশঙ্কার অন্ত ছিল না। কেউ তাঁকে বলেছে একাডেমিক টুপির কাণাটা ভাঙা দরকার কিংবা সেটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া দরকার পিছনে ঝলমলে কাপড়টা মাত্র রেখে। তাকে অনুরসণ করতে গিয়ে তিনি টের পেলেন যে, তিনি আণ্ডার গ্রাজুয়েট চ্যাঙড়াদের দলে নেমে এসেছেন, বুঝলেন খাঁটি রুচির পরিচয় হোলো টুপি আর গাউন দুটোকেই ফেলে দেওয়া। এই জিনিসগুলো যে সত্য সত্যই তুচ্ছ তা প্রচার করা হবে এগুলোকে এইভাবে অবহেলা করে। মিথ্যে মূল্য দিয়ে তাদের নির্ভেজাল তুচ্ছতায় ভেজাল না মিশিয়ে।

আবার রেওয়াজ উঠ্‌ল, আবহাওয়া যাই হোক না কেন টুপি ও ছাতা উভয়ই বর্জন করো। ফলে এই রেওয়াজের সাধনায় ভিজতে শুরু করলেন, ঠাণ্ডা লাগালেন। তারপর, হঠাৎ একদিন পরিচয় হোলো কে এক, ডি, ডব্লিউ, জরগেটের সঙ্গে। চপলমতি, কৌতুক-প্রিয় কিন্তু অলস ঢিলেঢালা প্রকৃতির লোক। হুল্লোড় করার জন্য এবং উপস্থিত বুদ্ধি ও কেতাদুরস্ত আদব কায়দার জন্য বিখ্যাত। এই জরগেট একদিন ঠাণ্ডা মাথায় চলতি শহরের টুপি আর ছাতা মাথায় দিয়ে নির্বিবাদে বেরিয়ে পড়ল। পনের বছর পরে আমি 'কেম্‌ব্রিজ' বেড়াতে গিয়ে সেবাস্তিয়ানের সবচেয়ে অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছ থেকে (এখন উনি একজন খ্যাতিমান পণ্ডিত) এইসব কথা শুনলেম।

আমি তাঁকে বললাম: "আমি তো দেখি সবই···হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন 'জরগেটের:ছাতার বংশবৃদ্ধি হয়েছে···' বলি: "আচ্ছা, এবার খেলার কথা বলুন তো? সেবাস্তিয়ান কি খেলাধুলোয় ভাল ছিলেন?" ভদ্রলোক হাসলেন।

"না, তা ঠিক বলা যায় না। তবে ও একটু আধটু টেনিস খেলতো। মনে আছে, তার র‍্যাকেটটা ছিল খুব দামী। ফ্ল্যানেলের পোশাকে ওকে খুব মানাতো ও বেশ ছিমছাম মনে হোতো কিন্তু ও যখন টেনিসের বল 'সার্ভ' করতো তখন তার মার দেখে মনে হোতো তা যেন একেবারে মেয়েলী মার। যত মারতো তার চেয়ে ছুটোছুটি করতো বেশী। আমিও অবশ্য ওর চেয়ে কিছু পারদর্শী ছিলেম না। সবুজ ভিজে বলটাকে কুড়িয়ে অন্যদিকে পাশের কোর্টে খেলোয়াড়দের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া মাথার ওপর ঝির্‌ঝিরে বাদল বয়ে, এই ছিল আমাদের খেলা। খেলায় ও একেবারে কাঁচা ছিল।"

আর্ম চেয়ারগুলো খুব নীচু। বসে বসেই হাত বাড়িয়ে কার্পেটের ওপর রাখা চায়ের সরঞ্জামগুলোর নাগাল পাওয়া যায়।

ফায়ার প্লেসের গায়ে বসানো পিতলের তালগুলো থেকে আগুনের ঝিলিক ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে ঘরময় ছড়িয়ে পড়ছে। মনে হচ্ছে সেই ঝিলিকগুলোর রূপ ধরে সেবাস্তিয়ানের আত্মা যেন আমাদের চারপাশে চমক দিচ্ছে। যাঁর সঙ্গে কথা বলছি তিনি সেবাস্তিয়ানকে খুব অন্তরঙ্গভাবে জানতেন। তাই ভাবলেম এঁর কথাই ঠিক। তিনি বললেন যে, সেবাস্তিয়ানের হীনমন্যতার কারণ তিনি ইংলণ্ডে থেকে ইংরেজদেরই টেক্‌কা দিতে চেয়েছিলেন এবং এই চেষ্টায় বরাবর ব্যর্থ হয়ে শেষে উপলব্ধি করেছিলেন যে, শুধু যে বাইরের জিনিস-গুলোই তাঁকে প্রবঞ্চিত করেছিল তাই নয়, শুধু যে চলতি কথার চালু ঢঙটা তিনি রপ্ত করতে পারেননি তাই নয়, তিনি নিজের ব্যক্তিত্বের নিরালায় বদ্ধ থেকেও সজ্ঞানে অন্যদের মতো আচরণ অভ্যাস করতে চেয়েছিলেন, এবং এই তাঁর নৈরাশ্যের কারণ।

তবু তিনি সব দিক থেকেই কলেজের মাপসই ছাত্র হতে চেয়েছিলেন।

বাদামী রঙের ড্রেসিং গাউন আর পাম্পস্যু পরে, হাতে সাবানের বাক্স ও একটা স্পঞ্জ রাখার ওয়াটারপ্রুফ ব্যাগ ঝুলিয়ে গজেন্দ্র গমনে শীতের সকালে কাছাকাছি সাধারণ স্নান ঘরটাকে লক্ষ্য করে বেরিয়ে পড়তেন। প্রাতরাশ খেতেন বড় হলঘরে বসে। প্রাতরাশের পদের মধ্যে থাকতো বড় উঠোনটার ওপরে যে আকাশ সেই আকাশের-মতো-পান্‌সে-রঙ্‌ পরিজ বা হালুয়া আর তার সঙ্গে থাকতো এই উঠোন-ঘেরা-দেওয়ালের-গায়ে-ঝোলা লতার মতো সবুজ রঙের কমলালেবুর মার্মালেড। আরও জানলেম, সেবাস্তিয়ান বাইসাইকেলে (আমার সংবাদ দাতার ভাষায়, দু'চাকার ঠেলা গাড়ী) চেপে এক লেকচার হল থেকে অন্য লেকচার হলে যেতেন। 'পিট'এর নামে একটা ক্লাব ছিল। সেই ক্লাবে দুপুরের খাবার খেতেন। ঘরের মধ্যে 'ফাইভস্‌' নামের এক ধরনের দেওয়ালে বল মেরে মেরে খেলা, এই খেলার পর দু'তিনজন বন্ধুর সঙ্গে চা খেতে বসা। আর, কথাবার্তা ?

যা আগে কারো মুখ দিয়ে বেরোয়নি তা আস্‌তো না তাঁদের কথাবার্তায়। ডিনারের আগে হয়তো দু'একটা লেকচার থাক্‌তো, এগুলো সেরে আবার হলঘরে ফিরে আসা। এই চমৎকার ঘরখানা আমাকে দেখানো হয়েছিল। যখন এটায় ঢুকতে যাচ্ছি তখন দেখি এর মেঝেটায় ঝাঁট দেওয়া হচ্ছে। চেয়ে দেখি দেওয়ালের গায়ে অষ্টম হেন্‌রি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁর পায়ের সাদা মোটা ডিম দুটো দেখতে এতো জীবন্ত যে, মনে হয় ছুঁলেই ওঁর পায়ে সুড়সুড়ি লাগবে।

"আচ্ছা সেবাস্তিয়ান কোথায় বসতেন ?"

"ঐ তো ওখানে, দেওয়াল ঘেঁষে।"

"বাব্বাঃ, ওখানে পৌঁছতেন কী করে ? টেবিলগুলো তো মাইল কয়েক লম্বা !"

"পাশের বেঞ্চিতে উঠে টেবিলের ওপর দিয়ে হেঁটে হাজির হতেন আর কি ! কখনো কখনো হু'একখানা প্লেট মাড়িয়ে ফেলতেন, কিন্তু ওছাড়া অন্য উপায়ই বা কী ছিল ?"

সেবাস্তিয়ান ডিনারের পর হয় তাঁর ঠাণ্ডাহিম ঘরটায় ফিরে যেতেন কিংবা কোনো নির্বাক সঙ্গী যোগাড় করে বাজার অঞ্চলের ছোট্ট সিনেমা হলটায় ঢুকে পড়তেন। এখানের পর্দায় তখন হয় দেখানো হচ্ছে আমেরিকার পশ্চিম অঞ্চলের পটভূমিকায় কোনো বাহাহুরকা খেল কিংবা চার্লিচ্যাপলিন তাঁর কাঠ-কাঠ ভঙ্গীতে দ্রুত টক্‌টক্ করে হাঁটতে হাঁটতে বিরাটবপু কোনো হুষ্ট লোকের দৃষ্টি এড়াতে পথের কোনো একটা বাঁকে দেহ না ঘুরিয়ে শুধু কাত্ মেরে হাওয়া হয়ে যাচ্ছেন।

এইভাবে তিন-চারটে টার্ম কাটানোর পর সেবাস্তিয়ানের একটা অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল। যে সব ব্যাপারে আনন্দ পাওয়া 'উচিত' বলে ভেবেছিলেন, সেই সব ব্যাপারে পুরোপুরি উদাসীন হয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে এমন সব বিষয়ের দিকে মনটাকে ঘুরিয়ে দিলেন যেগুলোর সঙ্গে তাঁর বাস্তব সম্পর্ক জড়িত। প্রকাশ্যে দেখালেন তিনি কলেজ জীবনের ধরা বাঁধা ছক থেকে বেরিয়ে এসেছেন। শুধু আমার এই সংবাদ দাতা ছাড়া সবারই সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। তাঁর জীবনে ইনিই সম্ভবতঃ একমাত্র ব্যক্তি যাঁর সঙ্গে তিনি সম্পূর্ণ খোলামনে ও স্বাভাবিকভাবে মিশতে পেরেছিলেন। এ এক চমৎকার বন্ধুত্ব। সেবাস্তিয়ানের মনোভাবটা বুঝতে পারলেম। এই ধীর শান্ত পণ্ডিত মানুষটি তাঁর মার্জিত রুচি ও চিত্তের প্রশান্তির জন্য আমার মনে রেখাপাত করলেন। ওঁরা হুজনেই ইংরেজী সাহিত্যের ভক্ত ছিলেন। এই সময়েই সেবাস্তিয়ানের বন্ধু তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'সাহিত্যিক কল্পনার সূত্রাবলী'র খসড়া করছিলেন মনে মনে। হু'তিন বৎসর পরে এই বই-এর জন্য তিনি 'মণ্টোগোমারি' পুরস্কার পেয়েছিলেন।

হাল্‌কা নীল রঙের একটা বিড়াল কোথা থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর কোল আশ্রয় করে বসে পড়ল। বসে পড়ে তার হাল্‌কা সবুজ রঙের চোখজোড়া নিয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তিনি এর গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন ঃ "স্বীকার করতে বাধা নেই যে, আমাদের বন্ধুত্বের এই পর্যায়ে সেবাস্তিয়ান আমাকে 'পীড়িত করতো। যখন তাকে লেক্‌চার হলে পেতাম না, তখন তার ঘরে গিয়ে দেখতেম বিছানায় ও একটা বাচ্চার মতো গুটিয়ে শুয়ে রয়েছে, বিরস মুখে সিগারেট টানছে। তালগোল পাকানো বালিশের ওপর সিগারেটের ছাই, আর মেঝে পর্যন্ত ঝুলেপড়া বিছানার চাদরে এখানে ওখানে কালির ছোপ। আমার উচ্ছ্বাসপূর্ণ ডাকের উত্তর দিতো এক ধরনের অস্পষ্ট জড়িত কণ্ঠস্বরে। পাশ ফেরার প্রয়োজনও বোধ করতো না। তাই কিছুক্ষণ এদিক ওদিক করে, ও সুস্থ আছে বুঝে, আমি লাঞ্চ করতে চলে আসতেম। লাঞ্চ সেরে আবার দেখতে যেতেম ও কী করছে। এবার—দেখি ও আর এক কাতে শুয়েছে আর পায়ের চটিটাকে ছাইদান করেছে। তার কাবার্ডে কোনো কিছু খাবার নেই দেখে কিছু খাবার এনে দিই ভেবে বেরিয়ে আসি। তারপর যেই একছড়া কলা এনে হাজির করলেম অমনি সে কলা দেখে হনুমানের মতো খুশী হয়ে উঠ্‌লো। আর, সেই খুশীর কী বিচিত্র প্রকাশ! জীবন, মৃত্যু ও ঈশ্বর সম্বন্ধে গড়গড় করে একরাশ গর্হিত মন্তব্য করে গেল। এই ধরনের উক্তিতে আমি উত্যক্ত নই জেনেই যেন নিজের এই ধরনের মন্তব্যগুলো তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতো। অবশ্য আমি বিশ্বাস করতেম না যে, সে নিজে এই উক্তিগুলোর কোনো মূল্য দিতো।

"তারপর সবশেষে বিকেল তিনটে নাগাদ ড্রেসিং গাউন পরে বস্‌বার ঘরে এসে হেলতে দুলতে ঢুক্‌তো। তাই দেখে বিরক্ত হয়ে আমি উঠে আসতেম। আর, ও আগুনের কাছে জড়সড় হয়ে বসে পড়ে মাথা চুলকাতো। পরের দিন নিজের পড়া নিয়ে যখন

ধ্বস্তাধ্বস্তি করছি তখন শুনি ও আসছে সিঁড়িতে দুপদাপ আওয়াজ করতে করতে। তারপর হুড়মুড় করে আমার ঘরের মধ্যে হাজির। ছিম্‌ছাম্‌, তাজা, আবেগ-বিহ্বল অবস্থা। হাতে সদ্য-শেষ-করা একটা কবিতা।

"আমার বিশ্বাস, এ-সবই তাঁর চরিত্রের ছকের সঙ্গে পুরোপুরি খাপ খায়। তাঁর একটা ছোট্ট দিন আমার কাছে বড় করুণ মনে হোতো। সেবাস্তিয়ান যদিও গড়গড় করে নিখুঁত ইডিয়ামে ইংরেজী বলতেন তবু তাঁর ইংরেজী ছিল বিদেশীর ইংরেজী।" বেড়ালটাকে নামিয়ে রেখে কিছুক্ষণ ধরে দেরাজের কাগজ হাতড়াতে লাগলেন কিন্তু তেমন কিছু খুঁজে পেলেন না। আপনমনে বললেন, "হয়তো আমার বোনের বাড়ীতে কোনো একটা ট্রাঙ্কে···কিন্তু ঠিক করে বলতে পারছি না,···এসব ছোটোখাটো ব্যাপার ভোলারই জিনিস।' তা ছাড়া, সেবাস্তিয়ান থাকলে আমি এগুলো ভুলে গেছি দেখলে আমার তারিফই করতেন।"

"তা যাক্‌" আমি বললাম, "যে অতীতের কথা আপনি বলছেন সে অতীতটা, আবহাওয়ার ভাষায় বলতে গেলে, আধো আঁধার ভিজেভিজে—আজকের আবহাওয়ারই মতো (এ দিনটা ছিল ফেব্রুয়ারি মাসের একটা বিরস বিষণ্ণ দিন)। আচ্ছা বলুন তো, কোনোদিন কি এই অতীতটা রৌদ্রে স্নানকরা, তাপে উষ্ণ ছিল না? সেবাস্তিয়ান নিজেই যেন কোথায় উল্লেখ করেছেন, 'কোনো ছোট্ট সুন্দর নদীর তীরে বড় বড় বাদামের গাছ, হালকা লাল রঙের মোমবাতির মতো।' হ্যাঁ, আমি ঠিকই বলেছি। কেম্‌ব্রিজ শহরে 'প্রায়' প্রতি বছরই বসন্ত আসতো, গ্রীষ্মও হাজিরা দিতো। (এই 'প্রায়'টা ছিল খুশীর উপলক্ষ্য)। হ্যাঁ, 'ক্যাম' নদীর ওপর শালতিতে হেলান দিয়ে গড়াতে ভালবাসতেন সেবাস্তিয়ান। কিন্তু, মাঠের ধার ঘেঁষে যে একটা পথ চলে গিয়েছিল সেই পথ বেয়ে গোধূলিবেলায় সাইকেলে চড়ে ঢুঁড়ে বেড়াতে সবচেয়ে ভালবাসতেন

এই পথের ধারে কোনো বেড়ার ওপর বসে চেয়ে চেয়ে দেখতেন সন্ধ্যার পাণ্ডুর আকাশে স্যামন মাছের মতো লালচে রঙের মেঘের কুণ্ডলী রঙ্ বদলাতে বদলাতে মলিন তামার বর্ণ ধারণ করছে। দেখতেন আর বসে বসে ভাবতেন।

"কী ভাবতেন? সেই মেয়েটার কথা? খাস লণ্ডনের সেই মেয়েটি, পিছনে ঝোলানো নরম নরম চুলের লম্বা বেণী, সেই যে মেয়েটিকে মাঠ বয়ে অনুসরণ করে, গায়ে পড়ে কথা বলে, চকিতে চুমো খেয়েছিলেন, সেই যে মেয়েটির সঙ্গে আর তারপর তাঁর দেখা হয়নি কোনোদিন? অথবা, ভাবতেন কোনো একটা মেঘের গড়নটাকে। অথবা ফারগাছের ঘন কালো রুশ জঙ্গলের ওপারে কুয়াশার মধ্যে সূর্যাস্তের স্মৃতি? (এ ধরনের স্মৃতি সত্যিই তাঁর মনে উদিত হলে আমি নিজেই কী যে সুখী হতাম!) অথবা, তৃণের অঙ্কুর আর তারাদের গূঢ় অর্থ? নৈঃশব্দ্যের অজ্ঞাত ভাষা! শিশির বিন্দুর দারুণ গুরুভার? অথবা 'হাজার হাজার উপল-খণ্ডের মধ্যে, অজ্ঞাত অর্থ একটা বাক্যেতে সাজানো শব্দের মতো উপলখণ্ডদের মধ্যে, কোনো একটা বিশেষ উপলের বিহ্বল করা বুকভাঙা সৌন্দর্যে! অথবা, যখন ধীরে ধীরে আঁধার হয়ে আসে আর, অস্তিত্ব অদ্ভুত অচেনা হয়ে চলে যায় ধরা ছোঁওয়ার বাইরে সেইক্ষণে নিজের অস্তিত্বকে প্রশ্ন করা—'কে তু'মি?' অথবা, ভগবানের যে বিশ্বে মানুষের সত্যকারের প্রবেশ ঘটে না কোনদিন সেই বিশ্বের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা 'কে তুমি?' অথবা, হয়তো (মনে হয় এটাই সম্ভবত সত্যের কাছাকাছি) বেড়ার ওপর বসে থাকতে থাকতে তাঁর মন, কথা আর কল্পনা, অস্পষ্ট কথা আর অস্ফুট কল্পনার যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হয়ে যেতো। ইতিমধ্যেই তিনি জেনেছিলেন যে, শেষের এটাই তাঁর জীবনের সারসত্য। দেখেছিলেন, তাঁর নিয়তি-নির্দিষ্ট গন্তব্য পড়ে আছে প্রেতের রাজ্যের মতো ছায়া-ছায়া ঐ যুদ্ধ-ক্ষেত্রের ওপারে। সময় এলে তিনি এই যুদ্ধক্ষেত্রটা পার হয়ে যাবেন।

"তাঁর বই? হ্যাঁ, তাঁর বই আমি দারুণ পছন্দ করতেম! কেম্‌ব্রিজ থেকে চলে যাবার পর তাঁর সঙ্গে আর বিশেষ দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। নিজের লেখাও তিনি কোনোদিন পাঠাননি আমার কাছে। জানেন তো, লেখকরা ভুলো! একদিন একটা লাইব্রেরীতে আমি তাঁর তিনখানা বই পেয়ে গেলেম। তিনরাত্রিতে পড়ে শেষ করলেম। আমি সব সময়েই নিশ্চিত জানতেম যে, তাঁর হাত থেকে যা-ই বেরুবে তা-ই অনবদ্য হবে, কিন্তু তা-যে এতো অনবদ্য হবে তা আমি ভাবতেই পারিনি। কেম্‌ব্রিজে থাকার শেষ বছরে...বেড়ালটার হোলো কি'? হঠাৎ ও যেন দুধ চিনতে পারছে না!—কেম্‌ব্রিজে থাকার শেষ বছরে সেবাস্তিয়ান খুব খেটেছিলেন। তাঁর পাঠ্য বিষয় ইংরেজী সাহিত্য, বিষয় হিসেবে যেমন বিপুলায়তন তেমনই জটিল ছিল।

"তবু এই সময়ে হঠাৎ হঠাৎ তিনি লণ্ডনে বেড়াতে যেতেন, প্রায়ই অবশ্য বিনা অনুমতিতে। তাঁর প্রাইভেট টিউটর ছিলেন মিঃ জেফারসন (পরে জেনেছিলাম) ঘোর বেরসিক এক বুড়ো ভদ্রলোক। ইনি খুব সুযোগ্য ভাষাবিদ ছিলেন। সেবাস্তিয়ানকে তিনি জোর করে রুশ বলেই ধরতেন। ফলে, কয়েক বৎসর আগে মস্কো যাবার পথে যে একরাশ রুশ কথা তিনি শিখেছিলেন সেই কথাগুলো তিনি সেবাস্তিয়ানকে শুনিয়ে শুনিয়ে শুধু যে তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটাতেন তাই নয়, তাঁর কাছ থেকে আরো কিছু কথা শিখতে চাইতেন। শেষে একদিন সেবাস্তিয়ানের মুখ থেকে বেরিয়ে গেল যে আসলে তিনি রুশদেশেই জন্মান নি, জন্মেছিলেন বুলগেরিয়ার সোফিয়া শহরে। আর, যায় কোথা! বুড়ো খুশীতে ভ'রে উঠে বুলগেরীয় ভাষায় কথা বলতে শুরু করে দিলেন। সেবাস্তিয়ান ঘায়েল হয়ে আম্‌তা আম্‌তা করে বললেন তিনি এই ভাষার ঐ প্রাদেশিক ঢঙ্‌টা জানেন না। তখন বৃদ্ধ তাঁকে একটা উদাহরণ দিতে চ্যালেঞ্জ করলেন এবং সেবাস্তিয়ান সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে একটা ইডিয়ম গড়ে ব'লে

বসলেন। বৃদ্ধ হক্‌চকিয়ে গেলেন, তারপর তাঁর মাথায় খেলল যে সেবাস্তিয়ান……"

এই পর্যন্ত ব'লে আমার সংবাদ দাতা হাসলেনঃ "ব্যস্‌, এই পর্যন্ত! আমার ঝুলিতে আর কিছু নেই। এবার আমার স্মৃতিচারণা ঢিমে হয়ে এসেছে। এবার বাজে কথা বলতে শুরু করবো। অবশ্য এটা উল্লেখ না করলেও চলে যে সেবাস্তিয়ান প্রথম শ্রেণীতে পাস করলেন, আর আমরা দু'জন একসঙ্গে খুব জাঁক করে একখানা ফটো তুলিয়ে নিলেম। যদি চান্‌ তো, ফটোখানা একদিন খুঁজে পেতে বের করে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো। আপনি উঠ্‌ছেন নাকি? সে কি? কলেজের পিছনে নদীর ধারের জায়গাটা দেখে যাবেন না? আসুন না, দেখে যান, 'প্রকাস' ফুল দেখে যাবেন না? সেবাস্তিয়ান এগুলোর নাম দিয়েছিলো 'কবির ব্যাঙের ছাতা'—কেন এ নাম দিয়েছিলো, চোখে দেখলেই বুঝতে পারবেন।"

বাইরে খুব জোরে বৃষ্টি নেমেছে। বাড়ীর বাইরে ঢাকা দেউড়ীতে দাঁড়িয়ে থাকি দু'একমিনিট। তারপরে বলি, "এবার আসি তাহলে।"

পথের ওপর ছোটো ছোটো খানা খোঁদলে জল জমেছে। সেই খানাগুলোকে সাবধানে এড়িয়ে এড়িয়ে এগোতে শুরু করেছি। অমনি পিছন থেকে সেবাস্তিয়ানের বন্ধু বললেন, "এই যে শুনুন, একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। এই সেদিন কলেজের অধ্যক্ষ বলছিলেন কে একজন তাঁকে চিঠি দিয়ে জিজ্ঞাসা করে পাঠিয়েছেন সেবাস্তিয়ান কি সত্যসত্যই ট্রিনিটি কলেজের ছাত্র ছিলেন? কী নাম যেন লোকটার! যাক্‌গে, মরুক গে, আমার স্মৃতি আজকাল অনেকক্ষেপ কাচা কাপড়ের মতো কুঁচকে গেছে। এতক্ষণ ধ'রে অবশ্য স্মৃতিটাকে বেশ খানিকটা কচ্‌লানো হোলো, কী বলেন? যাই হোক, আমি যেন শুনেছি কে একজন সেবাস্তিয়ানকে নিয়ে একখানা বই লিখবে বলে তথ্য জোগাড় করছে…। দেখুনতো কী মজার ব্যাপার! কই! ভাবিনি তো আপনি সেই…!" কুয়াশার

মধ্য থেকে সহসা কে যেন প্রশ্ন করলে, "সেবাস্তিয়ান নাইট?"
"সেবাস্তিয়ান নাইটের কথা কে বলে?"

॥ ছয় ॥

যে কণ্ঠস্বর এই কথাগুলো উচ্চারণ করেছিল সে এগিয়ে এল—চাকায়-তেল-দেওয়া গাড়ীর দোল নিয়ে উপন্যাসের ঘটনা এগিয়ে চলুক এমনি একটা অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠি মাঝে মাঝে। কী আশ্বস্তই না হতেম যদি দেখতেম এই কণ্ঠের অধিকারী কলেজ কর্তৃপক্ষের কোনো আমুদে লোক, সূক্ষ্ম রোমে ঢাকা ঝোলা কান, চোখের কোণে ভাঁজ, সেই ভাঁজে ভাঁজে জ্ঞানবৃদ্ধত্বের আর সদাশয়তার ইঙ্গিত···যেন হাতের কাছেই আবির্ভূত এমন এক চরিত্র যিনি আমার গল্পের নায়ককে শুধু চিনতেনই না বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জানতেন। ধরা যাক্ ইনি এসেই বললেনঃ "এই যে শুনুন, সেবাস্তিয়ানের কলেজ জীবনের প্রকৃত কাহিনীটা বলি আপনাকে।" তারপর সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে যেতো তাঁর এই কাহিনী। কিন্তু হায়! এ রকম কোনো কিছুই ঘট্‌ল না। কুয়াশার মধ্যে আবির্ভূত এই কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হোলো আমারই মনের যেন ধূসর গলিতে।

কোনো সম্ভাব্য সত্যের এ শুধু একটা প্রতিধ্বনি—। একটা সময়োচিত সাবধান বাণীঃ বর্তমানের মুখ থেকে অতীতকে জানা যাবে এই ধারণায় আস্থা রেখো না যেন। মাঝে যে সত্যের দালাল আবির্ভূত হলেন সেই দালালের সততা সন্দেহাতীত হলেও না। মনে রেখো, তুমি যা শুনলে তার তিনটে পাটঃ যিনি বক্তা তিনি একটা পাট করেছেন, যিনি শ্রোতা তিনি আবার এটায় আর এক চাপন দিয়েছেন, আর সবশেষে যিনি কাহিনীর মৃত নায়ক তিনি এই দুজনের কাছ থেকে সত্যকে আড়াল করতে শেষ ভাঁজটা দিয়েছেন।

আমার বিবেকের মধ্যে ঐ কণ্ঠস্বর জিজ্ঞাসা করছে : সেবাস্তিয়ানের কথা কে বলছে ? কে ? বলছে তাঁর সেরা বন্ধু ও আপন বৈমাত্রেয় ভাই, একজন নিরীহ বিদ্বজ্জন. জীবন থেকে দূরে যার বাস। অপরজন দূর দেশে এসে পড়ায় অস্বচ্ছন্দ এক মানুষ। কিন্তু তৃতীয় পক্ষ কোথায় ? একদিকে তিনি 'সেণ্ট ডামিয়ের' কবরখানায় শান্তিতে জীর্ণ হচ্ছেন। অপরদিকে, পাঁচখানা গ্রন্থে হাসতে হাসতে বেঁচে রয়েছেন। আর, আমি যখন এটা লিখছি তখন তিনি অলক্ষ্যে আমার পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আমার কাঁধের ওপর দিয়ে তাঁর দৃষ্টিকে প্রসারিত করে (তিনি অবশ্য অনন্তকাল বিরাজ করার তত্ত্বে কিংবা প্রেতাবস্থা সম্বন্ধে ঘোর সন্দিগ্ধ ছিলেন)।

যাই হোক, তাঁর বন্ধু যে তথ্য সম্পদ আমার হাতে তুলে দিয়েছেন তাই আমার সম্বল। এর সঙ্গে নিজেও কিছু কিছু জুড়ে দিতে পেরেছিলাম। এই সময়ে লেখা তাঁর চিঠিপত্র থেকে কয়েকটা ছোটোখাটো মামুলী ঘটনাও জানতে পেরেছি। এ ছাড়া তাঁর বিশ্ববিদ্যালয়-জীবন সম্পর্কে আনুষঙ্গিক কিছু কিছু তথ্যও পেয়েছি। এইগুলো পেয়েছি তাঁর বই থেকে।

এর পর লণ্ডনে ফিরে এলাম। এখানে এসে পরবর্তী কার্যক্রম নিখুঁতভাবে ছকে নিলাম।

সেবাস্তিয়ানের সঙ্গে আমার যখন শেষ দেখা, তখন কথায় কথায় তিনি প্রকাশ করেন যে, তিনি ১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ এই কয়েক বছর একজন কাউকে এক রকম সেক্রেটারী হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। অতীতের অনেক লেখকের মতো—বর্তমানে এ রকম উদাহরণ খুব কমই—(এমনও হতে পারে যে, যাঁরা নিজেদের বিষয়কর্মকে উৎসাহের সঙ্গে নির্ভুলভাবে পরিচালনা করতে পারেন তাঁদের কথা আমাদের অগোচরে থেকে যায়)—বিষয়কর্মের ব্যাপারে সেবাস্তিয়ান হাস্যকরভাবে অপটু ছিলেন। তাই যেই একবার একজন পরামর্শদাতা পেলেন অমনি তার হাতে নিজেকে একেবারে

সঁপে দিলেন (একবার ভাবলেন না লোকটা জোচ্চোর বা গণ্ডমূর্খ বা একাধারে গণ্ডমূর্খ ও জোচ্চোর কি না! আর হলেই বা কি!) এবং সঁপে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। নিশ্চয় জানি, যদি কখনো কোনো উপলক্ষ্যে জিজ্ঞাসা করতাম: এই যে লোকটা তোমার কাজকর্ম দেখে, ও যে আসলে কাজ ভণ্ডুল-করা পাজী বুড়ো নয় তা কি তুমি নিশ্চয় করে বলতে পারো?—তাহলে তিনি কথাটা তাড়াতাড়ি এড়িয়ে যেতেন পাছে অন্যের নষ্টামি বুঝতে পারলে তাঁকে নিজের আলস্য ঝেড়ে ফেলে কাজে নামতে হয়। এক কথায় তাঁর একজন সাহায্যকারী চাই এবং নাইলোকের চেয়ে সবচেয়ে অপদার্থ লোকটাও ভালো। এ ব্যাপারে তিনি নিজেকে ও অন্যকে যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিতেন যে, তাঁর এই মনোনয়ন একেবারে নির্ভুল। এতো কথার পরও একথা জোর দিয়ে যতদূর সম্ভব স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন যে, আমার এই মন্তব্য কোনোরকমেই (আইনের চোখে) এই ভদ্রলোকের পক্ষে মানহানিকর নয় এবং যে নামটা আমি উল্লেখ করতে যাচ্ছি এই বিশেষ অনুচ্ছেদে সে নামের কোনো উল্লেখ নাই।

মিঃ গুড্‌ম্যানের কাছ থেকে আমি সেবাস্তিয়ানের শেষের বছরগুলোর বিবরণ চাইনি (লেখার এই পর্যায় এ তথ্যের এখনো প্রয়োজন হয়নি কারণ, আমি তাঁর জীবনকে পর্যায়ে পর্যায়ে অনুসরণ করতে চেয়েছি, আগ বাড়িয়ে তাকে ধরতে চাইনি)। সেবাস্তিয়ানের কেম্‌ব্রিজোত্তর কালটা সম্বন্ধে কিছু জানতে গেলে কোন্ কোন্ ব্যক্তির সঙ্গে আমার দেখা করা প্রয়োজন শুধু এই পরামর্শটুকু চেয়েছিলাম।

এই উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯৩৬ এর ১লা মার্চ আমি তাঁর ফ্লিট্‌ স্ট্রীটের আপিসে দেখা করি।

আমি খোলা মন নিয়েই মিঃ গুড্‌ম্যানের কাছে গিয়েছিলাম।

'এই যে বসুন', নিজের ডেস্কের কাছে পাতা একটা আর্মচেয়ারের

দিকে হাত বাড়িয়ে আমাকে ভদ্রভাবে বসতে বললেন তিনি। পোশাক-আশাকে দেখার মতো সুসজ্জিত—যদিও পোশাকের ধাঁচটা নিতান্তই শহুরে। মুখের ওপর একটা অদৃশ্য কালো মুখোস। 'কী করতে পারি বলুন?' মুখোসের চোখের গর্তের ভিতর দিয়ে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে, আমার কার্ডখানা হাতে ধরে। তৎক্ষণাৎ বুঝলাম আমার কার্ডখানা থেকে তিনি কিছুই আঁচ করতে পারেননি। আসলে, সেবাস্তিয়ান তাঁর মায়ের উপাধিটা নিয়েছিলেন।

আমি বলি, "আমি সেবাস্তিয়ান নাইটের বৈমাত্রেয় ভাই"—কিছুক্ষণ দুজনেই চুপ।

গুড্‌ম্যান বলেন, "আপনি কি পরলোকগত বিখ্যাত লেখক সেবাস্তিয়ান নাইটের কথা বলছেন?"

"ঠিকই ধরেছেন!"

মিঃ গুড্‌ম্যান বুড়ো আঙুলের সঙ্গে আরো একটা আঙুল পেঁচিয়ে নিজের মুখের উপর বুলিয়ে নিলেন। মুখে মানে কালো মুখোস-পরা মুখে···। মনে হোলো কী ভাবছেন। আঙুল বুলিয়ে বুলিয়ে যেন মুখোসটাকে নামিয়ে আনছেন এমনি ভাব। "কিছু মনে করবেন না, আপনি ভুল করছেন না তো?" যতদূর সম্ভব অল্প কথায় আমি সেবাস্তিয়ানের সম্পর্ক বিবৃত করলেম। "ও তাই নাকি?" অবাক হলেন গুড্‌ম্যান। দেখি ক্রমশঃ চিন্তিত হয়ে পড়ছেন। "এটা কিন্তু কোনোদিন আমার মাথায় আসেনি। আমার স্থির বিশ্বাস ছিল সেবাস্তিয়ান রাশিয়ায় জন্মেছিলেন ও সেখানেই লালিত-পালিত হয়েছিলেন। কিন্তু, যেমন করেই হোক তাঁর নামের মধ্যেই যে ইঙ্গিতটা ছিল তা আমার নজর এড়িয়ে গিয়েছে। এখন বুঝতে পারছি···যা ভেবেছিলাম··· তাহলে তাঁর রুশ নামই হোতো···তাঁর মা···" ব্লটিং প্যাডের ওপর তাঁর সুস্পষ্ট সাদা আঙুল দিয়ে টোকা মারতে লাগলেন। এমনিভাবে মিনিটখানেক কাটল। তারপর একটা ছোট্ট অস্পষ্ট

নিঃশ্বাস ছাড়লেন। "যাক যা হবার তা হয়ে গেছে" তিনি বললেন, "এখন আর নতুন করে কিছু যোগ করা…অর্থাৎ…"। তাড়াতাড়ি বললেন, "আগে থেকে ব্যাপারটা খুঁটিয়ে না দেখার জন্য আমি দুঃখিত। তাহলে, আপনি তাঁর বৈমাত্রেয় ভাই? আলাপ করে আনন্দ পেলাম।"

আমি বললাম, "প্রথমে আমি বৈষয়িক ব্যাপারের মীমাংসা করতে চাই। সেবাস্তিয়ানের কাগজপত্র, বিশেষ করে তার লেখালেখি সম্পর্কিত কাগজপত্র খুব একটা সাজানো গোছানো নাই; তাই বুঝতে পারছিনে সত্যকার অবস্থাটা কি! আমি ওঁর প্রকাশকদের সঙ্গে এখনো দেখা করিনি। কিন্তু, জানতে পেরেছি যে, ওদের মধ্যে ঐ যারা 'মজার পাহাড়' (Funny Mountain) প্রকাশ করেছিল তারা আর ব্যবসায়ে নাই। এই ব্যাপারে আরো অনুসন্ধান করার আগে ভাবলেম আপনার সঙ্গে কথা বলে যাই।"

"ঠিকই করেছেন", বললেন মিঃ গুড্‌ম্যান, "আপনি হয়তো জানেন না নাইটের 'মজার পাহাড়' আর 'হারানো সম্পত্তি' এই দুটো বইয়ের সঙ্গে আমার কিছু স্বার্থ জড়িত আছে। এ অবস্থায় আপনাকে কিছু খুঁটিনাটি জানিয়ে দেওয়া আমার কর্তব্য। ঐ খুঁটিনাটি সম্পর্কিত কাগজপত্র কাল সকালে আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো। এর মধ্যে আছে আমার আর 'নাইট', এখন 'নাইট' না বলে বলতে পারি…কী বলুন, আমাদের মধ্যে তৈরী কন্‌ট্রাক্‌টখানা।" মুখোসের আড়ালে হেসে গুড্‌ম্যান আমাদের সহজ রুশ উপাধিটা উচ্চারণ করার চেষ্টা করলেন।

কথা চলতে থাকল—"আরো একটা ব্যাপার আছে। সেবাস্তিয়ানের জীবন ও লেখার ওপর আমি বই লিখবো বলে ঠিক করেছি। এই ব্যাপারে বিশেষ কিছু কিছু সংবাদ আমার একান্ত প্রয়োজন। আপনি কি?…"

মনে হোলো গুড্‌ম্যান হঠাৎ শক্ত হয়ে গেলেন। দু'একবার

গলা ঝাড়লেন এবং তাঁর অভিজাত ধরনের টেবিলের ওপরে রাখা একটা ছোট্ট বাক্স থেকে কালো কিস্‌মিসের মতো একটা লজেঞ্জ্‌স খুঁজে বের করলেন।

তারপর হঠাৎ চেয়ার-সুদ্ধ পাক দিয়ে ফিতে-বাঁধা চশমাটা ঘুরিয়ে বলে বসলেন: "ঠিক আছে, খোলাখুলিই কথাবার্তা হয়ে যাক্! বেচারা সেবাস্তিয়ানকে অন্য সবার চেয়ে আমিই বেশী চিনতাম; কিন্তু···আপনি কি বইটা লিখতে শুরু করে দিয়েছেন ইতিমধ্যে?" "না" আমি জবাব দিই।

"তাহলে লিখবেন না। কথাটা সোজা বলার জন্যে মাপ করবেন। পুরোনো অভ্যাস—সোজা কথা বলা—খারাপ অভ্যাস হয়তো! কিছু মনে করলেন নাকি? আমি বলছি কি···কী ভাবেই বা বলি! দেখুন 'বড়লোক' যাকে বলে, সেবাস্তিয়ান সে রকম কিছু ছিলেন না। অবশ্য, খুব ওস্তাদ শিল্পী বা ঐ রকম কিছু ছিলেন! কিন্তু ওঁর প্রতি পাবলিকের আকর্ষণ ছিল না। আমি অবশ্য বলছি না যে, তাঁকে নিয়ে কোনো বই লেখা যেতে পারে না! নিশ্চয়ই পারে। কিন্তু বইটাকে এমন একটা বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে লিখতে হবে যাতে ওটা আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারে। তা যদি না হয় ত, বইখানা একেবারে মার খাবে। কারণ, বুঝতেই পারছেন, সেবাস্তিয়ানের খ্যাতি এমন কিছু দৃঢ় নয় যে, তার ভিত্তির ওপর আপনার পরিকল্পিত বইখানা দাঁড়িয়ে থাকতে পারে।"

এই বিস্ফোরণের মুখে আমি যেন গুটিয়ে গিয়ে চুপ করে রইলাম। গুড্‌ম্যান বলে চললেন: "আমার এই ঠোঁটকাটা কথায় আপনি নিশ্চয়ই অপরাধ নিলেন না! আপনার বৈমাত্রেয় ভাই আর আমার মধ্যে এমন একটা প্রীতির সম্পর্ক ছিল যে, বুঝতেই পারছেন, এটা ভেবে আমার মনের ভাব কী হতে পারে! আমি বলি, যাক্, লিখে কাজ নাই! বইয়ের বাজার যাঁর নখদর্পণে এমন কোনো পেশাদার লেখককে জিজ্ঞাসা করলে

জানতে পারবেন যে, যিনিই আপনার প্রস্তাবমতো সেবাস্তিয়ানের জীবন ও রচনা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করতে যাবেন তিনিই নিজের ও পাঠকের সময় নষ্ট করবেন। দেখুন না, পরলোকগত অমুককে (একজন বিখ্যাত লোকের নাম করলেন) নিয়ে লেখা অমুকের বইটায় এতোগুলো ছবি আর হাতের লেখার 'ফ্যাক-সিমিলি' থাকা সত্ত্বেও সেটা বিক্রি হোলো না!"

মিঃ গুড্‌ম্যানকে তাঁর উপদেশের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে টুপিটা তুলে নিতে হাত বাড়িয়ে দিই। মনে মনে বুঝলাম আমার উদ্দেশ্য পণ্ড হয়েছে, গন্ধে গন্ধে ভুল জায়গায় পৌঁছেছি। যাই হোক, যে দিন-গুলোতে তিনি ও সেবাস্তিয়ান 'ইয়ার' হয়ে ছিলেন সেই দিনগুলোর কথা ওঁকে বলতে দিতে ইচ্ছা হোলো না। তাঁর 'সেক্রেটারিত্বের' দিনগুলির কথা জিজ্ঞাসা করলে জানি না তিনি কী বলতেন! সোচ্চার হৃদ্যতার ভঙ্গীতে হ্যাণ্ড্‌শেক করে তিনি তাঁর কালো মুখোসটা আমাকে সঁপে দিলেন। সেটাকে পকেটে পুরে নিলাম। পরে কোনো উপলক্ষ্যে এটা আমারও কাজে আসতে পারে। কাছাকাছি কাঁচের দরজা পর্যন্ত তিনি আমায় এগিয়ে দিলেন। সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে দেখি একটা চন্‌মনে চেহারার মেয়ে আমার পিছু পিছু ছুটে এসে আমাকে থামিয়ে দিলে। এই মেয়েটাকে আমি একটা ঘরে একটানা টাইপ করে যেতে দেখে-ছিলাম (অবাক্ কাণ্ড, সেবাস্তিয়ানের কলেজের বন্ধুও এমনিভাবে পিছু ডেকে আমাকে কিছু বলেছিলেন)।

মেয়েটি বলে, "আমার নাম হেলেন প্র্যাট। আপনাদের অনেক কথা আমার কানে এসেছে। যতটা পেরেছি শুনেছি। আমি আপনাকে একটা ছোট্ট অনুরোধ করবো। ক্লেয়ার বিশপ আমার খুব বন্ধু। উনি কিছু জানতে চান। কোনো একদিন আমি কি আপনার সঙ্গে কথা বলতে পারি?"

"নিশ্চয়ই!" আমরা দিন ক্ষণ ঠিক করে নিই।

আমার দিকে তার বড় বড় গোল চোখ রেখে সে বলে, "মিঃ নাইটকে আমি বেশ ভালই চিনতাম।"

"তাই নাকি!"—মাত্র এইটুকু বলি। আর কী বলা যেতে পারে তা মাথায় আসে না।

সে বলে চলে "হ্যাঁ, কী ব্যক্তিত্ব! অবাক্ হয়ে যেতে হয়। হ্যাঁ, আপনার কাছে লুকোবো কেন, ওঁকে নিয়ে গুড্ম্যান যে বইটা লিখেছেন সেটাকে ছুঁতে আমার ঘেন্না করে।"

"কী বললেন? বই?"

"তা জানেন না বুঝি? বইটা উনি সত্ত লিখেছেন। গত সপ্তাহে ওঁর সঙ্গে ওই বইয়ের প্রুফ ধরে মিলিয়েছি যে! এই যাঃ! বড্ড দেরি হয়ে গেল! আপনাকে ধন্যবাদ।"

ও ছুটে চলে গেল। আমি ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে নামতে লাগলাম। গুড্ম্যানের লালচে রঙের লম্বা পুরুষ্টু মুখখানা দেখে গাইয়ের পালানের কথা মনে হয়েছিল। এখন মনে হলো মুখখানা সত্যিই ঐ রকম।

॥ সাত ॥

গুড্ম্যান ভদ্রতা করে আমাকে তাঁর রচিত বইয়ের এক কপি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই বইয়ের সঙ্গে তিনি যে চিঠি পাঠিয়েছিলেন সেই চিঠিতে লিখেছিলেন যে, সাক্ষাতের সময় তিনি এই রচনার উল্লেখ করেননি···আমাকে এটা পাঠিয়ে অবাক্ করে দেওয়ার জন্য। তাঁর এই চিঠিখানার বাক্ভঙ্গীতেও একটা গুরুগম্ভীর তামাসার ঢঙ্ ছিল। তাঁর ধারণা—এই ধরনের গুরুগম্ভীর তামাসার ভাষ্য বুঝি পত্র লেখার একটা বিশেষ কায়দা। তাঁর কণ্ঠস্বর, তাঁর অট্টহাসি, তাঁর নিজের জাহির-করা পরিহাসপ্রিয়তা, সব মিলিয়ে মনে হোলো

পরিবারের কোনো স্থূলরুচি বৃদ্ধ যেন পরিবারের কনিষ্ঠের জন্য অত্যন্ত দামী একটা উপহার নিয়ে হাজির হয়েছেন।

কিন্তু মিঃ গুড্‌ম্যান অভিনয়ে নিতান্ত অক্ষম। তিনি বইখানা লিখেছেন বলে কিংবা নিজের কাজকর্ম ফেলে আমার পরিবারের একজনের নামকে সাধারণ্যে প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছেন বলে যে আমি খুশী হবো একথা তিনি মুহূর্তের জন্যও বিশ্বাস করেননি। তিনি সব সময়েই জানতেন যে, তাঁর রচিত বইটা ছাইভস্ম ; জানতেন যে, এর বাঁধাই, মোড়কের কাগজ, মোড়কের ভিতর দিকে পুস্তক পরিচিতি, এমনকি এই বইয়ের কোনো সমালোচনা, সংবাদপত্রের কোনো বিজ্ঞাপনেই প্রতারিত হবার পাত্র আমি নই। তিনি কী কারণে এ ব্যাপারটা আমাকে আগে জানতে দেননি তা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। হয়তো ভেবেছিলেন যে, আমি চতুরের মতো নিজের বইখানা তাড়াহুড়ো করে লিখে ও প্রকাশ করে ওঁর রচনার সঙ্গে এর সংঘর্ষ ঘটিয়ে দেবার তালে আছি।

তিনি যে শুধু তাঁর রচিত বইখানাই পাঠালেন তাই নয়, তিনি আমাকে যে কাগজপত্র দেবো বলেছিলেন সেটাও এইসঙ্গে পাঠিয়ে দিলেন। এ সব ব্যাপার আলোচনার উপযুক্ত স্থান এ নয়। এই সব কাগজপত্র আমি আমার উকিলের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম এবং ইনি ইতিমধ্যে তাঁর সিদ্ধান্তও জানিয়ে দিয়েছিলেন। এখানে এইটুকু বলে শেষ করবো যে, সাংসারিক আচার-ব্যবহারে সেবাস্তি-য়ানের অনভিজ্ঞ সারল্যকে গুড্‌ম্যান জঘন্যতম ভাবে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধির উদ্দেশ্যে ব্যবহার করেছেন। মিঃ গুড্‌ম্যান কখনো যথার্থ লিটারারি এজেন্ট বা সাহিত্য প্রকাশনার এজেণ্টের কাজ করেননি। তিনি বই নিয়ে জুয়ো খেলেছেন। বুদ্ধিমান, সৎ ও পরিশ্রমী সাহিত্য-এজেণ্টদের দলে তাঁর স্থান নাই। যাক্, এই পর্যন্ত থাক। তাই বলে পাঠক মনে করবেন না যে, আমি 'সেবাস্তিয়ান নাইটের ট্রাজেডি', অন্য অর্থে 'গুড্‌ম্যানের প্রহসন' প্রসঙ্গের আলোচনা সেরে ফেলেছি।

॥ আট ॥

মায়ের মৃত্যুর দু'বছর পরে সেবাস্তিয়ানের সঙ্গে আমার আবার সাক্ষাৎ হয়েছিল এর মধ্যে তাঁর কাছ থেকে মাঝেমাঝে চেক ছাড়া একখানা পিক্‌চার পোস্টকার্ড পেয়েছিলেম। এই চেকগুলো তিনি আমার আপত্তি গ্রাহ্য না করেই পাঠাতেন। ১৯২৪-এর নভেম্বর বা ডিসেম্বর মাসের এক ধূসর অপরাহ্নে প্যারিসে সাঁজেলিজে ধরে এতোয়ালের দিকে এগোতে এগোতে একটা জনপ্রিয় কাফের কাঁচের ওধারে সেবাস্তিয়ানকে হঠাৎ দেখতে পেলেম। মনে আছে, ইচ্ছা হোলো যেমন চলছিলেম তেমনই চলে যাই। উনি প্যারিসে এসেছেন কিন্তু এ সংবাদটা যে আমাকে দেওয়া প্রয়োজন মনে করেননি এই রূঢ় সত্য হঠাৎ বেদনার মতো বাজল। কিন্তু আর একবার ভেবে কাফেতে ঢুকলেম। ঢুকেই সেবাস্তিয়ানের চকচকে কালোচুলের মাথার পিছনটা দেখতে পেলাম। দেখলাম ঠিক তার সম্মুখে বসে আছে একটা মেয়ে চোখে চশমা, কেমন যেন অবসন্ন-অবসন্ন ভাব। মেয়েটা চিঠি পড়ছিল। আমি কাছাকাছি এগিয়ে যেতেই সে একটু ম্লান হেসে চিঠিটা ফিরিয়ে দিলে সেবাস্তিয়ানকে। তারপর, চোখ থেকে হাড়ের ফ্রেমের চশমাটা নামিয়ে রাখলে।

"টাকা পয়সার দিক থেকে ভালই মনে হচ্ছে, না ?" জিজ্ঞাসা করলেন সেবাস্তিয়ান, আর ঠিক সেই মুহূর্তেই আমি হাত রাখলাম তাঁর কাঁধে। "ও এইযে !..." মুখ তুলে আমার দিকে চেয়ে বললেন, "আমার ভাই, মিস্ বিশপ ! বোস্ জিরিয়ে নে !" মেয়েটি মোটামুটি সুন্দরী। শান্ত-শান্ত ভাব। গায়ের রঙ্ ফ্যাকাসে, ছোপধরা। গাল দুটো ঈষৎ লাল, আবছা নীল চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ, বেশীদূর পৌঁছায়না।

ঠোঁট দুটো পাতলা। পরনে একটা ছাই রঙের আঁট-সাট গাউন, নীল স্কার্ফ, আর একটা ছোট্ট তেকোনা হ্যাট। চুল সম্ভবতঃ বব্ করা।

সেবাস্তিয়ান বললেন, "এই তোকে টেলিফোন করতে যাচ্ছিলাম!" কথাটায় সন্দেহ হোলো।

"আমি শুধু আজকের মতো এখানেই আছি, কালই ফিরে যাচ্ছি লণ্ডনে। কী খাবি?"

ওঁরা কফিতে চুমুক দিচ্ছিলেন। ক্লেয়ার বিশপের চোখের পাতা কাঁপল, ব্যাগ হাতড়ে রুমাল বের করে লালচে নাকের একদিকের ফুটোতে সেটা বুলিয়ে অপরটার দিকে মনোযোগ দিলেন। "সর্দিটা বাড়ছে" বলে খুট করে হাতব্যাগটা বন্ধ করলেন।

এই মুহূর্তে যে স্বাভাবিক প্রশ্নটা আমার মুখে এল তার উত্তরে সেবাস্তিয়ান বললেনঃ "খুব চমৎকার আছি। আমি সন্ত একখানা উপন্যাস লিখে শেষ করেছি। চিঠি থেকে মনে হচ্ছে উপন্যাসটা প্রকাশকের পছন্দই হয়েছে। 'পুরুষ রবিনের প্রতিশোধ' উপন্যাসের এই নামটাও তিনি সমর্থন করেছেন যদিও ক্লেয়ারের পছন্দ হয়নি নামটা।"

ক্লেয়ার বললেনঃ "আমার মনে হয় বইয়ের নামটা কিম্ভূত। পাখীতে কি প্রতিশোধ নেয়?"

সেবাস্তিয়ান আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, "নামটায় একটা পরিচিত ছড়ার ইঙ্গিত আছে।"

"ইঙ্গিত" ক্লেয়ার উত্তর দিলেন, "উদ্ভট ইঙ্গিত। তোমার আগের নামটাই ভাল ছিল।"

"কি জানি,…প্রিজম্…প্রিজমের মতো কানা…তিনফলা মণি… সেবাস্তিয়ান নিম্নস্বরে বললেন, "ওটা কিন্তু আমার ঠিক মনঃপূত হচ্ছে না…বেচারা রবিন পাখীকে তোমার কেন যে এতো অপছন্দ!"

ক্লেয়ার বললেনঃ "বইয়ের নামের মধ্যে তার নিজস্ব স্বাদের ইঙ্গিত থাকবে, বিষয়বস্তুর ব্যাখ্যানা থাকবে না!"

সেবাস্তিয়ান এই প্রথম আমার সামনে সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করলেন। আর এইই শেষ। তাঁকে এই ধরনের খোস মেজাজে আমি আর কোনো দিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। ছিম্‌ছাম্‌ সুস্থ চেহারা ফর্সা মুখের আদলটা ভারী সুন্দর। কিন্তু দু'গালে ফর্সা রঙ্‌ কাল্‌চে হয়ে গেছে (বাইরে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গেলে তাঁকে দুবার কামিয়ে যেতে হোতো…এ এক মহা দুর্ভাগ্য) কিন্তু এই মুখখানায় সচরাচর যে রুগ্ন ফ্যাকাসে ভাবটা লেপ্‌টে থাকতো সেই ভাবটার লেশমাত্র ছিল না এখন। দেখলাম তাঁর ঈষৎ সূচোলো বড় বড় কানদুটো টক্‌টক্‌ করছে। তিনি খুশী হলে এই খুশীর উত্তেজনায় তাঁর কান রাঙা হয়ে উঠতো। আর আমি ? আমি ঠোঁট চেপে কাঠ হয়ে বসে রইলাম। মনে হোলো নিতান্তই অনাহূত এসে পড়েছি।

ওয়েস্ট কোটের পকেটে দুটো আঙুল গুঁজে দিয়ে সেবাস্তিয়ান জিজ্ঞাসা করলেন, "সিনেমা টিনেমা কোথাও যাওয়া যাক্‌ কী বলো?"

ক্লেয়ারের একটা দস্তানা হারিয়ে গেছে। টেবিলের নিচে, মখমলমোড়া চেয়ারের তলায় সেটাকে খুঁজতে গিয়ে কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। ক্লেয়ারের গা যেন কী একটা আতরের মৃদু গন্ধ ছড়াচ্ছে ! কিছুক্ষণ পরে আমিই দস্তানাটা খুঁজে পেলাম। মুখের চামড়ার ছাইরঙের একটা দস্তানা। ভিতরে সাদা লাইনিং আর কব্জির ঘেরটায় ফ্রিন্‌জ্‌। ক্লেয়ার ধীরেসুস্থে হাতে দস্তানাটা পরতে পরতে উঠে এল। ঘুরন্ত দরজা ঠেলে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। ক্লেয়ার একটু বেশী লম্বা, শিরদাঁড়া খাড়া, সুডোল গোড়ালি, পায়ে চ্যাপ্‌টা হিলের জুতো।

আমি বললাম : "আমার পক্ষে তোমাদের সঙ্গে কিন্তু সিনেমা দেখতে যাওয়া সম্ভব নয়। কিছু মনে কোরো না, আমার একটু কাজ আছে…ও হ্যাঁ, তুমি ঠিক কখন ফিরে যাচ্ছ ?"

"ও, যাওয়ার কথা বলছিস্‌ ? আজকে রাত্রেই !…কিন্তু আবার

শিগ্‌গির আসছি···তোকে আগে না জানিয়ে বোকামি করেছি··· যাই হোক, আমাদের সঙ্গে কিছুটা পথ তো আসতে পারিস।”

ক্লেয়ারকে জিজ্ঞাসা করি : “প্যারিস আপনি ভালো ভাবে চেনেন?” হঠাৎ থম্‌কে দাঁড়িয়ে আমার প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে ক্লেয়ার বলে উঠ্‌লেন : “ঐযা! আমার হাতের প্যাকেটটা?”

“এক্ষুণি নিয়ে আস্‌ছি” বলে সেবাস্তিয়ান কাফের দিকে ফিরে গেলেন। চওড়া ফুটপাথ ধরে, ক্লেয়ার ও আমি আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকি। মিইয়ে-পড়া স্বরে আমার আগের প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করি।

“হ্যাঁ, মোটামুটি, এখানে আমার কয়েকজন বন্ধুবান্ধবও আছেন। ক্রীশমাস পর্যন্ত এখানে এদের কাছেই থাকবো।”

সেবাস্তিয়ানকে দেখে মনে হোলো উনি খুব ভাল আছেন। এ কথা বললাম ক্লেয়ারকে।

“বোধ হয়” বলে ক্লেয়ার ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে দেখে নিয়ে—আমার দিকে চোখ মটকে বললেন, “প্রথম যখন দেখি তখন মনে হয়েছিল মানুষটা খতম হয়ে এসেছে।”

“কখন?” বোধ হয় এই রকম একটা প্রশ্নই করেছিলাম। উত্তরটা মনে আছে।

“গেল বসন্তে, লণ্ডনে, একটা পার্টিতে—পার্টিতো নয়, যন্ত্রণা! হয়তো পার্টিতে ছিলেন বলেই এমনধারা নিষ্প্রাণ মনে হয়েছিল ওঁকে। পার্টিতে উনি একেবারেই নিবে যান।”

“এই নাও তোমার মিষ্টির বাক্স।” ‘মিষ্টি’ কথাটার ফরাসী প্রতিশব্দ বঁবঁ-কে ইংরেজী কায়দায় বঙ্গ্‌বঙ্গ্‌ বললেন। সেবাস্তিয়ানের কণ্ঠস্বর শুনলাম পিছন থেকে। দু’জনকেই লক্ষ্য করে বলি, “আমি কিন্তু আণ্ডারগ্রাউণ্ড স্টেশনে যাচ্ছি।” স্টেশনটাকে ডান হাতে রেখে আমরা চলেছি! এভিন্যুর মোড় পেরোবার সময় ক্লেয়ার একটা সাইকেলের নীচে চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেলেন। সেবাস্তিয়ান

চকিতে তাঁর ডানহাতের কনুইটা ধরে ফেলে বলে উঠলেন : "আচ্ছা, হাঁদা তো !"

ফুটপাথের কাছে এসে ক্লেয়ার বলে উঠ্‌লেন, "বাব্বাঃ, কত পায়রা !"

"সেবাস্তিয়ান সায় দিলেন, "হ্যাঁ, আর কী গন্ধ ?" '

"কীসের গন্ধ ? ইস্‌, আমার নাক একদম বুজে গেছে।" নাক নেড়ে-নেড়ে শুঁকবার চেষ্টা করলেন ক্লেয়ার। তাঁর পায়ের কাছে একদল মোটাসোটা পায়রা হেলে দুলে চরে বেড়াচ্ছে। সেই দিকে চেয়ে রইলেন।

ফারনিচারবাহী একটা ভ্যান একখানা প্রাইভেট মোটর গাড়ীর সঙ্গে ধাক্কা এড়াতে গিয়ে ঘ্যাঁচ শব্দ করে দাঁড়িয়ে গেল। সেই শব্দে পায়রাগুলো আকাশে উড়ে পড়ে চক্রাকারে ঘুরতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে নামল আর্ক দ্য ত্রিয়োম্ফের মুক্তোর মতো ঘোলা কাল্‌চে রঙের নক্সাকাটা কিনারাতে। কতকগুলো উড়ে চলে গেল। মনে হোলো স্তম্ভগুলোর মাথার ওপর খোদাই করা যে নক্সা সেই নক্সার পাত্‌লা পাত্‌লা টুকরো আকাশে উড়ে পড়েছে। কয়েক বছর পরে সেবাস্তিয়ানের তৃতীয় বইয়ে একটা চিত্রকল্প পেয়েছিলাম : "পাষাণ ডানা মেলে উড়েছে।" এই পর্যন্ত পোঁছে আমরা খুশীমনে যে যার পথে পা বাড়ালেম। মনে এই ছবিটা আঁকা রয়েছে। সেবাস্তিয়ানের বর্ষাতিটা ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে, তার সঙ্গে চলেছে ক্লেয়ারের ছাই রঙের মূর্তিটা। ক্লেয়ার সেবাস্তিয়ানের বাহুলগ্না। নিজের চলার ছাঁদ বদলে তিনি সেবাস্তিয়ানের হুস্‌হুস্‌ করে চলার সঙ্গে ছাঁদ মিলিয়ে দিয়েছেন।

মিস্‌ প্র্যাটের কাছ থেকে সামান্য কিছু জেনেছিলাম। এটুকু জানার পর আরও কিছু জানার আগ্রহ হয়েছিল। সেবাস্তিয়ানের জিনিসপত্রের মধ্যে ক্লেয়ার বিশপের লেখা কোনো চিঠি পাওয়া যায় কিনা খুঁজে দেখতে আমাকে অনুরোধ করেছিলেন মিস্‌ প্র্যাট।

মিস্ প্র্যাট আমাকে জানালেন যে, ক্লেয়ারের হয়ে তিনি এ কথা আমাকে বলছেন না। আসলে ক্লেয়ার আমাকে এ কথা বলতে মানা করেছিলেন তাঁকে। এমন কি মিস্ বিশপ, প্র্যাটও আমার এই সাক্ষাৎকারের বিষয়ে কিছুই জানতেন না। বছর তিনচার হোলো মিস্ বিশপ বিয়ে করেছেন ও নিজের অতীত সম্বন্ধে কোনো কথা বলে নিজেকে খেলো করতে চান না। মিস্ প্র্যাট সেবাস্তিয়ানের মৃত্যুসংবাদ খবরের কাগজে বেরোনোর সপ্তাহখানেক পরে ক্লেয়ারকে দেখতে গিয়েছিলেন কিন্তু ক্লেয়ার ও প্র্যাট পরস্পরের দীর্ঘ দিনের বান্ধবী হওয়া সত্ত্বেও এই ব্যাপার নিয়ে তাঁদের মধ্যে কোনো আলোচনাই হয়নি (বান্ধবী মানে এই ঃ পরস্পরের জ্ঞাতসারে যতটুকু জানার কথা তার চেয়ে একে অপর সম্বন্ধে অনেক বেশী জানে)।

ক্লেয়ার বিশপ বলেছিলেন শান্ত স্বরে, "মনে হয় উনি খুব একটা অসুখী ছিলেন না। তাই না? আমার চিঠিগুলোও রেখেছিলেন কিনা কে জানে?"

ক্লেয়ারের কথা বলার ভাব, তাঁর চোখ-কোঁচকানো ভঙ্গী আর দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলে আলোচনার মোড় ফিরিয়ে দেওয়া দেখে মিস্ প্র্যাটের মনে হয়েছিল চিঠিগুলো নষ্ট করা হয়েছে জানলে যেন তাঁর বান্ধবী স্বস্তি পেতেন। ক্লেয়ারের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব কিনা জিজ্ঞাসা করলাম মিস্ প্র্যাটকে। জানতে চাইলাম ক্লেয়ারকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তাঁর কাছ থেকে সেবাস্তিয়ান সম্পর্কে কিছু জানা যাবে কি না। মিস্ প্র্যাট বললেন, ক্লেয়ারকে তিনি যতদূর জানেন তাতে আমার এই অনুরোধও তাঁর কাছে ব্যক্ত করার সাহস নেই তাঁর। এক কথায় বললেন, "অসম্ভব।" নিমেষের জন্য একটা ইতর প্রলোভন জেগে উঠল মনে। একবার ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের সুযোগ দেন তো চিঠিগুলো তাঁকে ফেরত দিতে পারি। এ কথা আমার মনে উদয় হোলো, তার কারণ ওঁর সঙ্গে দেখা করার জন্যে মনে মনে আমি

উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলাম। দেখা হলে শুধু এইটুকু লক্ষ্য করতাম ; একটা বিশেষ নাম উচ্চারণ করলে তার ছায়াটা ওঁর মুখের ওপর কেমন করে ভেসে যায়। না, সেবাস্তিয়ানের অতীত নিয়ে আমি ব্ল্যাকমেল করতে চাই না। এ অতীত আমার কাছে অসৎ বেসাতির কোনো পণ্য হয় তা আমি চাই না। প্রকাশ্যে বললাম, "চিঠিগুলো পুড়ে গেছে।" বলে, নাছোড়বান্দার মতো মিস্ প্র্যাটকে উপরোধ করতে থাকি, "চেষ্টা করতে ক্ষতি কি ?" ক্লেয়ারকে আমাদের কথা-বার্তা জানিয়ে তিনি কি তাঁকে বিশ্বাস করাতে পারবেন না যে, আমি তাঁর সঙ্গে সামান্য একটুক্ষণের জন্যে দেখা করতে চাই আর এই দেখা করার মধ্যে কোনো অভদ্র উদ্দেশ্য নেই ?

মিস্ প্র্যাট বললেন, "ঠিক কি জানতে চান বলুন তো ? আমি নিজেই অনেক কিছু জানি।"

মিস্ প্র্যাট্ অনেকক্ষণ ধরে ক্লেয়ার আর সেবাস্তিয়ানের কথা বললেন। খুব বিশদ ভাবেই বললেন তবু স্ত্রীলোকের যা স্বভাব তা এড়িয়ে যেতে পারলেন না, অর্থাৎ বর্তমানের দৃষ্টি দিয়ে অতীতের ব্যাখ্যা করলেন মাত্র।

কথার মাঝখানে ওঁকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করি, "আপনি কি বলতে চান যে, সেই অন্য মহিলার নাম কেউ কোনোদিন জানতে পারেনি ?'

"না"

"কিন্তু, আমি তাঁকে খুঁজে বের করবো।"

"কখনোই পারবেন না।"

"এর সূত্রপাত কখন থেকে বললেন ?" আমি কথা ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করি। প্রসঙ্গটা সেবাস্তিয়ানের অসুখের।

"তা ঠিক বলতে পারি না। আমি তাঁর, প্রথম য়্যাটাকটা দেখেছি। কোনো একটা রেস্তোরাঁ থেকে আমরা বেরিয়ে পড়েছি। বাইরে খুব ঠাণ্ডা পড়েছে। উনি ট্যাক্সি খুঁজছেন, পাচ্ছেন না।

সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন, রেগে উঠেছেন। একটা ট্যাক্সি একটু দূরে এসে দাঁড়াতে ছুটলেন তার দিকে। কিন্তু মাঝখানে থেমে গেলেন। বললেন, তাঁর শরীরটা কেমন করছে। মনে আছে ছোট্ট একটা কৌটো থেকে পিলের মতো কী একটা বের করে সিল্কের রুমালে চেপে গুঁড়িয়ে নিলেন। তার পরে সেই গুঁড়োসুদ্ধ রুমালটাকে মুখের ওপর চেপে চেপে বুলিয়ে নিলেন। সাতাশ বা আটাশ সালের কথা।"

আমি আরও কয়েকটা প্রশ্ন করলাম। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব প্রশ্নের সাধ্যমতো উত্তর দিলেন। মর্মন্তুদ কাহিনীটা বলে চললেন।

ভাবি, ক্লেয়ারকে একবার যদি দেখতে পেতাম। চোখের এক পলক দৃষ্টি, একটা কথা, বিশেষ ধরনের কণ্ঠস্বর—এরাই মরা অতীত-টাকে বাঁচিয়ে তুলতে যথেষ্ট।

এরপর এক সোমবার সকালে ক্লেয়ারের সঙ্গে সত্যই দেখা করতে গেলাম। পরিচারিকা এসে আমাকে ছোট্ট একটা বসার ঘরে নিয়ে গেল। রাঙামুখী ঐ কাঁচা যুবতীর কাছথেকে অন্ততঃ এইটুকু জানা গেল যে, ক্লেয়ার বাড়ীতে রয়েছেন। মিস্ প্র্যাটের কাছথেকে জেনেছিলাম যে, রবিবার ছাড়া সপ্তাহের অন্য দিনগুলোতে মিস্ বিশপ শহরে কাজে বেরিয়ে যান। ভাবলে অবাক্ লাগে, ক্লেয়ার নিজেরই উপাধিওলা একটা লোককে বিয়ে করেছেন। এই লোকটার সঙ্গে কিন্তু তাঁর কোনো পারিবারিক সম্পর্ক নেই। এ একেবারে দৈবাৎ যোগাযোগ ছাড়া কিছু নয়। আমার সঙ্গে উনি দেখা করবেন তো?

অবস্থাপন্ন বলেই মনে হয়। তবে খুব একটা কিছু নয়। বাড়ীর একতলায় হয়তো একটা ইংরেজী এল্ আকারের বৈঠকখানা, তার ওপর দু'খানা শোবার ঘর। গোটা রাস্তাটায় এমনি সব সরু সরু বাড়ী ঘেঁষাঘেঁষি দাঁড়িয়ে রয়েছে।···অনেক ভেবেচিন্তে রাজী হয়েছেন···আগে থাকতে টেলিফোন করে আসা উচিত ছিল কি? মিস্ প্র্যাট কি চিঠির কথা বলে দিয়েছেন? হঠাৎ শুনতে পেলাম

সিঁড়ি বেয়ে হাল্কা পা ফেলে ফেলে কে নেমে আসছে। চেয়ে দেখি একজন বিপুলাকার লোক হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলেন। পরনে কালো ড্রেসিং গাউন। ড্রেসিং গাউনে লালরঙের পটিতে ধার মোড়া।

"ক্ষমা করবেন, এই পোশাকে এসেছি বলে। খুব ঠাণ্ডা লেগেছে কিনা! আমার নাম বিশপ। আপনি আমার স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন না?" স্মৃতির এক চমকে মনে পড়ল সেই বারো বছর আগের সেই ঠাণ্ডা লাগা। ঠাণ্ডা লেগে ক্লেয়ারের নাকের বর্ণ লাল হয়ে গিয়েছিল আর গলার স্বর বসে গিয়েছিল। সেই ঠাণ্ডা লাগাটাকেই আবার নতুন করে দেখছি নাকি? ঠিক সেই সর্দিটাই?

"হ্যাঁ, তাই ইচ্ছা ছিল, অবশ্য তিনি যদি আমাকে ভুলে না গিয়ে থাকেন! একবার প্যারিসে আমাদের পরিচয় হয়েছিল!"

মিঃ বিশপ বললেন, "মনে ঠিকই আছে, তবে"—সোজা আমার দিকে চেয়ে বললেন—"মাপ করবেন, আপনার সঙ্গে দেখা করা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে!"

জিজ্ঞাসা করলাম, "তাহলে কি পরে আসবো?"

কয়েক মুহূর্ত নীরব থেকে বিশপ জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার এই সাক্ষাৎকারের সঙ্গে আপনার দাদার মৃত্যু প্রসঙ্গের কোনো যোগাযোগ আছে?" ভদ্রলোক প্রশ্নটা করে সামনে দাঁড়িয়ে ড্রেসিং গাউনের পকেটে হাত দুটো পুরে চেয়ে রইলেন আমার দিকে। হাল্কা রঙের চুলগুলো খুব তাড়াতাড়ি ব্যাক ব্রাশ করা। ভদ্রলোক ভালই। আশাকরি এই কথাটা এখানে লিখলাম বলে উনি কিছু মনে করবেন না। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে ইদানীংকালে একটা মর্মন্তুদ অবস্থায় আমাদের মধ্যে পত্রালাপ ঘটে এবং এর ফলে সেদিনকার সেই কথোপকথনের ফলে পরস্পরের মধ্যে যে ঈষৎ বিরাগ জন্মেছিল তা সম্পূর্ণ ধুয়ে মুছে গেছে।

"যদি তাইই হয়, তাহলে কি দেখা হবে না?" জিজ্ঞাসা করলেম। প্রশ্নটায় যে অবিমৃষ্যকারিতা ছিল তা এখন স্বীকার করি।

মিঃ বিশপ বললেন, "কারণ যাই হোক, আপনার সঙ্গে তাঁর দেখা হবে না।"

ঈষৎ নরম হয়ে বললেন, "কী করবো বলুন।" (উনি বুঝে-ছিলেন যে, আমি নিরাশ হয়ে নিজের মধ্যে গুটিয়ে আসছিলেম)। মনে হয়···অন্য কিছু হলে···বুঝতে পারছেন তো, আমার স্ত্রী তাঁর অতীত বন্ধুত্বের কথা স্মরণ করতে চান না। আর, যদি কিছু মনে না করেন তো স্পষ্টই বলি, আপনার আসাই উচিত হয়নি। ফিরে এলেম। বুঝলেম হিসেবে ভুল করেছি। ক্লেয়ারকে একলা পাওয়ার পর কী কী বলতেম তার মহড়া দিতে লাগলেম মনে মনে। নিজেকে বোঝালেম যে, উনি যদি একলা থাকতেন তাহলে নিশ্চয়ই আমার সঙ্গে দেখা করতেন। অদৃষ্টপূর্ব বাধার কাছে কল্পিত বাধাগুলো এমনিভাবেই ছোটো দেখায়। আমি বলতে পারতেম, "সেবাস্তিয়ানের কথা থাক্। আসুন 'প্যারিসের গল্প করি। প্যারিসকে আপনি ভালোই চেনেন, তাই না? সেই পায়রাগুলোকে আপনার মনে আছে? আচ্ছা, ইদানীং কী পড়ছেন? কোন ফিল্মটা দেখেছেন? এখনো কি আগের মতো হাতের দস্তানা বা হাতব্যাগ ভুলে ফেলে আসেন?" কিংবা অন্য ভাবে আরও সোজা সাহসিক আক্রমণ চালাতে পারতেম। "জানি, বলতে গিয়ে আপনি নাড়া খাবেন তবু অনুরোধ করবো, দয়া করে কিছু বলুন তাঁর সম্বন্ধে। ছোট্ট ছোট্ট ঘটনাগুলো বলুন। যদি না বলেন তা হলে এই ঘটনাগুলো হারিয়ে যাবে, একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এরা তো আমার বইয়ে টিকে থাকতে পারে!" আমার ধারণা, এইভাবে বললে তিনি কিছুতেই না বলতে পারতেন না।

দু'দিন পরে মনে এই ধারণাটাকে শক্ত করে গেঁথে আবার একবার চেষ্টা করলেম দেখা করতে। এবার আরও সাবধান হবার চেষ্টা করলেম। সেদিন সকালটা চমৎকার, তখনো বেলা বাড়েনি. মনে ধারণা হোলো তিনি নিশ্চয়ই এই রকম সকালে নিজেকে

বাড়ীতে আটকে রাখবেন না। উনি যে পথে বেরোন সেই পথের একটা কানাচে দাঁড়িয়ে থাকবো—যতক্ষণ না ওঁর স্বামী শহরে কাজে বেরিয়ে যান। অপেক্ষা করতে করতে হয়তো দেখবো উনিও বেরিয়ে পড়েছেন। অমনি এগিয়ে গিয়ে কথা বলবো। কিন্তু যেমনটি ভেবেছিলেম ঠিক তেমনটি ঘটল না।

আমি ঠিক জায়গাতে পৌঁছতে না পৌঁছতেই দেখি ক্লেয়ার বেরিয়ে পড়েছেন। পথের একদিকে পৌঁছতে পৌঁছতে দেখি ক্লেয়ার পথ পেরিয়ে অন্যদিকে চলে গেছেন। অনেক বছর আগে ওঁকে মাত্র আধ ঘণ্টার জন্যে দেখেছিলেম। তবু চিনতে পারলেম। মুখখানা চুপসে গেছে, অস্বাভাবিক রকম মোটা হয়েছেন, তবু চিনতে দেরি হোলো না। ধীরে ধীরে শরীর টেনে টেনে চলেছেন। পথ পেরিয়ে কাছাকাছি পৌঁছে বুঝতে পারলেম তিনি অন্তঃসত্ত্বা এবং তাঁর এই অবস্থা শেষ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

আমার নিজের স্বভাবে উচ্ছলতার একটা ঝোঁক আছে। এই উচ্ছলতা মাঝে মাঝে আমাকে হিসেবের সীমা লঙ্ঘন করিয়েছে। দেখি, আমি মুখে হাসি নিয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে চলেছি, তবু এই কয়েক নিমেষের মধ্যেই মনে মনে পরিষ্কার বুঝতে পারলেম যে, আমি কোনো রকমেই ওঁর সঙ্গে কথা বলতে বা পথে পরিচিতের মতো ওঁকে ডাকতে পারবো না। সেবাস্তিয়ানের প্রসঙ্গ বা আমার পরিকল্পিত জীবনচরিত কিংবা মিঃ বিশপের সঙ্গে আমার কথাবার্তা যে এই আলাপে বাধা তা নয়। আসল বাধা উনি নিজে—ওঁর গম্ভীর আত্মমগ্নতা। আমি জানতেম যে, নিজের পরিচয় দেওয়া সম্ভব নয় এ অবস্থায়। তবু, ঐ যে বলেছি, আমার স্বভাবের উচ্ছলতা! ঐ উচ্ছলতার বেগে এগিয়ে পথের অন্যদিকে পৌঁছে ওঁর গায়ের ওপর যেন হুমড়ি খেয়ে পড়লেম। উনি ভারী দেহটাকে টেনে নিয়ে সরে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে পড়ে ক্ষীণদৃষ্টি চোখ দুটো তুলে তাকালেন। যাক্, বাঁচা গেল, আমাকে তাহলে চিনতে পারেননি। ওঁর গুঁড়ো-

কাঠের মতো পাণ্ডুর মুখের গম্ভীর ভাবটায় বেদনার মতো কিছু একটা মিশে ছিল। দেখলে বুকটা টন্ টন্ করে উঠতো। আমরা দুজনেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেম। পাঠক হয়তো শুনলে হাসবেন, নিজের প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে পকেটে হাত পুরে যা পেলাম তাই বের করে এনে জিজ্ঞাসা করলেম, "দেখুন, আপনি কি এটা ফেলেছেন?" "না" উনি হাসলেন। নৈর্ব্যক্তিক হাসি। জিনিসটা এক মুহূর্ত চোখের কাছে ধরে বললেন "না।" তারপর সেটা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ে নিজের পথে চলে গেলেন। আমি হাতে একটা চাবি ধরে দাঁড়িয়ে রইলেম। যেন এটাকে এইমাত্র পথ থেকে কুড়িয়ে তুলেছি। চেয়ে দেখি, এ যে সেবাস্তিয়ানের ফ্ল্যাটের দরজার চাবি। ভাবলেম এই মাত্র এই চাবিটাকে ক্লেয়ার তাঁর অবুঝ অন্ধ আঙুল দিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারে নেড়ে চেড়ে দেখেছেন। ডাকতেই কী রকম একটা বেদনায় মনটা টনটন্ করে উঠল।

॥ নয় ॥

ওঁদের দুজনের মধ্যে সম্পর্ক ছ'বছর টিকেছিল। এই সময়ের মধ্যে সেবাস্তিয়ান তাঁর প্রথম দুখানা উপন্যাস, 'তিনপলা মণি' ও 'সাফল্য' (The Prismatic Bezel ও Success) রচনা করেছিলেন। প্রথমটা রচনা করতে সময় লেগেছিল সাত মাস (এপ্রিল-অক্টোবর ১৯২৪) আর দ্বিতীয়টা সময় নিয়েছিল বাইশ মাস (জুলাই ১৯২৫—এপ্রিল ১৯২৭)। ১৯২৭ সালের হেমন্ত আর ১৯২৯ সালের গ্রীষ্মকালের মধ্যে তিনি তিনটে গল্পও লিখেছিলেন। এইগুলো পরে (১৯৩২-এ) একত্রে 'মজার পাহাড়' Funny Mountain) নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

বলতে গেলে, সেবাস্তিয়ানের রচনার পাঁচ ভাগের তিন ভাগ ক্লেয়ারের চোখের ওপর রচিত। বাল্যকালে যে সব রচনা তিনি

পুড়িয়ে দিয়েছিলেন (যেমন কেম্‌ব্রিজে লেখা কবিতাগুলো) সেগুলো অবশ্য এই হিসেব থেকে বাদ দিয়েছি। এই বইগুলো রচনার ফাঁকে ফাঁকে সেবাস্তিয়ান কল্পনার নানান কাঠামো তৈরি করেছেন, ভেঙেছেন আবার গড়েছেন। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, ঐ দু'বছর তিনি এক নাগাড়ে কাজে মশগুল ছিলেন। আর, এ কাজ ছিল ক্লেয়ারের মনের মতো। ক্লেয়ার তাঁর জীবনে ঢুকে পড়েছিলেন, আগে থেকে কোনো জানান না দিয়েই, দরজায় কোনো ধাক্কা না দিয়েই। (লোক যেমন নিজের বাড়ীর সঙ্গে মিল দেখে অন্যমনস্কভাবে অন্য বাড়ীতে ঢুকে পড়ে)। আর, ঢুকে পড়ে, বেরোবার রাস্তাটা ভুলে গিয়ে, থেকে গেলেন এখানে। তারপর, এই বাড়ীর অদ্ভুত প্রাণীগুলির সঙ্গে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়ে এই অদ্ভুতদর্শন প্রাণীগুলিকে আদরও করতে থাকলেন। নিজে সুখী হবার বা সেবাস্তিয়ানকে সুখী করার কোনো ইচ্ছা তাঁকে চালিত করেনি। পরে কী ঘট্‌তে চলেছে তার সামান্যতম বোধও ছিল না। তাই তিনি সেবাস্তিয়ানের সঙ্গে মিলিত জীবনকে নিতান্ত স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। পৃথিবীবাসীর পক্ষে চাঁদের কোনো পাহাড়ে খাটানো তাঁবুর ভেতর জীবন কল্পনা করা বরং সম্ভব, কিন্তু ক্লেয়ারের পক্ষে সেবাস্তিয়ান ছাড়া জীবন কল্পনা করা সম্ভব ছিল না। মনে হয়, ক্লেয়ার যদি সেবাস্তিয়ানের সন্তানের মা হয়ে পড়তেন তা হলে ওঁরা নিজেদের বিয়ের গাঁটছড়ায় নিশ্চয় বেঁধে ফেলতেন; কারণ এই ব্যবস্থাটাই হোতো তিনটে প্রাণীর সহ-অবস্থানের সহজতম উপায়। কিন্তু এমন কিছু ঘটল না, তাই সাদা পোশাক আর উৎসব যে বিবাহ তার চিন্তা তাঁদের মাথায় এল না। আমার বিশ্বাস, ব্যাপারটা ওঁদের চিন্তার মধ্যে এলে ওঁদের ভালই লাগতো। আপনারা যাকে 'গুলি মারো সংস্কারকে' ধরনের মনোভাব বলেন, সেই ধরনের মনোভাব ছিল না সেবাস্তিয়ানের। তিনি ভালভাবেই জানতেন যে, প্রচলিত নীতির প্রতিষ্ঠা উপেক্ষার ফলনও প্রকাশ

আসলে ব্যক্তির আত্মতুষ্টি এবং সংস্কারেরই খোল-ওলটানো রূপ। তিনি স্বভাবতই সহজতম নৈতিক পথকে বেছে নিতেন (যেমন তিনি শিল্পসৃষ্টির বেলায় কঠিনতম পথটা বেছে নিতেন)। কারণ এটাই তাঁর পক্ষে লক্ষ্যে উপনীত হবার সংক্ষিপ্ততম পথ। দৈনন্দিন জীবনে সমাজ নির্ধারিত সমস্যা আর তাদের মীমাংসা নিয়ে নিজেকে বিব্রত করতে তাঁর অনীহা ছিল। অপর পক্ষে শিল্পসাধনায় তিনি মাত্রাতিরিক্ত শ্রমকে স্বীকার করে নিতেন। সেবাস্তিয়ানের সঙ্গে যখন ক্লেয়ারের দেখা তখন ক্লেয়ারের বয়স বাইশ। ক্লেয়ারের মনে তাঁর পিতার কোনো স্মৃতি ছিল না। তাঁর মাও মারা গিয়েছিলেন। সৎবাপ আবার বিয়ে করেছিলেন। পরিবার সম্পর্কে তাঁর যেটুকু ক্ষীণ ধারণা ছিল তা জন্মেছিল এই দম্পতিকে দেখে। কথায় যেমন বলে, খোল নল্‌চে দুইয়েরই বদল। আসল খোল আর আসল নল্‌চে জুড়ে পরিবারের যে আসল রূপ তা ইহলোকে জানার কোনো সম্ভাবনাই ছিল না ক্লেয়ারের পক্ষে। তিনি লণ্ডনে বাস করতেন, আর্ট স্কুলে পড়তেন। শেখার মধ্যে উদ্ভট প্রাচ্য ভাষা শিখতেন— কিন্তু তাও ছাড়াছাড়া ভাবে। লোকে তাঁকে পছন্দ করতো। অস্পষ্ট অনুজ্জ্বল মুখ আর নরম নিচু কণ্ঠস্বর—শুধু এই নিয়েই তিনি অন্যের স্মৃতিতে স্থায়ী স্থান দখল করে নিতেন। যেন অপরের স্মৃতিতে বিরাজ করার একটা বিশেষ ক্ষমতা কোথাও লুকিয়েছিল তাঁর মধ্যে। তাঁর ছবিটাও স্মৃতিতে ভালোই ফুট্‌তো—স্মৃতির ফিল্মে ফটো তোলার পক্ষে অতি উত্তম। তাঁর বড় বড় হাড়-বেরকরা হাতগুলোরও একটা বিশেষ সৌষ্ঠব ছিল। তাছাড়া, নীরবে এক ধরনের হাল্কা নাচও নাচতে পারতেন। এক শ্রেণীর স্ত্রীলোক আছেন যাঁরা সংসারের সব কিছুকেই স্ব স্ব মূল্যে গ্রহণ করেন, নিজেদের আয়না বলে মনে করেন না। এই শ্রেণীর নারীর সংখ্যা খুব কম। ক্লেয়ার ছিলেন এই শ্রেণীর নারী। এটাই তাঁর সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক। মনের পেশী যে কল্পনাশক্তি, তাও তাঁর ছিল। তবে তাঁর কল্পনা শক্তিতে

পুরুষোচিত প্রবণতা ছিল। তাঁর যথার্থ সৌন্দর্যবোধও ছিল। তবে, তাঁর এই সৌন্দর্যবোধ যতটা শিল্প উপলব্ধির ক্ষেত্রে প্রকট হোতো তার চেয়ে অনেক বেশী সহজভাবে প্রকট হোতো অন্যক্ষেত্রে। যেমন উনুনে-বসানো তাওয়ার চারদিকে আগুনের গোলাকার আভার সৌন্দর্য উপলব্ধিতে। স্কাইটেরিয়ার কুকুরের দেহগঠনের সঙ্গে নদীর ধারে হিজল গাছের গুঁড়ির যে আকার সেই আকারের সমতার উপলব্ধিতে। সবার ওপর তাঁর ছিল তীক্ষ্ণ রসবোধ—নিয়তির বিরল দান। তাই তাঁকে সেবাস্তিয়ানের জীবনের সঙ্গে নিজেকে এমন ভাবে মেলাতে দেখে আশ্চর্য হইনি।

পরিচয়ের প্রাথমিক পর্যায়ে বহুবারই তাঁদের দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। হেমন্তে, তিনি যখন প্যারিসে তখন বোধহয় সেবাস্তিয়ান তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। একবার নয়, মনে হয় অনেকবারই। ইতিমধ্যে সেবাস্তিয়ানের প্রথম বইএর রচনা শেষ হয়ে এসেছিল এবং ক্লেয়ার টাইপ করা শিখে নিয়েছিলেন।

১৯২৪-এর গ্রীষ্মের সন্ধ্যাগুলো যেন টাইপরাইটারের রোলারের ভিতর দিয়ে আলগোছে পুরে-দেওয়া কাগজের মতো কালো আর বেগুনি রঙের ছাপা অক্ষর বুকে ধারণ করে বেরিয়ে এল। কল্পনায় দেখি, খোলা জানালার বাইরে ছায়া ছায়া এলম্ গাছগুলো থেকে কবোষ্ণ বৃষ্টির ঝির ঝির শব্দ উঠ্ছে, সেবাস্তিয়ানের বিলম্বিত গম্ভীর কণ্ঠস্বর (মিস্ প্র্যাট্ বলতেন, সেবাস্তিয়ান যেন 'ডিক্টেট্' করতেন না, পুরোহিতের মতো মন্ত্র উচ্চারণ করতেন) ঘরের এদিক ওদিক গড়িয়ে চলেছে, আর ক্লেয়ার টাইপরাইটারের ঝক্‌ঝকে পরিচ্ছন্ন চাবিগুলির ওপর টোকা দিয়ে চলেছেন নিরবচ্ছিন্ন। সেবাস্তিয়ান দিনের বেশীর ভাগ সময় লিখে কাটাতেন, কিন্তু তাঁর লেখা এতো শ্লথগতিতে এগোতো যে সন্ধ্যা নাগাদ দু'পৃষ্ঠার বেশী টাইপের কাজ জমতো না। এই দুটো পৃষ্ঠাও আবার বারবার টাইপ করতে হোতো। এই পাণ্ডুলিপিও আবার সেরাস্তিয়ান কেটে কেটে ছারখার

করতেন। কোনো কোনো সময়ে এমন এক কর্ম করতেন যা অন্য কোনো গ্রন্থকার করেছেন বলে জানি না। টাইপ-করা পাতা নিজের হাতে কাঁচা ইংরেজী অক্ষরে পুনরায় লিখে আবার তা 'ডিক্‌টেট্‌' করতে বসতেন। কথার সঙ্গে তাঁর লড়াই এক অমানুষিক যন্ত্রণার লড়াই। এর কারণ দুটো। প্রথম কারণ, কথা আর ভাবের মাঝখানে যে গভীর খাদ তার ওপর সেতু রচনা, এ এক যন্ত্রণা। অনুভব করতেন ঠিক কথাটা, শুধু ঠিক নয়, উপযুক্ত কথাগুলো এই খাদের ওপরে দূরত্বের কুয়াশায় মিট্‌মিট্‌ করছে, আর খাদের এপারে নগ্ন অনাবৃত অঙ্গ ভাবেরা ঐ কথার আবরণগুলো পাবার জন্য দাঁড়িয়ে হিহি করে কাঁপছে। এই অনুভব তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুলতো। তৈরী কথার মালা তিনি বর্জন করতেন, তার কারণ, যে ভাব তিনি প্রকাশ করতে চাইতেন তা আকারে প্রকারে একেবারে স্বতন্ত্র। তাছাড়া তিনি জানতেন যে, যে ধারণা সত্য, তা তার নিজস্ব মাপে তৈরী কথার পরিচ্ছদ ছাড়া প্রকট হতে পারে না। ফলে, (আরও উপযুক্ত উপমার ভাষায়) যে ভাবগুলো নগ্ন মনে হয় তারা আসলে যেন আত্মপ্রকাশের জন্যে বসনভূষণ যাচ্ঞা করে চলেছে আর, যে সব কথারা বহুদূরে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে তারাও কিছু শূন্যগর্ভ নয়। তারা অপেক্ষা করে আছে কখন, যে ভাবের তারা অংশ সেই ভাবেরা তাদিকে দীপ্ত করে তুলবে, গতিমান করে তুলবে। অনেক সময় তাঁর মনে হোতো, তিনি যেন কোনো শিশুর মতো হাতে একরাশ গোটানো তার ধরে দাঁড়িয়ে আছেন এবং তাঁকে বলা হয়েছে ঐ তারগুলো থেকে আশ্চর্য আলোক সৃষ্টি করতে। আর, আলো তিনি সত্যিই সৃষ্টি করেছেন।

কখনো কখনো তিনি কেমন করে যে আলো সৃষ্টি করলেন তা নিজেও জানতে পারতেন না। আবার কখনো তারগুলো হাতে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সব চেয়ে সম্ভাব্য যে কৌশল সেই কৌশলে নাড়া-চাড়া করতেন, তবু আলো জ্বল্‌তো না। আর, আশ্চর্য, যে ক্লেয়ার

নিজের জীবনে কখনো এক পঙ্‌ক্তি কল্পনারসপুষ্ট গদ্য বা কবিতা রচনা করেননি তিনিও সেবাস্তিয়ানের এই সংগ্রামের খুঁটিনাটি সম্পূর্ণ বুঝতে পারতেন (এটা তাঁর নিজের মিরাক্যাল বা দৈবী ক্ষমতা)। তিনি বুঝতেন যে, যে কথাগুলোকে তিনি টাইপে টাইপে ছেপে তুলছেন সেই কথাগুলো শুধু তাদের প্রচলিত অর্থের বাহক নয়। যে পথ বেয়ে সেবাস্তিয়ান প্রকাশের কোনো রাজপথে পড়তে চেয়েছেন এই কথারা সেই পথের এক একটা বাঁক, কিংবা পদচিহ্নহীন কোনো অংশ কিংবা আঁকাবাঁকা ঘুর পথের কোনো টুক্‌রো।

১৯২৪-এর নভেম্বর নাগাদ 'তিনপলা মণি' লেখা শুরু হয়। মুদ্রিত হয়ে প্রকাশিত হয় পরের বছর মার্চ মাসে। কিন্তু বইটা একেবারে মার খেয়ে যায়। ঐ সময়ের খবরের কাগজ ঘেঁটে যতদূর জানতে পেরেছি বইটার একবার মাত্র বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল কিন্তু তাও সরাসরি নয়—ঘুরিয়ে। কোনো রবিবারের কাগজে সাড়ে পাঁচ লাইনের একটা বিজ্ঞপ্তি। কিন্তু এই লাইনগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ছিল অন্য বইয়ের উল্লেখ। 'তিনপলা মণি' একখানা প্রথম উপন্যাস। তাই একে পূর্বে উল্লিখিত অমুকের বইয়ের চেয়ে কঠোরতরভাবে বিচার করা চলে না। এই বইয়ের মজাটা আমার মাথায় ঢোকেনি, কিন্তু এর অস্পষ্টতাগুলো মজার। হয়তো এর মধ্যে এমন একটা কাল্পনিক কাহিনী আছে যার সূক্ষ্ম আবেদন আমি ধরতে পারিনি। তবু, পাঠকদের অবগতির জন্য এটুকু বলতে পারি যে, যে সব পাঠকদের এ ধরনের রচনার প্রতি রুচি আছে তাঁরা এর মধ্যে পাবেন মিঃ নাইটের বর্ণনার সূক্ষ্ম কারিকুরি আর ব্যাকরণের স্থূল কেরামতি।

এই বসন্তকালটা সম্ভবতঃ সেবাস্তিয়ানের জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়। ইতিমধ্যে একটা রচনা শেষ করেছেন, অন্য একটা রচনার প্রাণ স্পন্দন অনুভব করছেন। স্বাস্থ্য খুব ভালো। পাশে মনোমতো সঙ্গী। এর আগে স্প্যানিশ আমেরিকার খামার হাথিয়েন্দার

ছেঁকে-ধরা দুর্বার পিঁপড়ে ঝাঁকের মতো যে সব ছোটো ছোটো দুশ্চিন্তা আক্রমণ করতো তারা তাঁকে সম্পূর্ণ রেহাই দিয়েছে। ক্লেয়ার তাঁর চিঠি পোস্ট করতেন, ধোপার হিসেব রাখতেন, কামানোর ব্লেড তামাক আর নোন্‌তা বাদামের যোগান ঠিক রেখে দিতেন। নোনতা বাদামের প্রতি সেবাস্তিয়ানের একটা প্রকৃতিগত দুর্বলতা ছিল। ক্লেয়ারের সঙ্গে বাইরে ডিনার সেরে নাটক দেখতে যেতেন। নাটক দেখতে যেতেন বটে কিন্তু দেখে এসে যন্ত্রণায় কাত্‌রাতেন। তবু দেখা চাই! এর কারণ, স্থূল রুচির ব্যবচ্ছেদে তিনি আনন্দ পেতেন। কিন্তু এ ধরনের আনন্দ এক প্রকার মানসিক বিকৃতির লক্ষণ। কোনো স্থূল লোভের বা কুৎসিত ইঙ্গিতের ঘটনা দেখলে উত্তেজনায় তাঁর নাসারন্ধ্র ফুলে উঠ্‌তো। কোনো মেঠো ইতরোমির কীটটাকে যেই কামড়ে ধরতেন অমনি ঘৃণায় তাঁর দাঁত কড়মড় করে উঠ্‌তো। ওরা দু'জনে মিলে এই সময়টাকে খুব করে উপভোগ করে নিয়েছিলেন! এটা বিশ্বাস না করে পারি না যে, যুগল জীবনের এই কালের অনুভবের উষ্ণতা, আবেশের বিহ্বলতা আর মনোহারিত্বকে কেউ না কেউ সযত্নে কুড়িয়ে নিয়ে কোথাও কোনোভাবে সঞ্চিত করে রেখেছেন। 'কেউ' বলতে এই মর জগতের কোনো দ্রষ্টা। কেউ না কেউ দেখেছিলেন ওঁরা দুজনে কিউ গার্ডেনে কিংবা রিচমণ্ড্ পার্কে মনের খুশীতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন (নিজে আমি কখনো এই রিচমণ্ড্ পার্কে যাইনি তবু নামটা আমাকে মুগ্ধ করে) কিংবা গ্রীষ্মে গ্রামের পথে ঘুরতে ঘুরতে পথের ধারে কোনো সরাই-এ থেকে 'হ্যাম' আর ডিম খাচ্ছেন, কিংবা সেবাস্তিয়ানের পড়ার ঘরে প্রকাণ্ড দিভানটায় বসে দু'জনে পড়ছেন, কাছে 'ফায়ার প্লেসে' আগুন জ্বলছে খুশীতে পট্‌পট্ করে আর ইংলণ্ডের বড়দিনের মরসুম ইতিমধ্যে বায়ুতে সুগন্ধি মসলার মতো মৃদুমন্দ সৌরভ ছড়াতে শুরু করেছে, ল্যাভেণ্ডার আর চামড়ার গন্ধের পটভূমিতে। কেউ না কেউ শুনেছিলেন আড়াল থেকে : সেবাস্তিয়ান ক্লেয়ারকে অভিনব বিষয়ের কথা শোনাচ্ছেন;

এই আশ্চর্য বিষয়গুলিকে তিনি তাঁর পরবর্তী রচনা 'সাফল্য'-এ লিপিবদ্ধ করবেন।

১৯২৬-এর গ্রীষ্মকাল। একদিন বিশেষ কোনো একটা পরিচ্ছেদের বাগ-না-মানা অংশগুলিকে গুছিয়ে আনতে গিয়ে তাঁর ক্ষমতা ফুরিয়ে এল, বুঝলেন তিনি ভিতরে ভিতরে একেবারে শুকিয়ে এসেছেন, বিশ্রস্ত হয়ে গেছেন। তাই মাসখানেক বিদেশে বেড়িয়ে আসার কথা ভাবলেন। ক্লেয়ারের কিছু কাজ ছিল লণ্ডনে তাই ক্লেয়ার বললেন তিনি দু-এক সপ্তাহ পরে ঐ কাজ সেরে সেবাস্তিয়ানের সঙ্গে যোগ দেবেন। এরপর একদিন ক্লেয়ার জর্মন উপকূলে একটা অবকাশ যাপনের জায়গায় হাজির হলেন। সেবাস্তিয়ানের এখানেই আসার কথা ছিল। পৌঁছে ক্লেয়ার শোনেন সেবাস্তিয়ান তাঁর পৌঁছানোর আগেই হোটেল ছেড়ে কোথায় চলে গেছেন এবং কোথায় গেছেন তা কেউ জানে না। মাত্র বলে গেছেন, দিন দুয়েক পরে ফিরবেন। ক্লেয়ার এ ব্যাপারে কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে গেলেন বটে, কিন্তু মনে মনে খুব একটা উদ্‌বিগ্ন বা আহত হলেন না (পরে মিস্ প্র্যাট্ এ কথা বলেছিলেন)। কল্পনা করুনঃ রোগা লম্বা একটা দেহের আকার নীল রঙের 'ম্যাকিনটস' পরে (মেঘ্‌লা আবহাওয়ার জন্য) সমুদ্রের তীরে বেড়াবার পথ বেয়ে উদ্দেশ্যহীন-ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। প্রায়-নির্জনপথ—শুধু কয়েকটা বাচ্চা ছেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে নিঃশঙ্কভাবে—তিনরঙা পথসাজানো পতাকা-গুলো যেন শোকনম্র, গুটিয়ে পড়ে অল্প অল্প দুলছে। হাওয়া মরে আসছে আর ইস্পাত রঙের ধূসর সমুদ্র ফেণার মুকুটে ভেঙে পড়ছে। সমুদ্র কূল থেকে আরো একটু দূরে বিচ গাছের ঘন বন, ছায়ান্ধকার। গাছগুলোর নিচে বঙ্কুর বাদামী মাটির গায়ে রোমগুচ্ছের মতো বুনো লতা। মসৃণ সবল গাছগুলো অদ্ভুত একটা বাদামী রঙের নির্জনতা সৃষ্টি করে রুদ্ধশ্বাসে কোনো কিছুর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাঁর মনে হোলো, যে কানো মুহূর্তে ঝরাপাতা ঢাকা কোনো গর্ত থেকে

জর্মন রূপকথার পাতালের কোনো ক্ষুদ্র বামন মাথায় লালটুপি আর জ্বলজ্বলে চোখ নিয়ে উঁকি মারতে পারে। ক্লেয়ার সমুদ্রস্নানের পোশাকগুলো বের করে ফেললেন—তারপর বেলাভূমির নরম সাদা বালির ওপর শুয়ে বসে অন্যমনস্কভাবে দিনটা কাটিয়ে দিলেন। পরের সকালে আবার বৃষ্টি। দুপুরের খাবার সময় পর্যন্ত ঘরের মধ্যে কাটিয়ে দিলেন—ডনের কবিতা পড়তে পড়তে। ডন কেন? ভিজে ভিজে কুয়াশার দিন আর বাইরে খেলতে-যাবার-বায়না ধরা, করিডরে-আটক, কোনো বাচ্চার ঘ্যান্‌ঘ্যেনে কান্নার সঙ্গে ডনের কবিতা তাঁর মনে কোনো একটা অদৃশ্য ভাবসূত্রে বাঁধা। এমন সময় সেবাস্তিয়ানও এসে পৌঁছলেন। ক্লেয়ারকে দেখে খুশী হলেন, কিন্তু তাঁর আচরণে কিছু একটা ছিল যা স্বাভাবিক নয়। কেমন যেন উদ্‌ভ্রান্ত, চঞ্চল, ক্লেয়ারের চোখে চোখে তাকাতে চাইছেন না। বললেন, "অনেক দিন আগে রুশ দেশে থাকতে চেনা কোনো লোকের সঙ্গে তাঁর হঠাৎ দেখা হয়ে গেল, আর সেই ভদ্রলোকের গাড়ীতে চড়ে অন্য কোথাও চলে গিয়েছিলেম।" সমুদ্রতীরে কয়েক মাইল দূরের একটা জায়গার নাম করলেন। সেবাস্তিয়ানের গোমড়া মুখের দিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে চেয়ে জিজ্ঞাসা করেন ক্লেয়ার, "কিন্তু কী হয়েছে তোমার মণি?"

খিটখিটেস্বরে সেবাস্তিয়ান জবাব দিলেন, "হবে আবার কি? আমি বসে থাকতে পারছি না কিছু না করে; কাজ করতে চাইছি" বলে অন্যদিকে চোখ ফেরালেন।

ক্লেয়ার বললেন, "মনে হচ্ছে, আসল কথাটা তুমি এড়িয়ে যাচ্ছ।"

কাঁধ ঝাঁকিয়ে, হাতে-ধরা টুপিটার কানা বরাবর হাতের চেটোটা বুলিয়ে নিলেন সেবাস্তিয়ান।

"যাক্‌গে, এসো কিছু খেয়ে নি', তারপর ফিরে যাই লণ্ডনে।"

কিন্তু, সন্ধ্যার আগে সুবিধে মতো ট্রেন ছিল না। ইতিমধ্যে আবহাওয়া পরিষ্কার হওয়ায় দু'জনে একটু বেড়াতে বেরিয়ে পড়লেন।

ক্লেয়ার সাজ পেলে সাধারণতঃ যেমন খুশী হয়ে উঠতেন, তেমনি খুশী হবার চেষ্টা করলেন দু-একবার, কিন্তু কী জানি কেন, তাঁর এই চেষ্টাকৃত খুশীর শিখাটা নিভে গেল। তারপর দুজনেই চুপচাপ। চলতে চলতে 'বিচ' জঙ্গলে পৌঁছলেন।

এতক্ষণ তাঁদের দুজনের মধ্যে যেন-একটা-কিছু-ঘটবে ধরনের বোবা রহস্যময় একটা অনুভূতি জমে ছিল সেই ধরনেরই অনুভূতি যেন এই বিচের বনেও বিরাজ করছিল। ক্লেয়ার বলেননি যে, তিনি আগেই এখানে এসেছিলেন। সেবাস্তিয়ান বললেন, "কী অদ্ভুত নির্জন জায়গাটা। "কেমন ভূতুড়ে, তাই না? মনে হচ্ছে ঐ মরা পাতা আর লতার মধ্য থেকে লাল রঙের কোনো ছোট্ট পরী বেরিয়ে এল বলে!"

সেবাস্তিয়ানের কাঁধে হাত রেখে ক্লেয়ার হঠাৎ বলে ওঠেন: "শুনছো? আমি জানতে চাই, কী হয়েছে তোমার? হয়তো আমাকে আর ভালোবাসো না? তাই কি?"

সেবাস্তিয়ান সঙ্গে সঙ্গে বাধা দেন। তাঁর স্বরে আন্তরিকতা অটুট। "কী যা তা বলছ মণি? কিন্তু, তুমি তো জান না,···আমি মনের কথা লুকোতে পারিনে···আচ্ছা, তবে শোনো,···আসল ব্যাপার আমার বুকে আর হাতে খুব যন্ত্রণা হচ্ছিল, তাই ভেবেছিলাম বার্লিন গিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে আনি। বার্লিনে ডাক্তার আমাকে রাখলেন শুইয়ে···আশা করি খুব সাংঘাতিক কিছু নয়···কথায় কথায় করোনারি আর্টারি, রক্তসঞ্চালন, সাইনাস ইত্যাদি প্রসঙ্গ উঠেছিল। বুড়ো ঘুঘু জানেও অনেক। ইংলণ্ডে আর একটা লোককে দেখিয়ে ব্যাপারটা ঠিক কী তা জেনে নেবো···অবশ্য আজকে আমি তোফা আছি।···'

আমার ধারণা, ইতিমধ্যে সেবাস্তিয়ান সঠিক জেনে ফেলেছিলেন কোন্ বিশেষ হৃদ্‌রোগে তিনি আক্রান্ত। তাঁর মা-ও এই একই রোগে ভুগতেন—এনজাইনা পেক্‌টোরিসের বিশেষ একটা রকম-ফের —কয়েকজন ডাক্তার লেহ্‌মান রোগ বলে নিদান দিলেন। যাই

হোক্, মনে হয় প্রথম য়্যাটাকের পর তিনি অন্ততঃ বছরখানেক বিশ্রাম নিয়েছিলেন, যদিও মাঝে মাঝে তিনি তাঁর বাঁ হাতের উপরের দিকে চামড়ার নীচে অদ্ভুত এক ধরনের চুল্‌কানি অনুভব করতেন।

আবার তিনি কাজে মেতে উঠলেন। হেমন্ত, বসন্ত ও তারপর শীতও কেটে গেল কাজে। তাঁর দ্বিতীয় বই 'সাফল্য' যদিও দৈর্ঘ্যে প্রথম বইটারই মতো তবুও এটাকে রচনা করতে তাঁর অনেক বেশী পরিশ্রম ও সময় লেগেছিল। নিতান্ত ভাগ্যগুণে যে দিন 'সাফল্য' রচনা শেষ হোলো, সেই দিনের চিত্রটা আমার স্মৃতিতে থেকে গেছে। পরবর্তীকালে ঘটনাক্রমে কারো সঙ্গে দেখা হয়ে যাওয়ায় আমি এই ছবিটা পেয়েছি। শুধু এই ছবিটাই নয় আরো যে সব স্মৃতিচিত্র আমি এই পরিচ্ছেদে বর্ণনা করেছি তার অনেকগুলোই রচনা করেছি মিস্ প্র্যাটের বিবরণের সঙ্গে সেবাস্তিয়ানের এক বন্ধুর বিবরণ মিলিয়ে। কিন্তু যে ফুল্‌কিটায় এই সব স্মৃতিগুলো হঠাৎ জ্বলে উঠেছিল সেই ফুল্‌কিটা কী জানি কোন্ আশ্চর্য কার্যকারণ সম্পর্কে দপ্ করে উঠেছিল এক পলকের জন্যে লণ্ডনের পথে ভারমন্থর গতিতে ক্লেয়ারকে যেতে দেখে। দরজা খুলল, দেখা গেল সেবাস্তিয়ান ঈগলপাখীর মতো ডানা ছড়িয়ে উবুড় হয়ে পড়ার ঘরের মেঝেতে পড়ে রয়েছেন। ক্লেয়ার টাইপকরা পাতাগুলো ডেস্ক্-এর ওপর থেকে টেনে টেনে সযত্নে গুছিয়ে রাখছেন। যিনি ঘরে ঢুকলেন তিনি ঢুকেই থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন।

সেবাস্তিয়ান মেঝেতে পড়ে থেকেই বলে উঠলেন: "না, লিস্‌লি, আমি মরিনি। আজ এই মাত্র একটা জগৎ সৃষ্টি করে আমি আবার সাবাথের বিশ্রাম নিচ্ছি।"

॥ দশ ॥

সেবাস্তিয়ানের ভাব-জীবনের সংকট মুহূর্তের দিকে আমি এখন দ্রুত এগিয়ে চলেছি। কিন্তু, আমার এখনো অস্পষ্ট উদ্দেশ্য সাধনের

উদ্দেশ্যে যেটুকু করতে পেরেছি, কল্পনায় সেই সামান্যটুকুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আমি কেমন যেন অস্বস্তি অনুভব করছি। আমি কি ইতিমধ্যে সেবাস্তিয়ানের এই সময় পর্যন্ত জীবনকে কিংবা তাঁর জীবনের সমাপ্তি পর্বটাকে আশানুরূপ ভাবে চিত্রিত করতে পেরেছি ? বিদেশী ভাষার বাক্‌রীতি বা ইডিয়মের সঙ্গে যার লড়াই অবশ্যম্ভাবী সেই সাহিত্যিকের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার যখন শূন্য হয়ে আসে তখন সে কি আত্মপ্রত্যয় নিয়ে এই ধরনের কাজে এগিয়ে যেতে পারে ? মানি, এর আগের পরিচ্ছেদগুলোতে আমি আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে পারিনি। তবু সংকল্প থেকে বিচ্যুত হলেম না। আমার একটা বিশেষ ধারণা আমার এই সংকল্পকে বজায় রাখতে সাহায্য করেছে। আমার মনে হচ্ছে সেবাস্তিয়ানের আত্মা অলক্ষ্যে আমাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসছে। এই অলক্ষ্য অমূর্ত সাহায্য ছাড়াও বাস্তব সাহায্য আমি পেয়েছি। ১৯২৭ থেকে ১৯৩০, ক্লেয়ার ও সেবাস্তিয়ানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল কবি পি জি শেলডনের। তাই ক্লেয়ারের সঙ্গে আমার ঐ অদ্ভুত আধা-সাক্ষাৎকারের পর আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করি ও তিনি যা কিছু জানেন তা সব আমাকে বলতে রাজী হন। ইনিই মাস দুয়েক পরে (এই বই লেখা শুরু হবার পর) দুর্ভাগিনী ক্লেয়ারের অপ্রত্যাশিত পরিণতির কথা জানিয়েছিলেন।

বাইরে থেকে দেখতে স্বাভাবিক সুস্থ তরুণী। তবু ক্লেয়ার মৃত প্রসূতা হলেন ও শূন্য কোল নিয়ে মারা গেলেন রক্তস্রাবে। কিন্তু কেন ? সেবাস্তিয়ানের উপন্যাস 'সাফল্য' যখন সাফল্য অর্জন করে নামের ইঙ্গিতকে সার্থক করলে তখন ক্লেয়ারের আনন্দ আর ধরল না। এ কথা শেলডন বলেছিলেন। এবার সাফল্যে আর কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কেন যে প্রথম বইখানা অনবদ্য হওয়া সত্ত্বেও মার খেল, তার পাওনা পেল না, তা সব সময় একটা রহস্যই থেকে যাবে। যেমন প্রথম বইয়ের বেলায় তেমনি এর বেলাতেও তিনি এর প্রচার ও স্বীকৃতির জন্যে সামান্য অঙ্গুলি হেলনও করেননি।

যখন সংবাদপত্রের কাটিং ব্যবসায়ে নিযুক্ত একটা প্রতিষ্ঠান তাঁর কাছে তাঁরই প্রশংসামূলক কাটিং পাঠিয়ে পাঠিয়ে তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করে তুললেন, তখনও তিনি 'কাটিং'-এর গ্রাহক হতে রাজী হলেন না কিংবা সহৃদয় সমালোচকদের কোনো প্রকার ধন্যবাদ দিলেন না। যে মানুষ বই সম্বন্ধে নিজের ধারণাকে প্রকাশ করা কর্তব্য বিবেচনা করেছেন তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া অশালীন মনে করেছিলেন সেবাস্তিয়ান। শুধু অশালীনই নয়, তিনি মনে করতেন আবেগহীন বিচারের হিমশীতল নিরপেক্ষতার মধ্যে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের উত্তাপ আরোপ করা হয়েছে এ ধরনের অনুমান করলে বিচারককে অপমানই করা হয়। তাছাড়া একবার ধন্যবাদ দেওয়া আরম্ভ করলে পরবর্তী প্রত্যেক পঙ্‌ক্তি প্রশংসার জন্যে তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে যেতে হবে এবং হঠাৎ কোনো কারণে একবার তাতে ফাঁক পড়লে সমালোচক ক্ষুণ্ণ হবেন। আর এ রকম ক্ষেত্রে সমালোচকের প্রতি এমন একটা ম্যাজমেজে মাথা ঝিম্‌ঝিম্ করা রসের দৌর্বল্য জন্মে যায় যে, সমালোচকের সততা সন্দেহাতীত হলেও প্রশংসার মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের উষ্ণতা অলক্ষ্যে অনুপ্রবেশ করল কিনা এই সন্দেহটা থেকেই যায়। লেখকের খ্যাতি, আর তাঁর বিশেষ কোনো রচনা ঘিরে দীপ্তির যে স্থায়ী মণ্ডল, এ দুটো আলাদা জিনিস, কিন্তু আমাদের সময়ে দুটোর মধ্যে পার্থক্যকে গুলিয়ে ফেলা হয়। তবু আসল ব্যাপারটা যাই হোক্ না কেন, ক্লেয়ার-এর আস্বাদটা উপভোগ করতে মনস্থ করেছিলেন। যাঁরা সেবাস্তিয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইতেন তাঁদের সঙ্গে দেখা করতেন ক্লেয়ার। সেবাস্তিয়ান নিজে দেখা করবেন না বলে পণ করেছিলেন। অপরিচিত লোক যখন 'সাফল্য' নিয়ে আলোচনা করতো তখন ক্লেয়ার তাদের আলোচনা শুনতে চাইতেন; কিন্তু সেবাস্তিয়ান বলতেন যে, ঐ বইটার প্রতি তাঁর কোনো আকর্ষণ ছিল না। ক্লেয়ার চাইতেন সেবাস্তিয়ান সাহিত্যিক-দের বিশেষ একটা ক্লাবে যাতায়াত করে অন্যান্য সাহিত্যিকদের সঙ্গে

আলাপ পরিচয় করুন। ফলে সেবাস্তিয়ানকে দু-একবার, খড়খড়ে ইস্ত্রিকরা কেতাদুরস্ত পোশাক গায়ে চড়াতে হয়েছিল।

তাঁরই সম্মানে আয়োজিত ডিনার সভায় ঠোঁটের ফাঁকে একটা কথাও উচ্চারণ না করে ফিরে এসেই সেই কেতাদুরস্ত পোশাকটাকে গা থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। রাত্রে তাঁর ভালো ঘুম হোতো না। মাঝে মাঝে মেজাজ রুক্ষ হয়ে উঠ্তো। এ সব ক্লেয়ারের কাছে নতুন। একদিন বিকেলে পড়ার ঘরে তিনি 'মজার পাহাড়' বইটা লিখতে ব্যস্ত। স্নায়বিক যন্ত্রণার পিচ্ছিল উৎরাই পেরিয়ে পেরিয়ে এগোচ্ছেন, এমন সময় ক্লেয়ার ঘরে ঢুকলেন, আর খুব মিহি গলায় বললেন—কে একজন দেখা করতে এসেছেন, উনি কি দেখা করবেন? "না।" সদ্য লেখা কথাটার দিকে দাঁত খিঁচিয়ে বলে উঠ্লেন। "কিন্তু, তুমিই তো ওকে আসতে বলেছিলে পাঁচটায়…আর…" সেবাস্তিয়ান চেঁচিয়ে উঠ্লেন, "থামোতো।" বলেই কলমটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন দেওয়ালের দিকে। দেওয়ালে ছড়াৎ করে এক ধ্যাব্ড়া কালি লেগে গেল। "তুমি কি আমাকে শান্তিতে কাজ করতে দেবে না?" কণ্ঠস্বরকে সপ্তমে চড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠ্লেন। কবি শেলডন পাশের ঘরে ক্লেয়ারের সঙ্গে দাবা খেলায় বসেছিলেন। তিনি এই শুনে উঠে গিয়ে হলঘরের দিকে দরজাটা দড়াম করে বন্ধ করে দিলেন। এই হল ঘরে ছোটোখাটো নিরীহ কে এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছিলেন। মাঝে মাঝে এক ধরনের বন্য উদ্দামতা সেবাস্তিয়ানকে পেয়ে বস্তো। একদিন বিকেলে ক্লেয়ার আর জন দুয়েক বন্ধুর সঙ্গে সেবাস্তিয়ান একটা চমৎকার মস্করার ব্যবস্থা ফেঁদে বসলেন। ডিনারের পর কার যেন দেখা করার কথা ছিল। এই মস্করার ব্যবস্থা তারই জন্যে। যথাসময়ে শেলডন এই মস্করার প্ল্যানটা ভুলেই গেলেন। সেবাস্তিয়ান হো হো করে হেসে উঠলেন। আর হাত দুটো মুঠো করে মুঠো দুঠো পরস্পরের সঙ্গে ঠুক্তে ঠুক্তে বেরিয়ে গেলেন (কোনো বিষয়ে মজা লাগলে তিনি এই বিচিত্র

মুদ্রাটার আশ্রয় নিতেন)। সবাই এই মস্করাটার জন্যে তৈরি হয়ে আছে, পরিকল্পিত ঘটনাটা ঘটার জন্য ওৎ পেতে আছে, ক্লেয়ার ট্যাক্সির জন্য টেলিফোন করেছেন, নূতন রূপোলি রঙের জুতোটা পালিশ করছেন, হাত ব্যাগটা খুঁজে পেতে বের করেছেন, এমন সময় সেবাস্তিয়ানের উৎসাহ নিভে গেল দপ্ করে। দেখে মনে হোলো সেবাস্তিয়ান একেবারে নিস্পৃহ, মুখ চেপে হাই তুলছেন। দেখে সবারই বিরক্তি লাগল। হঠাৎ তিনি বলে বসলেন কুকুরটাকে তিনি একটু বাইরে বেড়িয়ে নিয়ে আসবেন, তারপর শুতে যাবেন। এই সময়ে তাঁর একটা ছোট্টো কালো মদ্দা টেরিয়ার কুকুর ছিল। কুকুরটা কিছুদিন পরে অসুস্থ হয়ে পড়ে ও তাকে মেরে ফেলতে হয়।

'মজার পাহাড়' লেখা শেষ হোলো, তারপর 'কালো এলবিনো' তারপর তাঁর তৃতীয় এবং সব শেষের ছোটো গল্প 'চাঁদের ওপিঠ'। এই গল্পের সেই মজার চরিত্রটার কথা আপনাদের হয়তো মনে আছে। ছোটো শান্ত মানুষটা, ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করার অবসরে তিনজন অখদ্যে যাত্রীকে তিন রকমভাবে সাহায্য করেছিলেন। এই মিঃ সিলার সম্ভবতঃ সেবাস্তিয়ান-সৃষ্ট সমস্ত চরিত্রের মধ্যে সবচেয়ে জীবন্ত এবং আর একদিক থেকে বলা যায় যে, এই চরিত্র সেবাস্তিয়ানের 'গবেষণা পদ্ধতি'র যেন একটা বিশেষ আইডিয়া দুটো বইয়ের ভিতর দিয়ে বাড়তে বাড়তে সত্যকার বাস্তব অস্তিত্বে রূপ নিয়েছে আর রূপ নিয়ে সম্মুখে এসে হেঁট হয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে। তার অভ্যাস ও আচরণের সমস্ত খুঁটিনাটি এবার স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে। পুরু ভ্রূ, সাদাসিধে গোঁফ, নরম কলার। কণ্ঠাটা চামড়া ঠেলে নড়ছে চড়ছে যেন দেওয়াল ঢাকা পর্দার পিছনে একটা লোক আড়ি পাতবার জন্যে এদিক ওদিক করছে। বাদামী রঙের চোখ, শক্ত বড় নাকে লাল মদের রঙের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শিরা ভেসে উঠেছে। নাকটা এতো বড়ো যে দেখে মনে হয়, লোকটা বুঝি পিঠের কুঁজটা কোথায় হারিয়ে ফেলেছে—যেন 'সাইরানো দ্য বেরজেরাক' কুঁজটা কোথাও

ফেলে এসে শুধু প্রকাণ্ড নাকটা নিয়ে হাজির হয়েছে। ছোট্ট কালো টাই, পুরোনো ছাতা, নাকের ফুটোর মধ্যে ঝোপের মতো লোম : আর টুপি খুললে মাথার চক্‌চকে টাকটা হঠাৎ চম্‌কে দেয়। কিন্তু সেবাস্তিয়ানের লেখা যতো ভালো হোতো তাঁর মেজাজ ততো বিগড়ে যেতো—বিশেষ করে দুটো রচনার মধ্যবর্তী সময়টায়। শেলডন মনে করেন, তাঁর শেষলেখা বইয়ের জগৎটা ('মৃত্যুপারের ফুল' নামের এই বইটা তিনি অনেক বছর পরে লিখেছিলেন) ইতিমধ্যে ছায়া ফেলতে শুরু করেছিল তাঁর পরিবেশে। তিনি বলেছিলেন যে, সেবাস্তিয়ানের উপন্যাস ও গল্পগুলো উজ্জ্বল মুখোস মাত্র, এরা তাঁকে শিল্পের ভুবনে অভিযাত্রায় আকর্ষণ করে কোনো একটা প্রত্যাসন্ন লক্ষ্যের দিকে প্রলুব্ধ করে নিয়ে গেছে। ক্লেয়ারের প্রতি তাঁর আকর্ষণ যে আগের মতই বজায় ছিল এ রকম ভাবার কারণ আছে। কিন্তু মৃত্যুর তীব্র উপলব্ধি তাঁকে এমনভাবে গ্রাস করেছিল যে, ক্লেয়ারের সঙ্গে বন্ধন সূত্রগুলো বেশী পলকা মনে হোতো। কিন্তু বাইরে থেকে দেখে তাদিকে যতটা পলকা মনে হোতো আসলে তারা তত আপট্‌কা ছিল না। একান্ত অনবধানে নিশ্চিন্ত ভরসায় ক্লেয়ার সেবাস্তিয়ানের জীবনের রৌদ্রকরোজ্জ্বল সুখের একটি কোণে খেলা করতে বসেছিলেন, কিন্তু সেখানে সেবাস্তিয়ান দাঁড়িয়ে থাকেননি। সেবাস্তিয়ান কখন অলক্ষ্যে এখান থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন, ক্লেয়ার পড়ে রইলেন পিছনে। ক্লেয়ার বুঝতে পারলেন না চেষ্টা করে পিছু নিয়ে ওঁর নাগাল ধরবেন কিনা, কিংবা 'ফিরে এসো' বলে ডাকবেন কিনা। শুধু নিজেকে কাজকর্মে ব্যস্ত রাখলেন : কিছুটা সেবাস্তিয়ানের সাহিত্যজীবনের কিছুটা তাঁর দৈনন্দিন জীবনের দায়িত্ব নিয়ে। তিনি নিশ্চয় অনুভব করেছিলেন কোথায় কী একটা বিকল হয়ে গেছে, বুঝতে পেরেছিলেন সেবাস্তিয়ানের অন্তর জীবনের নাগাল পাচ্ছেন না একটুও। তবু তিনি নিজেকে এই বলে প্রবোধ দিতে চেয়েছিলেন যে, সেবাস্তিয়ানের জীবনে এই

চাঞ্চল্যের পর্যায়টা হয়তো কিছু দিন পরে শেষ হয়ে যাবে এবং তিনি ধীরে ধীরে আবার থিতিয়ে আসবেন। তাঁদের সম্পর্কের অগোচর দিকটার আলোচনা থেকে স্বভাবতঃই বিরত থাকতে হোলো, তার কারণ প্রথমতঃ যে ব্যাপারে নিশ্চিত করে কিছু বলা যায় না সে ব্যাপার নিয়ে আলোচনা শুধু ব্যর্থ নয়, হাস্যকর। দ্বিতীয়তঃ 'সেক্স্' কথাটার উচ্চারণের মধ্যেই গোড়ায় এমন একটা শিস্ দেওয়া—অশ্লীলতা এবং শেষে বেড়ালের কাশির মতো কুৎসিত 'ক্স্' 'ক্স্' শব্দ আছে যে আমার কানে তা একেবারে নিরর্থক এবং আমার সন্দেহ আসলে এই কথাটার কোনো অর্থই আছে কি না। সত্যি কথা বলতে, আমি বিশ্বাস করি যে, মানবিক সমস্যা বিচারে 'সেক্স্'কে একটা বিশেষ প্রভাবরূপে কল্পনা করা কিংবা 'সেক্স্'-এর ধারণাকে (যদি এই ধরনের কোনো ধারণার অস্তিত্বই থেকে থাকে) সর্বতোব্যাপ্ত করে সব কিছুর ব্যাখ্যায় একে প্রয়োগ করা গুরুতর ভ্রম। "একটা বিশেষ কোনো ঢেউয়ের ভাঙন দিয়ে গোটা সমুদ্রের ব্যাখ্যা চলে না—তার চাঁদ থেকে মহানাগ পর্যন্ত। কিন্তু পাথরের মধ্যে আটকে-পড়া এক অঞ্জলি বদ্ধ জল আর ক্যাথে যাবার পথে চূর্ণ হীরের মতো ভেঙে-পড়া ছোট ছোট ঢেউ—এরা উভয়েই যে জল তাতে সন্দেহ নেই। ('চাঁদের উল্‌টো পিঠ')।

"দেহগত প্রেম দেহগত প্রেমই। তা 'স্যাক্সোফোন' বলে ('স্যাক্সোফোন' বলে একটা শব্দ যন্ত্র আছে।) কোনো যন্ত্রের বহু ব্যাপ্ত সুর নয় যে একবার ধ্বনিত হলে আত্মার সমস্ত লোকে তার প্রতিধ্বনি উঠবে।" ('হারানো সম্পত্তি' পৃ ৮২)। "আসলে সব কিছুই একই পর্যায়ের। সব মিলিয়ে এক এবং অনন্য। মানুষের ইন্দ্রিয়-বোধ এক এবং অনন্য, তেমনি তার ব্যক্তিত্ব। পদার্থও তেমনি এক এবং অনন্য, তার সংজ্ঞা যাই হোক না কেন।" (তত্রৈব, পৃ ৮৩)।

এমন কি যদি অন্য কোনো বিশ্বস্ত সূত্র থেকে আমি জানতামও যে, ক্লেয়ার দেহের বিচারে সেবাস্তিয়ানের তরফ থেকে যৌন আকর্ষণের

অনুপযুক্ত ছিলেন তবু আমি তাঁদের এই বিচ্ছেদকে সেবাস্তিয়ানের স্বাভাবিক উত্তেজনা প্রবণতা কিংবা তাঁর মানসিক চাঞ্চল্য দিয়ে ব্যাখ্যা করতে বসতেম না। এমনও হতে পারে যে, জগতের সব কিছুর প্রতি তাঁর বিরাগ এসেছিল বলেই নিজের প্রেম-জীবনের প্রতিও অসন্তুষ্টি জন্মেছিল তাঁর। পাঠক লক্ষ্য করবেন যে, আমি এই 'অসন্তুষ্টি' কথাটা খুব ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করছি, কারণ, সেবাস্তিয়ানের জীবনের এই পর্যায়ে তাঁর মানসিক অবস্থার মূলে যা ছিল তা তথাকথিত জগৎ যন্ত্রণার বা অশরীরী কোনো প্রভাবের ফলশ্রুতির চেয়ে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এই অবস্থার মূলে যা ছিল তা একমাত্র তাঁর শেষ রচনা 'মৃত্যুপারের ফুল'-এর সাহায্যে বোঝা যায়। অবশ্য, আমি যে সময়ের কথা বলছি তখনো এই রচনার রূপরেখা ভবিষ্যতের কুয়াশার মধ্যে অস্পষ্ট, অস্ফুট। দেখতে পাবো এই কুয়াশার অন্তরাল থেকে ধীরে ধীরে একটা সৈকত জেগে উঠ্ছে।

১৯২৯-এ ডঃ ওট্স্ সেবাস্তিয়ানকে আলসেস্ প্রদেশের ব্লাউবের্গ নামের জায়গায় মাসখানেক হাওয়া বদলের পরামর্শ দিলেন। এখানে তাঁর যা রোগ সেই রোগের বিশেষ চিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল এবং এই চিকিৎসায় উপকার হতে শোনা গিয়েছিল। তাঁর সেখানে একলা যাবার ব্যবস্থাটা সকলেই বোধ হয় নীরবে মেনে নিয়েছিল। যাবার আগে সেবাস্তিয়ানের ফ্ল্যাটে মিস্ প্র্যাট্, শেলডন, ক্লেয়ার ও সেবাস্তিয়ান আনুষ্ঠানিকভাবে চা পান করলেন। সেবাস্তিয়ানকে খুব খুশী দেখা গেল। উনি বাচাল হয়ে উঠেছিলেন, এমন কি গোলমালে সেবাস্তিয়ানের জিনিসপত্র বাঁধা-ছাঁদার সময় ক্লেয়ার তাঁর নিজের রুমালখানাকে গুটিয়ে তাঁর জিনিসপত্রের মধ্যে গুঁজে দিয়েছেন বলে সেবাস্তিয়ান ক্লেয়ারকে ঠাট্টাও করলেন। তারপর সেবাস্তিয়ান শেলডনের জামার অস্তিনে ছোঁ মেরে তাঁর ঘড়িতে সময়টা দেখে নিলেন। (নিজে সেবাস্তিয়ান কখনো রিস্টওয়াচ ব্যবহার করতেন না)। দেখেই হুড়োহুড়ি করে বেরিয়ে পড়লেন। হাতে অবশ্য

অনেক সময় ছিল তখনো—প্রায় এক ঘণ্টা। তাঁকে ট্রেনে তুলে দেবার কথা ক্লেয়ার ভুললেন না। তিনি জানতেন সেবাস্তিয়ান এসব পছন্দ করতেন না। সেবাস্তিয়ান ক্লেয়ারের কপালের একপাশে চুমু খেলেন। শেলডন তাঁর ব্যাগটা বয়ে দিলেন গাড়ী পর্যন্ত। (আগেই বলেছি যে, ঘর ঝাড়-পোঁছ করার জন্য একটা ঠিকে ঝি আর কাছাকাছি রেস্তোরাঁ থেকে খাবার এনে দেবার জন্যে একজন ঠিকে লোক ছাড়া তাঁর কোনো চাকরবাকর ছিল না)। উনি বেরিয়ে যাবার পর ওঁরা তিনজন কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে বসে রইলেন। ক্লেয়ার দুম করে সশব্দে টি পটটা নামিয়ে রেখে বললেন, "রুমালখানা বোধহয় ওর সঙ্গে যেতে চেয়েছিল—আমার মন বলছে।"

শেলডন বললেন, "ন্যাকামি করো না ক্লেয়ার!"

"কেন, করবো না?" জবাব দেন ক্লেয়ার।

মিস্ প্র্যাট্ বলে বসলেন, "তার মানে যদি এই হয় যে, তুমিও ঐ ট্রেনটাই ধরতে চাও,..."

"হ্যাঁ, চাইতো! এখনো চল্লিশ মিনিট সময় আছে হাতে। বাড়ী ফিরে এটা ওটা দু চারটে জিনিস বেঁধে নিয়ে ছুটে একটা ট্যাক্সি...ব্যস্!"

ঠিক তাইই তিনি করলেন। ভিক্টোরিয়া স্টেশনে কী ঘটল কেউ জানে না। শেলডন বাড়ী ফেরার ঘণ্টাখানেক পরে টেলিফোন পেলেন ক্লেয়ারের কাছ থেকে। ক্লেয়ার ফোনে কেমন একটা করুণ ছোট্ট হাসি হেসে বললেন—গাড়ী ছাড়া পর্যন্ত তাঁকে প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে থাকতেও দেননি সেবাস্তিয়ান। আমার চোখের ওপর একটা স্পষ্ট ছবি: ক্লেয়ার কোনো রকমে ঠিক সময়ে পৌঁছেছেন; হাতে ব্যাগ, দুষ্টুমির হাসিতে ঠোঁট দুটো ঈষদ্ভিন্ন, ট্রেনের জানালার কাঁচের বাইরে দুটো সন্ধানী চোখ দেখা যাচ্ছে অস্পষ্ট ভাবে; তাঁকে খুঁজে ফিরছে, খুঁজতে খুঁজতে দেখতেও পেল, কিংবা তিনিই প্রথম দেখেছেন। খুশীতে ঝলমল্ করে উঠে বললেন: "এই যে আমি এখানে!" খুশীটা কেমন যেন বাড়াবাড়ি রকম মনে হোলো...

কয়েক দিন পরে সেবাস্তিয়ানের কাছ থেকে চিঠি এল। চিঠিতে লিখেছেন জায়গাটা খুব মনোরম; তিনি খুব সুস্থ অনুভব করছেন, অতটা আশা করেননি। এরপর কিছুদিন আর কোনো খবর নাই। তারপর উদ্‌বিগ্ন হয়ে ক্লেয়ার টেলিগ্রাম পাঠালেন। উত্তর এল পোস্ট কার্ডে; তিনি আর ব্লাউবের্গে থাকছেন না, বাড়ী ফেরার পথে প্যারিসে এক সপ্তাহ কাটিয়ে আসছেন। এই সপ্তাহটার শেষদিকে সেবাস্তিয়ান আমাকে টেলিফোনে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। আমরা একটা রুশ রেস্তোর্঳ায় ডিনার খেলেম দুজনে।

১৯২৪-এর পর আর তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। যে সময়টার কথা বলছি তা ১৯২৯। দেখে মনে হোলো মানুষটা ক্ষয়ে গেছে এবং অসুস্থ হয়ে পড়েছে। যদিও সদ্য দাড়ি কামিয়ে এসেছিলেন তবু মনে হোলো মুখখানা কামানো নয়। দেহের বর্ণ এতো কালি হয়ে গিয়েছিল।

ঘাড়ের ওপর একটা ফোঁড়া, তার মুখটা বেগুনি রঙের প্ল্যাস্টার দিয়ে ঢাকা। আমার নিজের সম্বন্ধে কয়েকটা প্রশ্ন করলেন। তারপর কথা আর এগোলো না। কথা চালিয়ে যেতে যেন আমাদের দুজনেরই কষ্ট হচ্ছিল। জিজ্ঞাসা করলেম গতবারে যে চমৎকার মেয়েটিকে তাঁর সঙ্গে দেখেছিলেম তার কী হয়েছে? "কোন্ মেয়েটা?" থামলেন। পরমুহূর্তে বললেন: "ও, ক্লেয়ারের কথা বল্‌ছ? ভালই আছে: আমাদের এক রকম বিয়েই হয়ে গেছে!"

বললেম: "তোমার শরীরটা যেন ভেঙে গেছে বলে মনে হচ্ছে···"

"যাকগে! হ্যাঁ, শোনো, এক ডিস্ 'পেলমোন' খাবে?"

"ওর স্বাদটা তোমার এখনো মনে আছে দেখছি!"

শুক্‌নো গলায় বললেন, "থাকবেই না কেন, বল?"

কয়েক মিনিট দুজনে নিঃশব্দে খেয়ে যাই। তারপর কফি আসে।

"কী যেন জায়গাটা? ব্লাউবের্গ? না?"

"হ্যাঁ, ব্লাউবের্গ।"

"তা, জায়গাটা এক রকম ভালই, না ?"

"ভালমন্দ নিজের নিজের রুচির ওপর…"

চোয়ালটা নাড়লেন, যেন একটা হাই উঠ্ছিল সেটাকে চিবিয়ে চেপে দিলেন। বলে উঠ্লেন: "কিছু মনে কোরো না; ভাবছি ট্রেনেই ঘুমোবার ব্যবস্থা করবো!" হঠাৎ দেখি আমার কব্জিতে হাতড়াতে শুরু করেছেন।—বললেম, "সাড়ে আটটা।" বিড়বিড় করে বললেন, "আমাকে একটা ফোন করতে হবে।" বলে ন্যাপকিনটা হাতে নিয়েই লম্বা লম্বা পা ফেলে রেস্তোরাঁর একটেরে চলে গেলেন। মিনিট পাঁচেক পরে ন্যাপকিনটা কোটের পকেটে গুটিয়ে পুরে ফিরে এলেন। ন্যাপকিনের খানিকটা বেরিয়ে রয়েছে দেখলেম। টেনে বের করে নিলেম।

বল্লেন: "হ্যাঁ, দেখো,…কিছু মনে কোরো না…আমাকে যেতেই হবে: একটা এপয়েন্টমেণ্ট ছিল, ভুলে গিয়েছিলাম।" সেবাস্তিয়ান তাঁর 'হারানো সম্পত্তি' বইতে লিখেছেন: "সব সময় এটা ভেবে আমার কষ্ট হয়েছে যে, রেস্তোরাঁতে যে চট্পটে মানুষগুলো আমাদের খাবার এনে দেয়, ওভারকোটের খবরদারি করে, দরজা ঠেলে বেরিয়ে যেতে সাহায্য করে সেই মানুষগুলোর রহস্য সম্বন্ধে আমরা কতো অচেতন। কয়েক সপ্তাহ আগে একজন ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের সঙ্গে লাঞ্চ খাবার পর তাঁকে বলেছিলেম: "যে মেয়ে লোকটি আমাদের হাতে টুপিগুলো এগিয়ে দিলে তার কানে তুলো পোরা ছিল, দেখেছেন?" ভদ্রলোক কেমন যেন হক্চকিয়ে গেলেন। বললেন—কোনো স্ত্রীলোককে দেখেছেন বলে তো তাঁর মনে পড়ে না। যে লোকটা ট্যাক্সিতে চেপে, যাওয়ার তাড়ায় ড্রাইভারটা যে গল্লাকাটা তা তার নজরেই পড়েনি, আমার বিচারে সে এক ধরনের পাগল। বিশেষ একটা ঝোঁকে পাগল।

অনেক সময় ভিড়ের মধ্যে যখন লক্ষ্য করেছি আমিই একমাত্র লোক যে চকোলেট-বেচা মেয়েটার সামান্য খুঁড়িয়ে চলাটা লক্ষ্য

করেছি তখন মনে হচ্ছে আমি যেন একদল অন্ধ আর পাগলের মধ্যে একা বসে রয়েছি।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের দিকে যাচ্ছি এমন সময় ঝাপ্‌সা-চোখ এক বৃদ্ধ বুড়ো আঙুলটা জিভে ভিজিয়ে নিয়ে হাতের একতাড়া ছাপা হ্যাণ্ড্‌বিল থেকে একখানা টেনে বের করে সেবাস্তিয়ান বা আমাকে কিংবা আমাদের দুজনের দিকেই বাড়িয়ে দিলে। আমরা কেউ নিলেম না; দুজনেই মুখ না ঘুরিয়ে সামনে চেয়ে থাকলেম। যেন দুজনেই বিরক্ত, দুজনেই স্বপ্নাচ্ছন্ন। ওর আবেদন টাকে উপেক্ষা করলেম। সেবাস্তিয়ান ইশারায় একটা ট্যাক্সি ডাকলেন—"আচ্ছা, আমি তা হলে আসি" বলে। বললেন, "একদিন লণ্ডনে এসে আমার সঙ্গে দেখা করো।" বলেই ঘাড় ফিরিয়ে বললেন, "একটু দাঁড়াও, ভুল হয়ে গেছে, একটা ভিখিরীকে উপেক্ষা…" বলে চলে গেলেন, মুহূর্তের মধ্যে ফিরে এলেন, হাতে এক প্রস্থ কাগজ। সযত্নে পড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন "লিফ্‌ট দেবো তোমায়?"

অনুভব করলেম আমাকে ঝেড়ে ফেলে দেবার জন্য—উনি যেন মনে মনে অধীর হয়ে উঠেছেন।

'থাক্'। ড্রাইভারকে একটা ঠিকানা বললেন, স্পষ্ট শুনতে পেলেম না। শুধু মনে আছে ড্রাইভারকে জোরে চালাতে বললেন। তারপর যখন লণ্ডনে ফিরে এলেন আমি আর জানি না, এখানে এসে ঘটনার সূত্রটা ছিঁড়ে গেছে…এই ছেঁড়া সূত্রগুলোকে অন্যদের জুড়ে দিতে বলতে হবে।

কিছু একটা হয়েছিল। ক্লেয়ার কি তা সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলেন? কী হয়েছে তাও কি সঙ্গে সঙ্গে অনুমান করেছিলেন? সেবাস্তিয়ান ওঁকে কী বলেছিলেন, তার প্রত্যুত্তরে ক্লেয়ার কী বলেছিলেন এসব কি আমাদের অনুমান করেই নিতে হবে? না, অনুমান করবো না। সেবাস্তিয়ানের ফিরে আসার ঠিক পরেই

শেলডন ওদের সঙ্গে দেখা করলেন। দেখলেন সেবাস্তিয়ানের চোখের চাউনি কেমন যেন অদ্ভুত হয়ে গেছে। কিন্তু আগেও একবার এ রকম হয়েছিল…। শেলডন বললেন, "দেখেই আমার ভাবনা হোলো।" ক্লেয়ারকে নিরিবিলিতে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন সেবাস্তিয়ান কেমন আছেন? "সেবাস্তিয়ান?" বলতে বলতে ক্লেয়ারের মুখে একটা হাসি ভেসে উঠল। একটা মর্মন্তুদ হাসি। "সেবাস্তিয়ান পাগল হয়ে গেছে।" "একেবারে পাগল," আর একবার বললেন। বিবর্ণ ম্লান চোখ দুটো বিস্ফারিত করে বললেন। স্বর নীচু করে বললেন: "ও আমার সঙ্গে কথা বলে না আজকাল।"

সেবাস্তিয়ানের সঙ্গে দেখা করলেন শেলডন, জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কি?" সেবাস্তিয়ান জবাব দিলেন, "যাই হোক্, তোমার কি?" স্বরে বিষণ্ণ হিম একটা ঔদাসীন্য ফুটে উঠল।

শেলডন বললেন, "ক্লেয়ারের প্রতি আমার মমতা আছে: তাই জানতে চাই কেন সে ছায়ার মতো উদাস হয়ে ঘুরে বেড়ায়?" ক্লেয়ার প্রত্যহই সেবাস্তিয়ানের কাছে আসতেন, এসে বেয়াড়া জায়গায় বসে থাকতেন। এসব জায়গায় তিনি আগে কখনও বসতেন না। কোনোদিন সঙ্গে মিষ্টি আনতেন, কোনোদিন বা একটা টাই। মিষ্টি পড়েই থাকতো, সেবাস্তিয়ানের মুখে উঠতো না। টাইটা নির্জীব খোলসের মতো ঝুলতো চেয়ারের পিঠে। মনে হোতো তিনি যেন অশরীরীর মতো সেবাস্তিয়ানের শরীর ভেদ করে অন্তর্হিতও হতেন। আসতেন যেমন নিঃশব্দে, বেরিয়েও যেতেন তেমনিই নিঃশব্দে।

শেলডন নাছোড়বান্দা: "বলেই ফেল না বাবা, কী হয়েছে তোমার ওর সঙ্গে?"

॥ এগার ॥

শেলডন ওঁর কাছ থেকে কিছুই বের করতে পারলেন না। যেটুকু জানলেন তা ক্লেয়ারের কাছ থেকে, আর তা অতি সামান্যই।

লণ্ডনে ফিরে সেবাস্তিয়ান চিঠি পেতেন, রুশভাষায় লেখা চিঠি, লিখতেন এক মহিলা। এর সঙ্গে তাঁর ব্লাউবের্গে দেখা। ওঁর সঙ্গে একই হোটেলে ছিলেন। এর বেশী আর কিছু জানা যায়নি।

ছ'সপ্তাহ পরে (১৯২৯-এর সেপ্টেম্বরে) সেবাস্তিয়ান ইংলণ্ড ছেড়ে চলে যান। পরের বছর জানুয়ারী পর্যন্ত নিখোঁজ। কোথায় আছেন কেউ জানতো না। শেলডনের মনে হয়েছিল: সম্ভবতঃ ইতালিতে। কারণ ইতালি মানে প্রেমিকের অভিসার কুঞ্জ।

ক্লেয়ারের সঙ্গে সেবাস্তিয়ানের কোনো বোঝাপড়া হয়েছিল কিনা, যাবার আগে তিনি ক্লেয়ারকে চিঠি লিখে গিয়েছিলেন কিনা, এসব পরিষ্কারভাবে জানা যায়নি।

ক্লেয়ার যেমন নিঃশব্দে ওঁর জীবনে এসেছিলেন তেমনি নিঃশব্দেই বেরিয়ে চলে গেলেন। নিজের বাসাও বদল করলেন ক্লেয়ার, সেবাস্তিয়ানের বাসার বড় কাছাকাছি বলে। কোনো এক নভেম্বরের দিনের আলো-আঁধারিতে মিস্ প্র্যাটের সঙ্গে তাঁর দেখা। কুয়াশা ঠেলে ঠেলে বাসায় ফিরছিলেন, একটা লাইফ ইনসিওর কোম্পানির অফিস থেকে। এই অফিসে তখন তিনি চাকরী করতেন। এরপর এই দুটি মেয়ের মধ্যে দেখা হয়েছে অনেকবারই, কিন্তু সেবাস্তিয়ানের প্রসঙ্গে কথা প্রায় উঠ্‌তোই না। এর বছর পাঁচেক পরে ক্লেয়ার বিয়ে করেন।

এই সময়ে সেবাস্তিয়ান 'হারানো সম্পত্তি' লিখতে আরম্ভ করেন। এই বইটা যেন তাঁর সাহিত্যভুবনে অভিযাত্রার পথে এক প্রকার বিরাম। যেন হিসেব নিকেশ। পথ চলতে চলতে হারিয়ে যাওয়া সামগ্রী ও হৃদয়ের হিসেব নিকেশ। যেন থেমে গিয়ে দিঙ্‌নির্ণয় পর্ব। ঘোড়াদের পিঠ থেকে জিন নামিয়ে নেওয়া হয়েছে; তারা রাত্রির অন্ধকারে চরে বেড়াচ্ছে আর তাদের গলার ঘণ্টাগুলো টুংটাং বাজছে। শিবিরের সামনে কুণ্ডেতে আগুন গন্‌গন্ করছে। আর, তারারা জ্বল্‌জ্বল্ করছে আকাশে। এই বইয়ে এরোপ্লেন দুর্ঘটনা

নিয়ে লেখা ছোটো একটা পরিচ্ছেদ আছে। এই দুর্ঘটনায় পাইলট ও একজন ছাড়া সকল যাত্রীই নিহত হয়েছিলেন। যে যাত্রীটির প্রাণরক্ষা হয়েছিল সেই ইংরেজ ভদ্রলোকটিকে একজন চাষী দেখতে পায়। দুর্ঘটনার স্থান থেকে কিছু দূরে একটা পাথরের ওপর বসে ছিল এই চাষী। এই চাষীই ঐ ভদ্রলোককে উদ্ধার করেন। ভদ্রলোক সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গুটিয়ে বসেছিলেন। শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণার একটা প্রতিচ্ছবি। চাষী জিজ্ঞাসা করে, "ভীষণ আঘাত লেগেছে, না?" ভদ্রলোক উত্তর দেন, "কই, নাতো! শুধু দাঁতের যন্ত্রণা, সারাপথ আমাকে ভুগিয়েছে।" ছ'খানা চিঠি ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল মাঠে। মেলব্যাগের ধ্বংসাবশেষ আর কি! এর মধ্যে দু'খানা চিঠি ব্যবসায় সংক্রান্ত, জরুরী চিঠি। তৃতীয়টায় এক ভদ্রমহিলার ঠিকানা ছিল কিন্তু চিঠিটার আরম্ভ এই রকম: "প্রিয়, মিঃ মার্টিমার, আপনার এ মাসের ছ'তারিখের চিঠির···" বিষয় হোলো কোনো এক ব্যবসায়িক অর্ডার। চতুর্থ চিঠিটা জন্মদিনের সম্ভাষণ। পঞ্চম চিঠিটা একটা গুপ্তচরের। একরাশ বিচালির মতো নিরর্থক কথার মধ্যে সূক্ষ্ম সূচের মতো কয়েকটা গুপ্ত সংবাদের হদিস। শেষ চিঠিখানার উপরে ছিল কোনো ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা, কিন্তু ভিতরে ছিল প্রেম পত্র।

"জানি, মণি, তুমি এতে কষ্ট পাবে। আমাদের পিক্‌নিক্ শেষ হোলো। ফেরার রাস্তা অন্ধকার, উঁচুনিচু। গাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সের যে শিশুটা সেও ঝিমিয়ে পড়েছে। মূর্খ লোকের সস্তা কথা—সাহসে ভর করো। যাই হোক, তোমাকে জোর দেবার বা সান্ত্বনা দেবার জন্যে যাই কিছু বলি না কেন, তা দুধের পুডিংয়ের মতো তুলতুলে হবে। কী বলছি, তুমি নিশ্চয় বুঝতে পারছো। আমার কথা তুমি সব সময়ই ধরতে পারো। তোমার আমার মিলিত জীবনটা ছিল অনবদ্য। অনবদ্য বলতে গিয়ে মনে পড়ল, ঘুঘু, শাপ্‌লা আর ভেলভেট। ভেলভেট কথাটার মাঝখানে একটা

রঙ্গিলা 'ভ' আছে। লম্বা গড়ানে 'ল'টা উচ্চারণ করতে গেলে জিভটা বেঁকে ধনুকের আকার ধরে। আমাদের দুজনের মিলিত জীবন ছিল একটা অনুপ্রাসের মতো। ছোটো ছোটো নশ্বর জিনিসগুলোর কথা যখন ভাবি, যখন ভাবতে বসি দুজনে মিলে এই গুলোকে আমরা ভোগ করতে পারবো না, তখন মনে হয় আমরাও দুজন যেন ইতিমধ্যে মরে গেছি। হয়তো তাইই সত্যি। দেখেছো তো, আমাদের সুখ যত ছড়িয়ে পড়েছে তার সীমারেখা হয়ে এসেছে ততই অস্পষ্ট ; যেন তার ধার গলে মিলিয়ে গেছে—আজ দেখি গোটাটাই গলে মিলিয়ে গেছে। তোমার প্রতি আমার যে ভালবাসা তা মরেনি ; আমার মধ্যেই কিছু একটা মরেছে ; আর এই মরা ধূসরিমার মধ্যে আমি তোমাকে আর দেখতে পাচ্ছি না। জানি, এ সবই কাব্য ; মিথ্যে বলছি ; আমিই দুর্বলচিত্ত। কবি যখন আসল কথাটাকে এড়িয়ে তার চারপাশে অবান্তর কথার ফেনা ঘেঁটে তোলেন, তখন তাঁর মতো কাপুরুষ আর কেউ হয় না। মনে হয়, তুমি আমার ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছো ঃ অতিপরিচিত সেই দুর্ভাগা কারণ! 'অপর আর একজন স্ত্রীলোক' ওর সঙ্গে থাকায় আমার অশান্তির শেষ নেই। এই একটা স্বীকারোক্তি যা পূর্ণ সত্য। এই ব্যাপারে আমার আর বিশেষ কিছু বলার নেই।

"আমি না ভেবে পারি না যে, প্রেমে কিছু একটা মৌলিক ত্রুটি আছে। বন্ধু যারা, তারা কলহ করতে পারে, পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরেও যেতে পারে। আত্মীয় পরিজনের ক্ষেত্রেও তাই। কিন্তু যে মানসিক যন্ত্রণা, যে করুণ মর্মপীড়া, যে ভাগ্যপরবশতা প্রেমের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে সেই যন্ত্রণা, কারুণ্য আর দুর্ভাগ্য অন্য কোনো মানসিক সম্পর্কে নিহিত নেই। বন্ধুত্বের মুখে এই ভাগ্যহত ভাব নেই। কেন, কী হয়েছে? আমি তো তোমাকে ভালবাসা থেকে বিরত হইনি, তবু যেহেতু আমি তোমার অশ্রু

মলিন প্রিয় মুখখানায় আর চুমু খেতে পারি না সেই হেতু আমাদের সরে যেতে হবে পৃথক হয়ে। এ রকম হয় কেন?

"এই দুর্বোধ্য একনিষ্ঠতা কেন? লোকের হাজার বন্ধু থাকতে পারে, কিন্তু প্রেমাস্পদ থাকবে এক এবং একক। এখানে হারেমের প্রসঙ্গ ওঠে না আমি বলছি নাচের কথা, দেহ নিয়ে কসরতের কথা বলছি না। তুমি কি ভাবতে পারো কোনো অমিতবীর্য তুর্কী তার হারেমের চারশ পত্নীর সবাইকে তেমনি ভালবাসতে পারে যেমন আমি ভালবাসি তোমাকে? যেই মুখে বললাম 'দুই' অমনি আরম্ভ হল গোণা। আর গোণা একবার শুরু হলে তার শেষ নেই। আসলে একটাই সংখ্যা আছে এবং তা 'এক'। আর প্রেম এই এককতার সেরা নিদর্শন।

"বিদায়, প্রিয়া বিদায়। কোনোদিন তোমাকে ভুলবো না। কোনোদিন তোমার আসনে অপর কাউকে বসাবো না। যদি নিজেকেও তোমাকে বোঝাতে চেষ্টা করি যে, শুধু তোমার প্রতি আমার প্রেমটাই ছিল পবিত্র, কামগন্ধহীন, আর বর্তমানের এই আকর্ষণটা শুধুই দেহজ তাহলে সে চেষ্টা হবে অলীক। সে চেষ্টা হবে যুক্তিহীন মিথ্যাচার। সবই পিশিত আর সবই পবিত্র। কিন্তু একটা ব্যাপার সন্দেহাতীত। তোমার সান্নিধ্যে আমার ছিল সুখ আর এই অপর জনের সান্নিধ্যে আমার পীড়া। আর, এই ভাবেই চলবে জীবন। অফিসের সহকর্মীদের সঙ্গে হাস্যপরিহাস করবো, সুখাদ্য খেয়ে তৃপ্তি পাবো (অবশ্য যতদিন না ডিস্‌পেপসিয়া হয়)। উপন্যাস পড়বো, কবিতা লিখবো, কোম্পানীর কাগজের ওপর কড়া নজর রাখবো আর, আমার আচরণও থাকবে আগেরই মতন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তোমাকে ছাড়াই আমি সুখী হবো···। ঘরে ঢুকেই আসবাবের দিকে তোমার অপছন্দের চাউনি, কুশনের ওপর হাত বুলোনো, ফায়ার প্লেসের ধারে বসে যা-কিছু আমরা দুজনে একসঙ্গে দেখেছি তা সব সময় আমার কাছে মনে

হবে ঝিনুকের একটা পাট, একটা পয়সার আধখানা। মনে হবে বাকী আধখানা থেকে গেছে তোমার হাতে। আগুন-খোঁচানো শিকটাকে লক্ষ্য করে তোমার কথা বলা—বিদায়, প্রিয়া, বিদায়। চলে যেয়ো তুমি। চলে যেয়ো। আমাকে চিঠিও লিখো না। বিয়ে করো চার্লিকে বা ঐ রকম, দাঁতে-চেপে-ধরা পাইপমুখে, অন্যকোনো-জনকে' এখনকার মতো ভুলে যাও আমাকে। কিন্তু পরে মনে রেখো আমাকে—যখন তিক্ততাটুকু হারিয়ে যাবে স্মৃতি থেকে। হ্যাঁ, কাগজের এই দাগটা কিন্তু একবিন্দু চোখের জলের দাগ নয়। আমার কলমটা ভেঙে গেছে; আর, আমি এই নোংরা হোটেলের ঘরে একটা নোংরা কলম দিয়ে লিখছি। ভীষণ গরম পড়েছে। আর, যে বৈষয়িক নিষ্পত্তি করার দরকার ছিল সেটার, ঐ গাধা 'মার্টিমার'এর মতে, আমি সন্তোষজনকভাবে নিষ্পত্তি করতে পারিনি। আমার লেখা দু-একখানা বই তোমার হাতে পৌঁছে থাকবে, কিন্তু যাক, ওটা তেমন কিছু নয়। অনুরোধ, আমাকে চিঠি দিয়ো না। ইতি 'ল'।"

এই কাল্পনিক চিঠিখানা থেকে এর কাল্পনিক লেখকের নিজস্ব অংশটুকু যদি ছেঁকে ফেলে দেওয়া হয় তাহলে যা অবশিষ্ট থাকবে তাকে মোটামুটি সেবাস্তিয়ানের নিজের অনুভূত সত্য বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে ; অনেক কথা ক্লেয়ারকে উদ্দেশ্য করে লেখা বলে গ্রহণ করা যায়। যে সব ধারণা অনুভূতি আর বাসনা নিয়ে তিনি নিজের মনে খেলা করতেন তার কোনো কোনোটাকে তিনি নিজের সৃষ্ট কোনো উদ্ভট চরিত্রে আরোপ করতেন। এটা তাঁর একটা অদ্ভুত অভ্যাস ছিল। সম্ভবতঃ তাঁর নায়কের এই চিঠি তাঁর কাছে একটা কোড। এই কোডের মাধ্যমে তিনি ক্লেয়ারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের স্থায়ী সত্যটুকুকে প্রকাশ করেছেন। আমি আর কোনো লেখকের নাম জানি না যিনি লেখার এই পদ্ধতিটাকে এমন ধাঁধার মতো ব্যবহার করেছেন। আমার কাছে অবশ্যই ধাঁধা। কারণ আমি চেয়েছি লেখকের মুখোসের অন্তরালে যে আসল মানুষটা

তাঁকে দেখতে। কাল্পনিক ছবির ঝিল্‌মিল অস্পষ্টতার মধ্যে ব্যক্তিগত সত্যকে দেখতে পাওয়া খুব শক্ত। এ কাজ আরও শক্ত হয়ে ওঠে তখন, যখন আমরা বুঝতে চাই লেখক কোন্‌ অদ্ভুত ক্ষমতার বলে লিখতে লিখতে একই সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত সত্যকে অনুভব করেন এবং চিত্তের এই যন্ত্রণার মাল মসলা থেকে কোনো একটা অলীক, ঈষৎ উদ্ভট চরিত্র সৃষ্টি করেন।

১৯৩০-এর গোড়ারদিকে সেবাস্তিয়ান লণ্ডনে ফিরে আসেন। ফিরে এসে প্রবল একটা হার্ট য়্যাটাকে শয্যাশায়ী হয়ে থাকেন। এই সময়ে কোনো রকমে তিনি তাঁর 'হারানো সম্পত্তি'র রচনাটা এগিয়ে নিয়ে গেছেন। এটাই তাঁর সহজতম রচনা। এই বইটাকে পরবর্তী ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে। অর্থাৎ ক্লেয়ার যে তাঁর সাহিত্যজড়িত ব্যাপারেরও কর্ণধার ছিলেন এই সত্যটার সঙ্গে মিলিয়ে বুঝতে হবে। ক্লেয়ারের চলে যাওয়ার পর এই ব্যাপার-গুলো সম্পূর্ণ জট পাকিয়ে গেল। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে সেবাস্তিয়ান বৈষয়িক ব্যাপারে একেবারেই অমনোযোগী থাকতেন। মোটেই জানতেন না কোন্‌ প্রকাশকের সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক। এমন ভুলো, বৈষয়িক ব্যাপারে এতো অসহায়, একটা ঠিকানা মনে রাখার ব্যাপারে এতোই অক্ষম ছিলেন যে, এখন মহা গোলোযোগের মধ্যে পড়ে গেলেন এবং তা মিছিমিছিই। অদ্ভুত ব্যাপার; যে ক্লেয়ার নিজের স্বভাবে নিজেই কিশোরী মেয়ের মতো ভুলো সেই ক্লেয়ারই সেবাস্তিয়ানের কাজকর্ম সামলানোর সময় নিখুঁত বিচারের ক্ষমতা আর উপযুক্ত দৃঢ়তার পরিচয় দিতেন। কিন্তু এখন সব ছন্নছাড়া হয়ে গেল। সেবাস্তিয়ান কখনো টাইপরাইটার চালাতে শেখেননি। এতোই ঘাবড়ে গেলেন যে, নতুন করে আরম্ভ করতে ভয়ই পেলেন। 'মজার পাহাড়' বইখানা একই সঙ্গে দুটো আমেরিকান সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হোলো। সেবাস্তিয়ান স্মরণ করতে পারলেন না কী করে দুটো ভিন্ন পত্রিকাকে প্রকাশের স্বত্বটা

বিক্রি করেছিলেন। কে একজন 'সাফল্য' বইটাকে চিত্ররূপায়িত করতে চেয়েছিল। এর সঙ্গেও গোলযোগ বেধে গেল। ইনি অগ্রিম টাকা দিয়েছিলেন (সেবাস্তিয়ান এটা লক্ষ্য করেননি এমনই অন্যমনস্ক যে চিঠিপত্রও ভালভাবে পড়তেন না) কাহিনীটার একটা জমাট সংক্ষিপ্তসার ব্যবহার করার জন্য ; কিন্তু এতে রাজী হওয়ার কথা সেবাস্তিয়ান স্বপ্নেও ভাবেননি। 'তিনপলা মণি' আবার বাজারে বেরোলো কিন্তু তা প্রায় তাঁর অজ্ঞাতসারে। সেবাস্তিয়ান নিমন্ত্রণের উত্তর দিতেন না। টেলিফোন নম্বর হারিয়ে ফেলতেন; কোথায় কোন্ পুরোনো চিঠির খামের ওপর নম্বর টুকে রেখে পরে খুঁজে হয়রান হতেন। উপন্যাসের একটা পরিচ্ছেদ লিখে যতটা পরিশ্রান্ত হতেন তার থেকেও বেশী পরিশ্রান্ত হতেন এই সব তুচ্ছ ব্যাপারে। এমনও হতো যে, মন চলে গেছে অন্যত্র, হয়তো তা কোনো 'সাময়িকী'-র (সাময়িকী প্রণয়িনীর) পিছু ধাওয়া করছে আর অপেক্ষা করে আছেন কখন সে টেলিফোনে ডাকবে অমনি হঠাৎ সেই আহ্বান বেজে ওঠে। ধৈর্য. ধরতে পারেন না। একেবারে সশরীরে তার কাছে হাজির। রয় কারস্ওয়েল একবার তাঁকে এই অবস্থায় দেখেছিলেন। দেখলেন একটা লম্বা ডিগ্‌ডিগে লোক মাপের চেয়ে অনেক বড় একটা কোট পরে শোবার ঘরের চপ্পলটা পায়ে গলিয়ে নিয়ে একটা পুলম্যান গাড়ীতে চড়ে বসছেন।

তাঁর জীবনের এই সময়কার, গোড়ার দিকে গুড্‌ম্যানের আবির্ভাব। শনৈঃ শনৈঃ সেবাস্তিয়ান তাঁর বই সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপার এঁর হাতে তুলে দিলেন। নিশ্চিন্ত হলেন এমন উপযুক্ত সেক্রেটারী পেয়েছেন বলে।

গুড্‌ম্যান লিখেছেন, "আমি প্রায়ই দেখতাম উনি বিছানায় গড়াচ্ছেন—বেগড়ানো মেজাজ একটা চিতাবাঘের মতো : (দেখে মনে পড়তো একটা জনপ্রিয় উপকথার সেই নাইট ক্যাপ পরা নেকড়ের মতো)। অন্য একটা অনুচ্ছেদে লিখেছেন, "আমি জীবনে

কোনোদিন এমন মনমরা মানুষ দেখিনি, শুনেছি ফরাসী লেখক প্রুস্ত্ (এঁকে সেবাস্তিয়ান জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে অনুকরণ করতেন) কী করি কী করি ভাবের লোকদেখানো একটা বিশেষ ঢঙ নিয়ে থাকতেন।" আরও লিখেছেন : "নাইটের পাতলা শরীর পাণ্ডুরবর্ণ, চিন্ময় হাত। এই হাত দুটোকে তিনি ভাবুনে মেয়েদের মতো খেলাতে ভালবাসতেন। উনি একবার আমার কাছে প্রকাশ করেছিলেন যে, তাঁর ইচ্ছা হয় স্নানের জলে আধ বোতল ফরাসী আতর ঢেলে দিতে। দিয়েও দিলেন একবার কিন্তু ফলে খুব বিপাকে পড়েছিলেন। নাইট অধিকাংশ 'আধুনিকতাপন্থী' সাহিত্যিকদের মতোই আত্মম্ভরী ছিলেন। আমি দু'একবার দেখেছি উনি সাময়িক পত্রপত্রিকা থেকে কাটিং কাটছেন আর সেগুলোকে একটা দামী এলবামে এঁটে রাখছেন। এই এলবামটাকে তিনি তাঁর ডেস্কে চাবি দিয়ে রাখতেন, পাছে তাঁর এই দুর্বলতার চিহ্নগুলো আমার তীক্ষ্ণ সমালোচক দৃষ্টির সম্মুখে পড়ে। তিনি প্রায়ই বাইরে যেতেন, বছরে দুবার তো বটেই। মনে হয় উচ্ছল প্যারিসে···কিন্তু এ ব্যাপারে নীরব থাকতেন এবং বায়রন-সুলভ স্বপ্নালু আলস্য জাহির করতেন। কন্টিনেণ্টে বেড়াতে যাওয়া যে তাঁর শিল্পী জীবনের একটা বাঁধা কাজ ছিল এ ধারণা আমি এড়াতে পারি না। এক কথায় সেবাস্তিয়ান ছিলেন পুরোদস্তুর চালিয়াৎ।"

এ সব বাহ্য ব্যাপার। এদের চেয়ে গভীরতর বিষয়ের আলোচনা প্রসঙ্গে কিন্তু গুড্ম্যানের কণ্ঠে বাগ্মিতা ফোটেনি। বিশেষ একটা ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করা ও তারই ব্যাখ্যা করা তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। তাই তিনি শিল্পী নাইট আর তাঁর চতুর্দিকে কর্মচঞ্চল যে জগৎ এ দুয়ের মাঝখানে একটা মারাত্মক ফাটল (বৃত্তাকার ফাটল নাকি?) কল্পনা করে কোমর বেঁধে তার ব্যাখ্যা করতে বসলেন। গুড্ম্যান লিখলেন, "নাইটের মধ্যে সমব্যথিত্বের অভাব ছিল। আর এটাই তাঁর সর্বনাশের মূল।" "এইটুকু লিখে

গুড্‌ম্যান তিনটে ফুট্‌কি ছিটিয়ে দিয়েছেন। আজকের যুগে বিভ্রান্ত মানুষ যখন পথনির্দেশের জন্যে, তাদের দুঃখ অপনোদনের উদ্দেশ্যে না হোক দুঃখে সমব্যথিত্বের যাত্রা নিয়ে লেখক আর চিন্তাবিদদের দিকে সাগ্রহে চেয়ে আছে, তখন মানুষের থেকে দূরে সরে থাকা নিদারুণ পাপ।"

"গজদন্ত মিনারকে সহ্যকরা অসম্ভব, যদি এই স্তম্ভ আলোকস্তম্ভ কিংবা বেতার বিকিরণ কেন্দ্রে পরিণত না হয়। আজকের এই দুর্বার সমস্যা দিয়ে কানায় কানায় পূর্ণ যুগে যখন···আর্থনীতিক অধো-গতি···বিদেশের বাজারে মালপত্র ডাম্পকরা (কমদামে বেচে দেওয়া)··· প্রবঞ্চিত সাধারণ মানুষ···একনায়কত্বের উত্থান···বেকারি···আসন্ন অতি-মহাযুদ্ধ···পারিবারিক জীবনের নূতন নূতন সমস্যা···যৌনসমস্যা ···আর ব্রহ্মাণ্ডের গঠন···।" দেখতেই পাচ্ছেন গুড্‌ম্যানের দৃষ্টি কত সুদূর প্রসারী। এর পরেও আছে : "এই সব ইদানীন্তন প্রশ্নের প্রতি সেবাস্তিয়ানের একেবারেই কোনো আগ্রহ ছিল না। যখন তাঁকে নানা আন্দোলনের কোনো একটায় যোগ দিতে বলা হয়েছে কিংবা কাগজে অন্যান্য বিখ্যাত নামেদের সঙ্গে তাঁর নিজের সইটাকে যুক্ত করতে বলা হয়েছে, কিংবা বলা হয়েছে কোনো শাশ্বত সত্যের দিক নিতে কিংবা কোনো অবিচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে, তখনই তিনি সেই অনুরোধ সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছেন। আমি অনেক সময় এই নিয়ে মৃদু ভর্ৎসনা করেছি, অনুরোধ উপরোধও করেছি অবশ্য এটা সত্য যে, তাঁর শেষ এবং সবচেয়ে দুর্বোধ্য বইতে তিনি পৃথিবীর দিকে নজর দিয়েছেন। কিন্তু যে দৃষ্টিকোণ থেকে সেই নজর দিয়েছেন আর যে সব লক্ষণ তিনি বেছে দেখেছেন তারা চিন্তাশীল লেখকের কাছ থেকে সাধারণ পাঠকের যা স্বাভাবিক প্রত্যাশা তাকে নিরাশ করেছে।···"

গুড্‌ম্যানের এই প্রগল্‌ভতা সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করতে যাওয়া মানে পাঠকের বোধশক্তিকে অপমান করা। সেবাস্তিয়ানকে যদি

অন্ধ বলা হয়—তাহলে তাঁর একান্ত সচিব কি এই অন্ধ প্রভুর পথ প্রদর্শক একটা বিশেষ শ্রেণীর জীব? ১৯৩৩-এ রয় কার্সওয়েল সেবাস্তিয়ানের তৈলচিত্র এঁকেছিলেন। তাঁর কাছে শুনেছি, সেবাস্তিয়ান গুড্‌ম্যানের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়তেন। এই ভদ্রলোকের উৎসাহ যদি মাত্রা ছাড়িয়ে না যেতো তাহলে সেবাস্তিয়ানের পক্ষে এই আত্মগৌরবে গর্বিত মানুষটাকে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া সম্ভব হোতো না। ১৯৩৪-এ কানে থেকে সেবাস্তিয়ান কার্সওয়েলকে লিখে জানিয়ে ছিলেন যে, তাঁর 'মজার পাহাড়' বইটার একটা সংস্করণে গুড্‌ম্যান একটা বিশেষণকে বদলে দিয়েছিলেন ও ধরাও পড়েছিলেন সেবাস্তিয়ানের কাছে (সেবাস্তিয়ান সচরাচর তাঁর নিজের বই ছাপার পর আর পড়তেন না)। এই ঘটনাটা উল্লেখ করে সেবাস্তিয়ান লিখেছিলেন, "ওকে আমি বরখাস্ত করে দিয়েছি।" এই তুচ্ছ ঘটনাকে নিজের বিনয়বশতঃ (!) মিঃ গুড্‌ম্যান বোধহয় উল্লেখ করতেন না। তাঁর স্মৃতিচারণার শেষে গুড্‌ম্যান সিদ্ধান্ত করেছেন যে, মানুষ তথা শিল্পী হিসেবে তিনি যে অসার্থক হয়ে গেছেন এই উপলব্ধিটাই সেবাস্তিয়ানের মৃত্যুর কারণ। এই কথা বলে লিখেছেন যে, সেবাস্তিয়ান অন্য কাজে সরে গেলেন বলেই তাঁর সেক্রেটারীর কাজ ফুরোলো। কথাগুলি লিখেছেন লজ্জার মাথা খেয়ে। গুড্‌ম্যানের বইএর উল্লেখ আমি করবো না। ওটার প্রসার বন্ধ হয়ে গেছে। কার্সওয়েলের আঁকা ছবিটার দিকে চেয়ে দেখি ছবির মুখখানা যতই বিষাদ মাখা থাক না কেন চোখে একটা পরিহাসের চমক চিক্‌চিক্ করছে। এই চোখের গাঢ় ধূসর সবুজরঙের ভাসা মণিটা আর তার চারপাশে আরো ঘোর রঙের ঘেরটা চিত্রকর আশ্চর্যভাবে এঁকেছেন। যেন এই তারাটাকে ঘিরে রয়েছে চূর্ণ সোনার রেণু। চোখের পাতাগুলো ভারী, সামান্য একটু ফোলা ফোলা, ঝকঝকে তারার উপর দু-একটা শিরা এসে যেন ফেটে

পড়েছে। এই চোখদুটো আর মুখখানাকে এমন ভাবে আঁকা হয়েছে যেন চিত্রশিল্পী এই মুখখানাকে নির্মল জলের ওপর নার্সিসাসের মুখের মতো প্রতিবিম্বিতরূপে দেখতে চেয়েছেন। বসে যাওয়া গালের ওপর সেই জলের কুঞ্চন উঠেছে, যেন একটা দাঁড়ানো জল-মাকড়সা পায়ে পায়ে পিছনে হেঁটে এইমাত্র ভেসে গেছে। কপালের প্রতিবিম্ব যেখানে, সেখানে একটা শুকনো পাতা ঝরে পড়েছে। ফলে কপালটা কুঁচকে গেছে, তার সঙ্গে চোখ দুটোও। মুখের ওপর কালো রঙের অবিন্যস্ত চুল। এই চুলের ওপরও যেন জলের একটা কুঞ্চন ঝিলমিল করে উঠেছে। কপালের পাশে এই ঢেউটার একটা শিরে ভিজে রোদ যেন ঝিলিক দিয়ে উঠেছে। সরল দুই ভ্রূর মধ্যে একটা গভীর খাঁজ। আর একটা খাঁজ নাকের ধার বেয়ে বিষণ্ণ পাণ্ডুর দৃঢ়বদ্ধ ঠোঁট পর্যন্ত টানা। একটা অস্পষ্ট দুধ্‌রঙের ছায়া ঘাড়টা ঢেকে দিয়েছে পাতলা মেঘের মতো, দেহের ঊর্ধ্বাংশ যেন মিলিয়ে গেছে। ছবির পটভূমিতে রহস্যময় নীল, আর তার একটা কোণে ছোটো ছোটো ডালপালার একটা জাফ্‌রি। সেবাস্তিয়ান এক চিলতে জলে নিজের দিকে নিজেই চেয়ে রয়েছেন।

"মনে হয়েছিল তাঁর পিছনে বা ওপরে কোথাও একজন নারীর আভাস এঁকে দিই—একটা হাতের ছায়া, হয়তো আরো কিছু···কিন্তু নিবৃত্ত হলেম, আমি ছবি আঁকতে বসেছি, গল্প বলতে নয় এই ভেবে।"

"কিন্তু এ ধরনের কোনো নারীর সম্বন্ধে কেউ তো কিছু জানে না। এমন কি শেলডনও না।"

"ঐ নারী তাঁর জীবনটাকে ভেঙে চূর্ণ করে দিয়েছিলেন। এইটুকু বললেই তাঁর সম্বন্ধে সব বলা হয়ে যায়, নয় কি?"

"না, আমি এরও বেশী জানতে চাই, আমি সব জানতে চাই। তা না হলে সেবাস্তিয়ান আপনার ছবির মতোই অসম্পূর্ণ থেকে যাবেন। ছবিটা খুব ভালো, প্রকৃত মানুষটার সঙ্গে মিলটাও আশ্চর্য। বিশেষ করে আমি ঐ ভাসা মাকড়সাটায় একেবারে

মোহিত। জলের ভিতরে লাঠির বেঁটে ছায়ার মতো পায়ের ছায়াটা দেখে। কিন্তু মুখখানা? এ তো কোনো অতর্কিত মুহূর্তের প্রতিবিম্ব। যে কোনো মানুষ তো জলে মুখ দেখতে পারে?"

"তবু, আপনি কী মনে করেন না যে, উনি নিজের মুখখানাকে খুবই ভাল করে দেখেছেন?"

"হ্যাঁ, আপনি কী বলছেন বুঝতে পারছি। যাই হোক ঐ নারীকে আমার খুঁজে বের করতেই হবে। তাঁর জীবন-পরিণতির সুতোটা এখানে ছিঁড়ে গেছে। খেইটাকে খুঁজে বের করতেই হবে। এই প্রয়োজনটা ঠেকানো প্রয়োজন।"

রয় কার্সওয়েল বললেন, "এই ছবিখানা বাজী রইল, আপনি খুঁজে পাবেন না!"

॥ বার ॥

প্রথমেই জানতে হবে তিনি কে। কিন্তু সন্ধান শুরু করবো কোনখান থেকে? হাতে কীই বা তথ্য রয়েছে? ১৯২৯এর জুনে সেবাস্তিয়ান ব্লাউবের্গের বোমন্ট হোটেলে ছিলেন, আর সেখানেই এঁর সঙ্গে তাঁর দেখা। জাতিতে রাশিয়ান। আর কোনো সূত্র জানা নাই।

সেবাস্তিয়ানের মতো, ডাক ব্যবস্থার প্রতি আমার নিজেরই একটা বিরাগ আছে। একরত্তি একখানা চিঠি লিখে, তার নাম মনে করা, তারপর ঠিকানা খুঁজে বের করা, টিকিট কেনা, শেষে পোস্ট করা (আর চিঠিখানা ফেলার পর সই করেছি কিনা ভেবে মাথা খারাপ করা) এর চেয়ে আমার পক্ষে হাজার মাইল পাড়ি দেওয়াও সহজ। তা ছাড়া, হাতের এই ব্যাপারটার সঙ্গে শালীনতার প্রশ্ন এমন ভাবে জড়িত যে, চিঠি লেখার কথাই ওঠে না। ১৯৩৬-এর মার্চ মাসে, ইংলণ্ডে এক মাস থাকার পর একটা টুরিস্ট অফিসে খোঁজ খবর নিয়ে

ব্লাউবের্গ যাত্রা করলাম। ভিজে ভিজে মাঠ, স্রোতের মতো টানা সাদা কুয়াশা, আর এই টানা স্রোতের ওপর সরল পপ্‌লার গাছের আব্‌ছা গুঁড়িগুলো ভাসছে। দেখে ভাবলেম এই দিক দিয়ে সে গেছে। হালকা ধূসর রঙের একটা পাহাড়ের পায়ের তলায় ছোট্ট একটা টালিছাওয়া শহর গুঁড়ি মেরে রয়েছে। জনশূন্য ছোট্ট রেল-স্টেশনের বিশ্রামঘরে আমার হাতের ব্যাগটা ফেলে রাখলেম। শান্‌টিং-এ ফেলেরাখা কোনো মালগাড়ী থেকে গরুবাছুরের বিষণ্ণ টানা হাম্‌বা হাম্‌বা রব উঠছিল।

এসব পিছনে ফেলে রেখে, ক্রমশঃ উঁচুতে-ওঠা একটা পথ ধরে ভিজে ভিজে গন্ধ-ওঠা একটা পার্ক পেরিয়ে এক ঝাঁক হোটেল আর স্বাস্থ্যনিবাসের দিকে এগিয়ে গেলেম। লোকজন খুব কম। কারণ, সময়টা ভ্রমণের ঋতুর মাঝামাঝি নয়। হঠাৎ বুকের মধ্যে ধড়াস্‌ করে উঠ্‌ল—হোটেলটা তো বন্ধ থাকতে পারে!

কিন্তু না; বন্ধ ছিল না। যা হোক এটুকুও কপাল ভালো। বাড়ীটা মোটামুটি মনোরম। সযত্নলালিত বাগান, বাগানে বাদাম গাছে বোল এসেছে। দেখে মনে হোলো বাড়ীটার মধ্যে জন-পঞ্চাশেকের বেশী মানুষ ধরবে না। মনে জোর পেলেম। লোক যত কম হয়, ততই ভালো। হোটেলের ম্যানেজারের মাথায় কাঁচাপাকা চুল, সযত্নে ছাঁটা দাড়ি, আর ভেলভেট-কালো চোখ। খুব সাবধানে কাজে এগোলেম। প্রথমেই বললেম, আমার পরলোকগত দাদা বিখ্যাত লেখক সেবাস্তিয়ান নাইট এখানে থেকে খুব খুশী হয়েছিলেন, তাই আমিও গ্রীষ্মকালটা এখানে কাটাবো স্থির করেছি। ভাবলেম একখানা ঘর ভাড়া নিয়ে সন্তর্পণে ঢোকাই ভালো। ঢুকে লোকদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতার চেষ্টা করবো, উপযুক্ত মুহূর্ত পর্যন্ত আমার জিজ্ঞাসা-টাকে চেপে রেখে দেবো। কিন্তু কেন জানি মনে হোলো আমার কাজটার সঙ্গে সঙ্গেই নিষ্পত্তি হতে পারে। তিনিও রাজী হয়ে গেলেন। ১৯২৯-এ যে ইংরেজ ভদ্রলোকটি ছিলেন তাঁর কথা তিনি

স্মরণ করতে পারলেন। ভদ্রলোক রোজ সকালে স্নান করতে চাইতেন। আমি যেন মামুলি একটা প্রশ্ন করছি এমনি ভান নিয়ে জিজ্ঞাসা করলেমঃ "উনি সহজে লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতেন না, তাই না? সব সময় বুঝি একলাই থাকতেন?"

হোটেল ম্যানেজার অনিশ্চয়তার সুরে বললেন, "যতদূর মনে হয় তাঁর সঙ্গে তাঁর বাবা ছিলেন।" এইভাবে গত দশ বছরে বোমণ্ট হোটেলে যে তিনচারজন ইংরেজ ভদ্রলোক থেকেছিলেন তাঁদিকে একটা সাধারণ জট থেকে আলাদা করে চিনে বের করার জন্যে মনে মনে কিছুক্ষণ মল্লযুদ্ধ করতে থাকলেম। বুঝলেম উনি তেমন পরিষ্কার ভাবে সেবাস্তিয়ানকে মনে করতে পারছেন না।

"খোলাখুলি বলাই ভালো", আমি দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে বলে বস্‌লেম, "ঐ একই সময়ে আমার দাদার এক বান্ধবী এখানে ছিলেন। আমি তাঁর ঠিকানাটাই সন্ধান করছি।" হোটেল ম্যানেজারের কপালে ভ্রূকুটির আভাস দেখলেম। এই যা! ভুল করলেম না তো!

জবাব দিলেন "কেন?" (মনে মনে চকিতে ভাবলেম কিছু ঘুষ দেবো কি?)

আমি আবার বলি, "দেখুন, আমি যে খবরটা চাইছি সেটা যোগাড় করতে যে ঝঞ্ঝাট হবে তার পারিশ্রমিক দিতে আমি রাজী।"

"কোন্ খবর?" জিজ্ঞাসা করেন তিনি। লোকটা বোকা বোকা হলেও ঘুঘু। ভগবান করুন এই পঙ্‌ক্তিগুলো তার চোখে যেন কখনো না পড়ে।

ধৈর্য না হারিয়ে আবার বললেম, "আমি ভাবছিলেম কি··· আপনি কি অনুগ্রহ করে এক ভদ্রমহিলার ঠিকানা সংগ্রহ করতে সাহায্য করবেন? ১৯২৯-এর জুন মাসে মিঃ নাইট যখন এখানে ছিলেন, তখন ইনিও ছিলেন এখানে।"

"মহিলা? কোন্ মহিলা মশায়?" জিজ্ঞাসা করলেন। লুইস

ক্যারলের গল্পের শুঁয়ো পোকার মতো, প্রশ্নটা যেন অলীক—কণ্ঠস্বরে এমনি একটা ভাব ফুটিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন।

ঘাবড়ে গিয়ে বললেম, "নামটা ঠিক জানিনে তো!"

কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে অসহায় ভঙ্গীতে জবাব দিলেন, "তাহলে আমিই যে খুঁজে পাবো তার মানে কি?"

বললেম, "তিনি জাতিতে রুশ ছিলেন। রুশ মহিলা কিনা, তাই আপনার মনে থাকলেও থাকতে পারে···বয়সে তরুণী···আর আর দেখতে শুনতে ভালোই!···

খানদানি ফরাসী ভাষায় যা বললেন তার মর্মার্থ—"সুন্দরীরা হামেশাই এখানে এসে থাকেন।" তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে মনে হোলো ভদ্রলোকের মনোযোগ ক্রমশঃ আমার দিক থেকে সরে যাচ্ছিল। "কী করে মনে করি বলুন?"

"আমার মনে হয় সবচেয়ে সোজা উপায় হোলো আপনার খাতা-পত্র দেখে ১৯২৯-এর জুন মাসে লেখা রুশ নামগুলিকে বাছাই করা!"

"অনেকগুলোই থাকবে নিশ্চয়। নাম যদি না জানেন তো যাঁকে আপনার দরকার তাঁকে বেছে বের করবেন কি করে?"

আমি নাছোড়বান্দা হয়ে বলে ফেলি, "আচ্ছা আমাকে সেই নাম আর ঠিকানাগুলো দেন, বাকী কাজটা আমি নিজেই করে নেবো।"

লম্বা শ্বাস টেনে তিনি ঘাড় নাড়লেন—"না।"

গলার স্বরটাকে যথাসম্ভব অনুত্তেজিত রাখার চেষ্টা করে জিজ্ঞাসা করলেম, "অর্থাৎ, আপনি বলছেন, আপনার খাতাপত্র নাই?"

"নাই? কী বলছেন? নিশ্চয়ই আছে। ব্যাবসার খাতিরে এসব ব্যাপারে নিখুঁত হতেই হয়। ও হ্যাঁ,···আছে···নামগুলো নিশ্চয়ই আছে?" বলে নড়বড় করতে করতে ঘরের পিছন দিকে গিয়ে একখানা বড় কালো খাতা বের করে নিয়ে এলেন।

"এই দেখুন ১৯৩৫-এর জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহ···প্রফেসর অট্ সস্ত্রীক, কর্ণেল সামাইন···"

"১৯৩৫-এর জুলাই নিয়ে আমার কী হবে···আমি চাইছি···" ভদ্রলোক ধড়াম করে খাতাখানা বন্ধ করে যেদিক থেকে এটা এনেছিলেন সেই দিকে চলে গেলেন। আমার দিকে পিছন ফিরেই জবাব দিলেন—"আমি শুধু আপনাকে দেখাতে চেয়েছিলেম (চাবি বন্ধ করার শব্দ এলো কানে) যে খাতাপত্র আমি ভালোভাবেই রাখি।" ডেস্কে ফিরে এসে ব্লটিং পেপারের ওপর যে একখানা চিঠি খোলা পড়েছিল সেটা ভাঁজ করতে শুরু করলেন।

"১৯২৯-এর গ্রীষ্মকাল," আমি উপরোধের স্বরে বললেম, "যে পাতাটা আমি দেখতে চাইছি সেটা আমাকে দেখান না কেন?"

"হয় না। প্রথমতঃ আমি চাই না যে, কোনো অপরিচিত ব্যক্তি আমার আগেকার বা হবু মক্কেলদের উত্যক্ত করুন, আর দ্বিতীয়তঃ আমি বুঝতে পারছি না, যে স্ত্রীলোকটির নাম আপনি করতে চাইছেন না, তাকে খোঁজার এতো আগ্রহ কেন আপনার? তৃতীয়তঃ আমি নিজে বাড়তি কোনো ঝঞ্ঝাটে পড়তে চাই না। এমনিতে অনেক ঝঞ্ঝাট।" এ প্রসঙ্গে নিতান্তই অবান্তর, তবু বললেন, "ঐ দেখুন না ঐ হোটেলে ১৯২৯-এ সুইজারল্যাণ্ডের এক মাণিক-জোড় আত্মহত্যা করে বসলেন।"

জিজ্ঞাসা করলেম, "তাহলে এই আপনার শেষ কথা?"

সায় দিলেন ঘাড় নেড়ে। হাতের ঘড়িটা দেখালেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরলেম, পিছনের দরজাটাকে জোরে ঠেলে দিয়ে বেরিয়ে এলেম। দরজাটায় কিন্তু কোনো শব্দ হোলো না। ঐ যে এক ধরনের পোড়া দরজা আছে, যেগুলো দুম্ করে শব্দ করে না, যন্ত্রে পোরা হাওয়ায় শব্দটা মারা যায়।

ধীর পদে স্টেশনের দিকে ফিরলেম। সেই পার্কে। সেই সেডার গাছের তলায় সেই বেঞ্চটা। হয়তো মৃত্যুকালে ঐ বেঞ্চটার কথা সেবাস্তিয়ানের মনে পড়েছিল।

ঐ যে দূরে আকাশে আঁকা পাহাড়ের ঐ রেখাটা ওটা তাঁর

জীবনের কোনো এক অবিস্মরণীয় সন্ধ্যার কোনো অতুল আনন্দের দস্তখতের নিচে টানা লাইনের মতো।

গোটা এই জায়গাটাকে আমার মনে হোলো একটা প্রকাণ্ড জঞ্জালের স্তূপ আর আমি জানি এই জঞ্জালের মধ্যে একটা ঘোলাটে রঙের হীরে গেছে হারিয়ে। আমি এটাকে খুঁজছি অথচ পাচ্ছি না। এই ঘটনাটা যেমন বিসদৃশ, তেমনি দারুণ মর্ম্মন্তুদ। যেন সীসের মতো ভারী হাত পা নিয়ে স্বপ্নের মধ্যে চেষ্টা কিংবা যতই হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছি ততই মিলিয়ে যাচ্ছে। যা অতীত তা কি কিছুতেই আয়ত্তে আসবে না?

আর, এখন কী করি? যে চরিতাখ্যানের প্রবাহে পাড়ি দেবো বলে সাগ্রহে অপেক্ষা করে ছিলেম, সেই প্রবাহটা তার একটা শেষ বাঁকে এসে কুয়াশায় হারিয়ে গেল, সামনের ঐ উপত্যকার মতো। এটাকে বাদ দিয়েই কি আখ্যানটা লিখে যাবো? একখানা খাপছাড়া বই? একখানা অসম্পূর্ণ ছবি? পাঁজরে তীর-বেঁধা মৃত কোনো শহীদের ছবি—হাতপায়ের জায়গায় যার কোনো রঙ চড়ানো নাই।

অনুভব করলেম, আমি পথ হারিয়েছি; আর কোথাও যাবার নাই। সেবাস্তিয়ানের জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রণয় আখ্যানটা জানবার জন্যে দীর্ঘদিন ধরে ভেবেচিন্তে যে উপায়টা আবিষ্কার করেছিলেম সেটা ব্যর্থ হওয়ায় মনে হোলো আর কোনো উপায়ান্তর নাই। হায়, সেই নামটা! ঐ তেল চক্‌চকে খাতাগুলো যদি পেতেম তাহলে বুঝি ঐ নামটা সঙ্গে সঙ্গেই চিনে নিতে পারতেম। সন্ধানটা কি ছেড়ে দেবো? ছেড়ে দিয়ে সেবাস্তিয়ানের সম্বন্ধে যে সব খুঁটিনাটি এখনো জানা দরকার, যাদের সন্ধান আমার আয়ত্তে, এখন কি শুধু সেগুলিকেই সংগ্রহ করবো?

মন এই সব চিন্তায় বিভ্রান্ত। একটা ঢিক্ ঢিক্ করে-চলা লোকাল ট্রেনে চড়ে বসলেম। এই ট্রেনে স্ট্রাসবুর্গ ফিরে যাবো।

সেখান থেকে চলে যাবো সুইজারল্যাণ্ডে। হয়তো···না···আমার এই পরাজয়ের গ্লানিটা বুকের ভেতর কাঁটার মতো বিঁধছিল, কিছুতেই এটা এড়াতে পারছিলেম না। হাতের ইংরেজী কাগজটার মধ্যে ডুবে যেতে চাইলেম, তাও পারলেম না।

যে কাজটায় হাত দিতে চলেছি সেই কাজের প্রয়োজনে নিজেকে তালিম দিচ্ছিলেম ইংরেজী পড়ে পড়ে। কিন্তু মনের মধ্যেই যে বিষয় অসম্পূর্ণ, তাকে কি লিখতে আরম্ভ করা যায়? প্রথমে কামরায় একা ছিলেম (এই ধরনের ট্রেনে সেকেণ্ড ক্লাশ সচরাচর এমনিই ফাঁকা থাকে) কিন্তু পরের স্টেশনে একজন বেঁটে লোক প্রবেশ করলেন। পুরু ভ্রূ। ঢুকেই তাঁর কণ্ঠ্যবর্ণবহুল ফরাসীতে আমাকে অভিবাদন করলেন, কন্টিনেণ্টের প্রচলিত কায়দায়। তারপর আমার মুখোমুখি বসে পড়লেন। ট্রেন চলল। যেন সোজা সূর্যাস্তের দিকে। হঠাৎ লক্ষ্য করলেম মুখোমুখি-বসা যাত্রীটি আমার দিকে হাসি হাসি মুখ করে চেয়ে রয়েছেন।

"চমৎকার আবহাওয়া, না?" ভদ্রলোক তাঁর মাথা থেকে গোল টুপিটা খুলে ফেললেন। টুপির নিচে থেকে বেরিয়ে এল একটা গোলাপী রঙের টাক। নড্ করে, হেসে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনি কি ইংরেজ?" উত্তর দিই, "হ্যাঁ, একরকম তাই।" আমার হাতের ইংরেজী কাগজটার দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন, "দেখছি, দেখলেম, আপনি একটা ইংরেজী 'জুরনাল' পড়ছেন।" বলেই হাত থেকে হাল্কা হলুদ রঙের দস্তানা খুলে আবার আগের মতোই আঙুল বাড়িয়ে দিলেন (তিনি হয়তো শুনেছিলেন যে দস্তানাঢাকা অনামিকা দিয়ে নির্দেশ করাটা অভব্যতা!)। আমি বিড় বিড় করে কিছু বললেম, তারপর অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেম। ট্রেনে বক্‌বক্ করা আমি এমনিতেই পছন্দ করি না, তারপর এই বিশেষ মুহূর্তে লোকটার প্রতি কেমন যেন বিরাগ অনুভব করলেম। উনি আমার দৃষ্টিকে অনুসরণ করলেন। সূর্য দিগন্তের কোলে নেমে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড বাড়ীর

অসংখ্য জানালাগুলোকে জ্বালিয়ে দিয়েছে। ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীটা ধীরে ধীরে ঘুরছিল। ঘুরতে ঘুরতে দৃষ্টিপথে একটা চিম্‌নি এগিয়ে দিলে, তারপর আরও একটা। খটাং খটাং করতে করতে ট্রেন এগিয়ে চলেছে।

বেঁটে ভদ্রলোক তাঁর ফরাসী জিভে ইংরেজী বলার চেষ্টা করলেন, "ঐ যে ওটা 'ফ্লাম বাউম ও রঠ' কারাখানা…কাগজ।" কয়েক নিমেষ চুপ। তারপর মুখের ওপর চক্‌চকে নাকটা চুলকে আমার দিকে ঝুঁকলেন।

"আমি দেখেছি, লণ্ডন, মানচেস্‌টার, শেফিল্ড, নিউকাস্‌ল্" এক একটা আঙুলে এক একটা শহর গুনছিলেন। বুড়ো আঙুলটায় কিছু গোনা হোলো না। চেয়ে রইলেন সেটার দিকে। "হ্যাঁ, 'ডি টয় বিজনেস'…খেলনার ব্যাবসা—যুদ্ধের আগে। একটু-আধটু ফুটবলও খেলতেম…" বলে চললেন। হয়তো তিনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে, সেই মুহূর্তে আমি একটা এব্‌ড়ো খেব্‌ড়ো মাঠের দিকে তাকিয়ে ছিলেম। সেই মাঠের দুদিকে একজোড়া করে অবহেলিত গোলপোস্ট দাঁড়িয়ে ছিল। এদের একজোড়ার মাথায় লম্বা কাঠখানা ছিল না। তাঁর চোখদুটো মিট্ মিট্ করে উঠ্‌ল, ছোট্ট গোঁফটা যেন খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠ্‌ল।

"একবার, জানেন,…" চাপা হাসিতে যেন গড়িয়ে পড়লেন, "জানেন, একবার, বাইরে থেকে বলটা সোজা গোলে চালিয়ে দিয়েছিলেম…"

বিস্বাদকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করি, "আপনি তাহলে স্কোর করেছিলেন, বলুন!"

"আমি? স্কোর? না, হাওয়া স্কোর করেছিল। একটা 'রবিনসোনাডা' আর কি!"

"সে আবার কি?"

"রোবিন সোনাডা একটা কায়দার নাম। ও, হ্যাঁ, আপনি কি অনেক দূর যাচ্ছেন?" মাত্রাতিরিক্ত মোলায়েম সুরে জিজ্ঞাসা করলেন।

"তা—এ ট্রেন তো স্ট্রাসবুর্গ ছাড়িয়ে যায় না! যায় কি?"

"না, ঠিক তা বলছি না! বলছিলেম আপনি কি বেড়াতে বেরিয়েছেন?"

বললেম, "হ্যাঁ।"

"কোন্‌দিকে?" মাথাটা খাড়া করে জিজ্ঞাসা করলেন।

"বলতে পারেন, অতীতে," উত্তর দিলেম।

মাথা নাড়লেন, যেন বুঝতে পেরেছেন এমনি ভান করে। তারপর আমার দিকে ঝুঁকে হাঁটু ছুঁয়ে বললেন, "এখন আমি চামড়া বেচি,—বুঝলেন—চামড়ার বল,—অন্যেরা খেলবে বলে! পুরোনো নয়, নতুন। এ ছাড়াও, কুকুরের মুখঢাকা চামড়াও বেচি, আর ঐ ধরনের সব টুকিটাকি!" ইংরেজী ভাষার শব্দগুলো তাঁর মুখ থেকে অদ্ভুত ভাবে বিকৃত হয়ে বেরিয়ে এল। আবার হাঁটু ছুঁয়ে বললেন, "কিন্তু এর আগে, এই ধরুন গত বছর,...গত চার বছর আমি পুলিসে ছিলেম: অবশ্য একবারই নয়...তা ছাড়া...সে পুলিস নয়, আমি ছিলেম সাদা পোশাকের পুলিস—। বুঝলেন?"

সহসা লোকটার প্রতি আমার আগ্রহ জাগল।

"ও, আচ্ছা,—তাহলে,—" আমার মাথায় একটা আইডিয়া—খেলে গেল।

"আজ্ঞে হাঁ, আপনি যদি কোনো সাহায্য চান, যেমন ধরুন ভালো চামড়ার সিগারেট কেস, স্ট্র্যাপ, বক্‌সিং-এর গ্লাভস্‌, কোনো পরামর্শ..."

"পাঁচ নম্বরটা চাই, আর হয়তো প্রথমটাও।" বলি শেষকালে।

পাশে সীটে-পড়ে-থাকা টুপিটা তুলে নিয়ে সেটাকে খুব যত্ন করে মাথায় মনোমত করে বসালেন (এই সময় তাঁর কণ্ঠার হাড়টা ওপরে নিচে দৌড়ঝাঁপ করছিল)। তারপর চক্‌চকে মুখে একগাল হেসে টুপিটা আমাকে উদ্দেশ্য করে আবার খুলে ফেললেন।

বললেন, "আমার নাম সিলবারম্যান" বলেই হাত বাড়িয়ে

দিলেন। তাঁর হাতখানা আমার নিজের হাতে নিয়ে নাড়া দিয়ে আমিও আমার নাম বললেম। নিজের হাঁটুতে চাপড় মেরে বলে উঠলেন, "এটা কিন্তু ইংরেজ রীতি নয়, এটা রুশ রীতি।" রুশ ভাষায় বললেন গাভারিতে পরুশাকি? (রুশ বলতে পারেন কি?) আরও সব ছুট্‌কো ছাট্‌কা কথা জানি—দাঁড়ান···হ্যাঁ, 'কুকোল্‌কা' মানে ছোট্ট পুতুল।" মিনিটখানেক দম নিলেন। ওঁর কথায় যে আইডিয়াটা মাথায় এসেছিল সেটাকে মাথার মধ্যে ঘোরাতে লাগলেম। কোনো প্রাইভেট ডিটেকটিভের পরামর্শ নিলে কেমন হয়? এই লোকটা কি এ ব্যাপারে কোনো কাজে আসতে পারে?

চেঁচিয়ে উঠলেন,—'রিবা'—ঐ আর একটা কথা। মানে মাছ? তাই না?···আর···আর···'ব্রাত্‌', 'মিলী ব্রাত্‌'···মানে ভাইটি!" বললেম, "ভাবছিলাম যে হয়তো···আমি কি আপনাকে বলেছি যে—আমি একটা সমস্যায় পড়েছি?"

উনি আপন মনে বলে গেলেন, "কিন্তু ব্যস্‌, ঐ পর্যন্ত!···" দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন। আবার আঙুল গুনে গুনে বলতে লাগলেন, "আমি কথা বলতে পারি লিথুয়ানিয়ানে, জর্মনে, ইংরেজীতে, ফরাসীতে···" বুড়ো আঙুল আবার বাদ থেকে গেল। "রাশিয়ান ভুলে গেছি একেবারেই!"

বলতে গেলেম, "আপনি যদি···"

উত্তর এল, "যা কিছু বলবেন, চামড়ার বেল্ট, পার্স, নোটিশবই, পরামর্শ···"

"হ্যাঁ, পরামর্শ। দেখুন আমি একজনের হদিশ পাবার চেষ্টা করছি···এক রুশ ভদ্রমহিলা, যাঁকে আমি কখনো দেখিনি, যাঁর নাম আমি জানি না। এইটুকু মাত্র জানি যে, তিনি ব্লাউবের্গের একটা কোনো হোটেলে কোনো এক সময়ে উপস্থিত ছিলেন।"

সিলবারম্যান বললেন, "অতি উত্তম জায়গা, অতি উত্তম···" গম্ভীরভাবে জায়গাটার উৎকর্ষ স্বীকার করলেন। সেই গাম্ভীর্যে তাঁর

ঠোঁটের দুদিকের কাণা ঝুলে পড়ল, "জল ভালো, বেড়ানোর জায়গা আছে ভালো, নাচের হলটাও ভালো। কী করতে হবে বললেন ?"

"দেখুন, আমি জানতে চাই এরকম ক্ষেত্রে কী করা যেতে পারে।" সিলবারম্যান চট করে বলে বসলেন, "কী হবে ? বাদ দেন মেয়েটাকে !" মুখখানাকে সামনের দিকে এগিয়ে দিলেন, দেখলেম মুখের ওপর ভ্রূজোড়া নড়ছে।

"ওকে ভুলে যান। মাথা থেকে উপড়ে ফেলুন। বিপজ্জনক, বেফায়দা !" তিনি আমার হাঁটুর ওপর ট্রাউজার থেকে কিছু একটা যেন চিম্‌টে তুলে নিলেন, মাথা নাড়লেন, তারপর গুছিয়ে বসলেন।

"সে কথা যাক্ ! প্রশ্নটা কেমন করে জানা যাবে, কেন জানবো নয়।"

"প্রত্যেক 'কেমনের' একটা 'কেন' আছে"—বললেন সিলবারম্যান। "তাঁর আদলটা দেখেছেন, ছবি দেখেছেন, এবার তাঁকে সশরীরে দেখতে চাইছেন ? প্রেম ? না, এটা প্রেম নয়। ছাড়ুন, এ একেবারে ভাসা ভাসা ব্যাপার !"

"না, না, ঠিক তা নয়। তিনি দেখতে কেমন তা আমি ঘুণাক্ষরে জানি না। দেখুন, আমার দাদা, তিনি মারা গেছেন, আমার দাদা ওঁকে—ভালবাসতেন। দাদার ব্যাপারে উনি কি বলেন আমি জানতে চাই। ব্যাপারটা খুবই সরল।"

"আ-হা !" বলে সিলবারম্যান সমবেদনায় মাথা দোলালেন। আমি থামলেম না, "আমি দাদাকে নিয়ে একখানা বই লিখতে চাই। তাই তাঁর জীবনের সমস্ত খুঁটিনাটিতে আমার আগ্রহ।"

"কী রোগ হয়েছিল ?" সিলবারম্যানের গলা যেন ভিজে গেছে।

"হার্ট।"

"হা-র্-র্-ট ? খুবই খারাপ !···নানা বাধা নিষেধ···নানান··· ইয়ে···"

"হ্যাঁ, মরণের মহলা !"

"আচ্ছা, কতো বয়েস হয়েছিল ?"

"ছত্রিশ। বই লিখতেন। নামে মায়ের উপাধি নিয়ে। উপাধি ছিল নাইট। সেবাস্তিয়ান নাইট নামে লিখতেন।"

"এই যে এখানে লিখুন।" সিলবারম্যান আমার হাতে সুন্দর রূপো বাঁধানো একটা পেনসিলশুদ্ধ অতি সুন্দর একখানা নতুন নোটবই এগিয়ে দিলেন। লিখলেম। অমনি ফর্‌ফর্‌ করে পাতাটা ছিঁড়ে নিয়ে পকেটে পুরলেন, তারপর নোটবইখানা আমাকে ফিরিয়ে দিলেন।

"এটা আপনার পছন্দ হয়েছে?" ঈষৎ উদ্‌বিগ্ন হয়ে হাসলেন আমার দিকে চেয়ে। "যদি কিছু মনে না করেন, এই ছোট্ট উপহার···"

"চমৎকার।···অশেষ ধন্যবাদ!"

হাতনেড়ে বললেন, "না, না, এমন কিছু নয়। এবার বলুন কী চাই!"

যাঁরা ১৯২৯-এর জুন মাসে বোমণ্ট হোটেলে ছিলেন তাঁদের সবারই নামের একখানা লিস্ট আমার দরকার। বিশেষ করে, মহিলাদের পরিচয়টা দরকার। দরকার তাঁদের ঠিকানাগুলো। বিদেশী নামের আড়ালে যে কোনো রুশ মহিলা নিজেকে আড়াল করেন নি সেটাও সঠিক জানা দরকার। এরপর, সবচেয়ে সম্ভাব্য নামগুলিকে বেছে নিয়ে···"

"তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন? এই তো?" সিলবারম্যান মাথা ঢুলিয়ে বললেন।

হাতের তালু দেখিয়ে বললেন, "আচ্ছা, আচ্ছা! সব হোটেল মক্কেলরা আমার এই হাতের মুঠোর মধ্যে ছিল এবং আছেও। আপনার ঠিকানাটা ?"

আর একটা নোট বই বের করলেন। এবারকার নোটবইটা খুব পুরোনো, কতকগুলো লেখাপাতা শীতে ঝরা পাতার মতো খসে পড়ছে। আমি ঠিক করলেম ইনি আমার সঙ্গে আবার দেখা না করা পর্যন্ত আমার স্ট্রাসবুর্গ ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না।

"শুক্রবার" তিনি বললেন, "ঠিক, ছটায়।" এরপর এই আশ্চর্য

বেঁটে মানুষটি নিচু সীটের মধ্যে যেন ডুবে গেলেন। হাত গুটিয়ে চোখ বন্ধ করে রইলেন। কাজকর্মের ব্যাপারের নিষ্পত্তি হওয়ার পর আমাদের মধ্যে কথাবার্তার প্রয়োজন যেন ফুরিয়া গেল। তাঁর টাকের ওপর একটা মাছি ঘুরে ঘুরে পর্যবেক্ষণ করছিল, কিন্তু তাঁর কোনো নড়ন চড়ন নাই। স্ট্রাসবুর্গ পর্যন্ত ঝিমিয়ে রইলেন, তারপর আমরা যে যার পথে চলে গেলেম।

হ্যাণ্ডশেক করে বিদায় নেবার সময় বলি, "হ্যাঁ, দেখুন, আপনার 'ফী'-টা আমার জানা দরকার···আপনি যা উপযুক্ত মনে করবেন তাই দিতে রাজী·· হয়তো কিছু আগাম···"

উনি একটা ভোঁতা আঙুল উঁচিয়ে বললেন, "আপনার বই এক-খানা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন। "আর খরচপত্র যা হবে", বললেন নিম্নস্বরে—"তাতো অবশ্যই দেবেন।"

॥ তের ॥

এইভাবে আমি গোটা বিয়াল্লিশ নামের একটা তালিকা যোগাড় করলেম। এই তালিকাটার ভিড়ে সেবাস্তিয়ান (এস্. নাইট., ওক পার্ক গার্ডেন্‌স্, লণ্ডন, এস্ ডব্লিউ) বিচ্ছিন্ন একাকী—যেন হারিয়ে গেছেন। দেখলেম সমস্ত নামগুলোর সঙ্গে ঠিকানাগুলোও রয়েছে। দেখে অবাক্ হলেম এবং সুখীও হলেম। আমাকে অবাক্ হতে দেখে সিলবারম্যান ঠিকানা থাকার কারণটা ব্যাখ্যা করলেন—ব্লাউবের্গে এসে প্রায়ই লোক মারা যায়। একচল্লিশটা অপরিচিত লোকের মধ্যে সাঁইত্রিশজন সব প্রশ্নের বাইরে চলে গেছে (এই বেঁটে লোকটার ভাষায়)। এর মধ্যে তিনজনের রুশ নাম (এঁরা তিনজনই কুমারী)। তু'জন জাতে জর্মন, একজন আলসেস প্রদেশের। এঁরা প্রায়ই এই হোটেলে এসে থাকতেন। ভেরা রাজিন নামের একটি

মেয়ের সম্পর্কে কৌতূহল অমীমাংসিতই থেকে যেতো যদি না সিলবারম্যান জানতেন যে মেয়েটি ফরসা। সিলবারম্যান জানতেন মেয়েটি একটি নর্তকী ও স্ট্রাসবুর্গের একজন ব্যাঙ্ক মালিকের রক্ষিতা। এক পোলিশ দম্পতিও ছিল এই তালিকায়। এদিকে অবলীলাক্রমে বাদ দিলেম। বাকী যারা 'সংশয়ের বাইরে' থেকে গেল সেই একত্রিশজনের মধ্যে কুড়িজন পুরুষ। এর মধ্যে আটজন বিবাহিত কিংবা আটজন বিবাহিতা এদের সঙ্গেই এসেছিলেন (এঁদের নাম, এমা, হিলডেগার্ড, পলিন ইত্যাদি)। সিলবারম্যান হলপ নিয়ে বলতে পারতেন এরা সবাই বয়স্কা, ভদ্র ঘরের মহিলা, এবং নিঃসংশয়ে অ-রাশিয়ান।

বাদসাদ দিয়ে চারটে নাম থেকে গেল আমাদের হাতে। কুমারী লিদিয়া বোহেম্স্কি। প্যারিসে এঁর একটা ঠিকানা ছিল।

সেবাস্তিয়ানের থাকার সময় গোড়ার দিকে এখানে ন'দিন কাটিয়ে যান। ম্যানেজার এঁর সম্বন্ধে কিছুই মনে করতে পারলেন না। মাদাম দ্য রেচনোই। যেদিন সেবাস্তিয়ান প্যারিস ফিরে গেলেন তার ঠিক আগেই ইনিও হোটেল ছেড়ে প্যারিসে চলে গেছেন। ম্যানেজারের মনে ছিল। খুব সপ্রতিভ যুবতী, দরাজ হাতে বকশিশ দিতেন। আমি জানতেম যে, এক ধরনের রুশরা আভিজাত্য ফলাবার জন্যে নিজেদের নামে মাঝে এই 'দ্য' টা লাগিয়ে দিতেন, যদিও রুশ নামের মধ্যে এই ফরাসী টুক্রোটা শুধু যে বিসদৃশ তাই নয় ভাষার দিক থেকেও অসিদ্ধ। মেয়েটা হয়তো কোনো রঙ্গিনী। হয়তো কোনো স্নবের বউ। হেলেন গ্রীনস্টাইন। নামটা ইহুদী নাম। নামের শেষে 'স্টাইন' থাকা সত্ত্বেও নামটা জর্মন-ইহুদী নাম নয়। গ্র্যুনের 'উ' বর্ণটা বদলে 'গ্রিনের 'ই'-এ পরিণত হয়েছে। এতেই বোঝা যায় নামটার উৎপত্তি রুশ দেশে। সেবাস্তিয়ানের চলে যাওয়ার এক সপ্তাহ আগে ইনি এখানে এসে পৌঁছেন এবং পৌঁছে মাত্র দিনতিনেক ছিলেন এখানে। ম্যানেজার বললেন মেয়েটি দেখতে

শুনতে বেশ ছিলেন। এই হোটেলে আগেও একবার ছিলেন এবং স্থায়ীভাবে বার্লিনে বাস করতেন। হেলেনা ফন গ্রাউন। এটা আসল জর্মন নাম। কিন্তু ম্যানেজার জোর করে বললেন যে, এখানে থাকার সময় তাঁকে অনেকবার রুশ গান গাইতে শোনা গিয়েছিল। মিষ্টি-কোমল খাদের গলা। রূপে মনোহারিণী। সবশুদ্ধ মাসখানেক ছিলেন। সেবাস্তিয়ানের যাবার দিন পাঁচেক আগে প্যারিস চলে গেলেন।

এই চারটে ঠিকানা আর এই সব তথ্যগুলোকে আমি বাদসাদ না দিয়ে হুবহু টুকে রাখলেম। যাঁকে খুঁজছি তিনি এঁদেরই একজন। দুটো হাঁটু একত্র করে তার ওপর টুপি খুলে রেখে সিলবারম্যান বসে ছিলেন আমার সামনে। তাঁকে আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানালেম। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে নিজের ছোটো ছোটো পায়ে কালোর ওপর ছাই রঙের বুটি দেওয়া বুট জুতো জোড়ার দিকে তাকিয়ে রইলেন সিলবারম্যান। বিচিত্র উচ্চারণের অপটু ইংরেজীতে বললেন সিল-বারম্যান, "আমাকে আপনার ভালো লেগেছে বলে আপনার জন্যে আমি এটা করলেম, কিন্তু…" তিনি তাঁর বাদামী রঙের ঝক্‌ঝকে চোখে নরমগোছের এক ধরনের আবেদন ফুটিয়ে তুলে বললেন, "কিন্তু, কী হবে? আপনি তো চাঁদের উল্‌টো পিঠটা দেখতে পাচ্ছেন না। মেয়েটির খোঁজ করবেন না। যা চুকে গেছে তা চুকেই গেছে। আপনার দাদাকে তাঁর মনেই নাই।"

নিষ্ঠুর স্বরে বললেম, "না থাকুক, ঠিকই মনে করিয়ে দেবো।"

"যা ইচ্ছা, আপনার।" কোটের কাঁধটা ঠিক করে বোতাম লাগাতে লাগাতে বিড় বিড় করে কী বললেন। বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালেন।

"আচ্ছা, আসি তবে।" যাবার সময় মুখে তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাসিটা দেখতে পেলেম না।

"এই যে, একটু দাঁড়ান, আর একটা ব্যাপারের মীমাংসা করতে আছে। আমাকে কী দিতে হবে?"

"ঠিক বলেছেন" আবার বসে পড়লেন সিলবারম্যান। "এক মিনিট।"

ফাউনটেন পেনটার প্যাঁচটা খুললেন, টক্ টক্ করে কতকগুলো কী লিখলেন, তারপর কলমের ঢাকনাটা দিয়ে দাঁতে টোকা দিতে দিতে বললেন, "এই যে, ছিয়াশি ফ্রাঁ…"

"মাত্র ? আচ্ছা আপনি কি…?"

"না, না, ভুল হয়েছে…আমি ভুলে গিয়েছিলেম, নোটবইটা (উনি বললেন 'নোটশবইটা') আপনি কি রেখেছেন ?"

"অবশ্যই। আমি তো ব্যবহার করতে আরম্ভ করে দিয়েছি। আমি ভেবেছিলেম…"

"তাহলে ছিয়াশি হবে না।" মনে মনে হিসেবটা সংশোধন করলেন।

"মাত্র আঠারো। কারণ ওটার দামই পঞ্চাশ…সর্বমোট আঠারো ফ্রাঁ…রাহাখরচ…"

"কিন্তু", তাঁর এই ধরনের পাটিগণিতে বিভ্রান্ত হয়ে বলে গেলেম, "কিন্তু…"

"না, এবার ঠিক হয়েছে", বললেন সিলবারম্যান।

কাছে একটা কুড়ি ফ্রাঁ ছিল। উনি যদি নিতেন তো খুশী হয়ে আমি ওঁকে এর একশোগুণ দিতে পারতেম।

বললেন, "তা হলে আপনাকে…হ্যাঁ, আঠারো আর দু'য়ে কুড়ি…" হিসেবের তন্ময়তায় তাঁর কপাল কুঁচকে গেল, হ্যাঁ কুড়ি, এই নিন ফেরত।" পয়সাটা টেবিলে ফেলে রেখে চলে গেলেন।

ভেবে পাই না এই লেখা শেষ হলে তাঁর কাছে কেমন করে পাঠাবো। এই বিচিত্র ছোটো খাটো মানুষটি আমাকে তাঁর ঠিকানাটা দিয়ে যাননি। অন্যচিন্তায় মাথা ভর্তি ছিল বলে তাঁর কাছ থেকে ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিলেম। কোনোদিন এই বই "সেবাস্তিয়ানের প্রকৃত জীবনী" যদি তাঁর হাতে এসে

পড়ে, এই ভেবে তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলছি যেখানেই থাকুন না কেন তিনি জানুন আমি তাঁর সাহায্যের জন্য কতো কৃতজ্ঞ। এবং এই নোট বইটার জন্যেও।

ইতিমধ্যে নোটবইটা প্রায় ভরে গেছে, ভাবছি সম্পূর্ণ ভরে গেলে আরো পাতা এর সঙ্গে ক্লিপ্ দিয়ে জুড়ে দেবো।

মিঃ সিলবারম্যান চলে যাবার পরে, তিনি প্রায় যাদুমন্ত্র বলে যে চারটে ঠিকানা আমাকে যোগাড় করে দিয়েছিলেন, সেই ঠিকানা চারটে নিয়ে অনেকক্ষণ নাড়াচাড়া করে ঠিক করলেম বার্লিনের ঠিকানাটা দিয়েই শুরু করবো। এটা ব্যর্থ হলে প্যারিসের তিনটে ঠিকানা নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু করতে হবে। এর জন্য আর অবশ্য লম্বা পাড়ির দরকার হবে না। এখন লম্বা পাড়ি দিতে গেলে আগের চেয়ে অনেক বেশী পরিশ্রম হবে, কেন না সব সময় মনে মনে জানবো এটা আমার খোঁজার খেলায় শেষ তাস। অপর পক্ষে, যদি আমার প্রথম চেষ্টাটা…তাহলে…যাই হোক, ভাগ্য আমার প্রতি সুপ্রসন্ন বলতে হবে।

পশ্চিম বার্লিনের পাসাউয়ের স্ট্রীট ধরে এগিয়ে চলেছি একটা পুরোনো কুৎসিত বাড়ীর দিকে। বাড়ীটার সামনের মুখে ভারা বাঁধা রয়েছে, ঢাকা পড়ে গেছে এই মুখটা। তখন পাসাউয়ের স্ট্রীটে বরফ পড়ছে। ছাট্‌টা একদিকে। বেশ বড় বড় চাক্‌লায় পড়ছে। দারোয়ানের ঘরের কাচে আঙুল দিয়ে ঠক্ ঠক্ করে ধাক্কা দিলেম। সড়াৎ করে একটা মস্‌লিনের পর্দা সরে গেল, ছোট্ট একটা জানালা দুম্ করে খুলে গেল আর ম্লানমুখী মুটকী এক বুড়ী গাঁক গাঁক শব্দে জানিয়ে দিলে, "হ্যাঁ, ফ্রাউ হেলেন গ্রীনস্টাইন আছেন।" আমার শরীরে খুশীর একটা মৃদু শিহরণ খেলে গেল। উঠে গেলেম সিঁড়ি বেয়ে। দরজায় একখানা পিতলের প্লেটে ঘোষণা: গ্রীনস্টাইন। ফুলো ফুলো ফ্যাকাসে মুখ, কালো টাই পরা একটা ছেলে গোমড়া মুখে দরজা খুলে দিলে। আমার নামটাও জিজ্ঞাসা

করলে না, চুপচাপ ঘুরে বারান্দা দিয়ে চলে গেল। ছোট্ট হলঘরের র‍্যাকে একরাশ কোট ঝোলানো। টেবিলের ওপর উঁচু দরের টপহ্যাটের মাঝখানে একতোড়া চন্দ্রমল্লিকা—বরফজলে ভিজে। মনে হোলো অভ্যর্থনা করতে কেউই আসবে না। তাই ধাক্কা মেরে একটা দরজা খুলে ঢুকে সেটা ভেজিয়ে দিলেম। এক ঝলক দৃষ্টিতে দেখতে পেলেম একটা মেয়ে দিভানে পড়ে পড়ে অঘোরে ঘুমুচ্ছে, গায়ে ছাই রঙের একটা কোট। কালো চুল।

হলের মাঝখানে মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে রইলেম। নিজের মুখটা মুছলেম, বাইরে বরফে ভিজে গিয়েছিল। তখনো এই ভিজে ভাবটা ছিল। নাকটা ঝেড়ে নিলেম। তারপর বারান্দা ধরে এগিয়ে গিয়ে দেখলেম একটা দরজা ভেজানো রয়েছে। ভিতরে নিচু গলায় কথাবার্তা চলছে। রুশ ভাষায়। দুটো বড় ঘরে অনেক লোক—। দুটো ঘরের মাঝখানে দেওয়ালের বদলে একটা খিলেন। আপন মনে পা চালিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লেম। দু'একটা মুখ ঘুরল আমার দিকে, আসলে কেউ লক্ষ্য করল কি করল না বোঝা গেল না। আমার প্রবেশে কারো দিক থেকে কোনো কৌতূহলের লক্ষণ দেখলেম না। টেবিলের ওপর কয়েকটা গ্লাস। এঁটো গ্লাসে চায়ের তলানি পড়ে রয়েছে। আর, একখানা প্লেটে পড়ে রয়েছে খাবারের এঁটো। এক কোণে একটা লোক কাগজ পড়ছে। ছাই রঙের শাল গায়ে এক মহিলা টেবিলে বসে রয়েছেন, হাতের ওপর থুত্‌নির ভার রেখে, এই হাতের কব্জিতে একফোঁটা চোখের জল। দিভানের ওপর দুতিনজন লোক নিশ্চল হয়ে বসে। আগের ঘুমিয়ে-পড়া মেয়েটার মতো আর একটা ছোট্ট মেয়ে চেয়ারের ওপর গুটিয়ে বসে-থাকা একটা বুড়ো কুকুরের গায়ে হাত বুলোচ্ছে। পাশের ঘরে অনেক লোক, হয় বসে আছে, নয় পায়চারি করছে। এদের মধ্যে একজন, মনে হোলো, হঠাৎ যেন হাসতে আরম্ভ করেছে। হাসছে বা হাঁসফাঁস করছে বা ঐ ধরনের কিছু একটা করছে বোঝা গেল না।

হলঘরে প্রথম ঢুকে যে ছেলেটিকে দেখেছিলেম সে এক গ্লাস জল নিয়ে সামনে দিয়ে যাচ্ছে দেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলেম শ্রীমতী হেলেন গ্রীনস্টাইনের সঙ্গে দেখা হতে পারে কি?

ছেলেটা ডাক দিলে, "আণ্টি-হেলেনা।" যাঁকে উদ্দেশ করে ডাকলে তিনি আমাদের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। শ্যামা ও তন্বী। আর্মচেয়ারে ডুবে বসে-থাকা জনৈক বৃদ্ধের দিকে ঝুঁকে ছিলেন। ডাক শুনে আমার দিকে এগিয়ে এসে, বারান্দার দূর প্রান্তে ছোট্ট একখানা বৈঠকখানা বা বসার ঘরের দিকে আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন। বয়স খুবই কম। হাবভাবে মিষ্টি। ছোট্ট মুখখানা পাউডারে মাখা, টানাটানা চোখ দুটো যেন রঙে ঠেকেছে। গায়ে একটা কালো জাম্পার। হাত দুখানা ঘাড়ের মতোই নরম। ঢলঢলে আর সুডৌল।

আপন মনে ফিস্ ফিস্ করে রুশ ভাষায় বললেন, "কাক্ এতো উঝাস্না···(উঃ বাবাঃ)!" কেমন যেন বোকার মতো আমি বলে ফেললেম, "আমি হয়তো অসময়ে এসে হাজির হয়েছি।"

"না, তাতে কী হয়েছে?" বললেন "ভেবেছিলেম···"বলে আমার দিকে চেয়ে দেখলেন। "বসুন, মুখখানা দেখা-দেখা মনে হয়েছিল, ভেবেছিলেম এই বুঝি কবর দেওয়ার অনুষ্ঠান···। এখন দেখছি না, তা নয়। দেখুন, আমার জামাইবাবু মারা গেছেন, আর···না, না, উঠছেন কেন? বসুন! দিনটা কী ভাবে যে গেল!"

আমি বলি, "আমি আর আপনাকে বিব্রত করতে চাইনে···এখন বরং···চলি···আমার এক আত্মীয় প্রসঙ্গে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিলেম···মনে হয়েছিল তাকে আপনি জানতেন···ব্লাউবের্গে··· কিন্তু ওসব কথা এখন থাক।"

"ব্লাউবের্গ? ও, আমি যে ওখানে গিয়েছি দু'বার" বললেন উনি। হঠাৎ কোথায় টেলিফোন রিসিভারটা ঝন্ঝন্ করে উঠতে তাঁর মুখখানা মুহূর্তের জন্য মোচড় খেল। তাঁর থরথর-করে-কাঁপা

রঙ্‌চঙ্‌হীন নরম দুটো ঠোঁটের দিকে চেয়ে বলি, "তাঁর নাম ছিল সেবাস্তিয়ান নাইট।"

বললেন, "না, ও নাম আমি কখনো শুনিনি।" থেমে আবার বললেন "না"। বললেম, "আধা ইংরেজ; বই লিখতেন।"

মাথা নাড়লেন। দরজা খোলার শব্দ শুনে সেই দিকে তাকালেন। গোমড়া-মুখো ছেলেটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাঁরই বোনপো। "সোনিয়া আসছেন আধ ঘণ্টার মধ্যে।" শ্রোত্রী ঘাড় নাড়লেন। ছেলেটি চলে গেল।

কথার সূত্র ধরে বললেন, "সত্যি কথা বলতে কি, ওখানকার হোটেলের আমি কাউকে চিনতেম না।" আমি সসম্ভ্রমে হেঁট হয়ে আবার ক্ষমা চাইলেম।

"কিন্তু আপনার কি নাম?" দেখি, আমার দিকে তাঁর মেদুর কোমল দৃষ্টিকে সংহত করে জিজ্ঞাসা করছেন। মনে পড়ে গেল ক্লেয়ারেরও ঐ ধরনের চোখ ছিল। নামটা আবার বলতেই বললেন, "ও হ্যাঁ! ক্ষমা করবেন, নামটা আপনি আগেই বলেছেন, কিন্তু আজ আমার নামটা একেবারে গুলিয়ে গেছে। কিন্তু, নামটা কেমন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে। আচ্ছা ও নামের কোনো একজন সেণ্ট পিটার্স্‌বুর্গে এক ডুয়েলে মারা গেছেন না? ও, আপনার বাবা বুঝি! আচ্ছা, এই সেদিন কে যেন এই ঘটনাটার উল্লেখ করছিলেন···মজা দেখেছেন, স্মৃতিগুলো কেমন তালগোল পাকিয়ে জড়িয়ে আসে···হ্যাঁ, হ্যাঁ, রোজানভ্‌রা, ওঁরা আপনার পরিবারকে চিনতেন, আরো কতো কথা জট্‌ পাকিয়ে মনে আসছে···।"

"হ্যাঁ, রোজানড্‌ নামের একজন আমার দাদার সঙ্গে স্কুলে পড়তেন।" আমি বলি। অপর পক্ষ দ্রুত বলে চলেছেন, "টেলিফোন গাইডে ওদের পাবেন। আমি কিন্তু ওদের তেমন ভাল ভাবে চিনি না; আর এখন আমার যা অবস্থা তাতে আমার পক্ষে কোনো কিছু খুঁজে বের করাও সম্ভব নয়।" কে একজন এসে

ওঁকে ডেকে নিয়ে গেল, আর আমি একলা হলঘরের দিকে আনমনে পা চালিয়ে দিলেম। হলঘরে পৌঁছে দেখি, একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বিমর্ষভাবে আমার ওভার কোটের ওপর চেপে বসে সিগার টানছেন। আমি কী চাই তা তিনি প্রথমে বুঝে উঠতে পারলেন না, তারপর যখন বুঝলেন তখন নিজের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্যে উচ্ছ্বসিতভাবে মার্জনা ভিক্ষা করলেন।

যাই হোক, হেলেন গ্রীনস্‌টাইন যে সেই আসল 'তিনি' নন এটা জেনে আমি ক্ষুণ্ণ হলাম। অবশ্য সেবাস্তিয়ানকে জর্জরিত করার মতো স্ত্রীলোক তিনি হতে পারতেন না। এই ধরনের মেয়েরা মানুষের জীবনকে চূর্ণ করে না, এরা বরং গড়ে তোলে। এখানে দেখলেম ইনি একটা শোকবিমূঢ় পরিবারের দৈনন্দিন ব্যাপারকে ধীরস্থিরভাবে গুছিয়ে দিচ্ছেন এবং তারই ফাঁকে আমার মতো একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির উদ্ভট জিজ্ঞাসার প্রতি মনোযোগও দিতে পেরেছেন। তিনি যে শুধু মনোযোগ দিয়ে আমার কথা শুনেছেন তাই নয়, আমাকে একটা সূত্রও জুগিয়ে দিলেন। এই সূত্রটা ধরে সঙ্গে সঙ্গে আমি আমার সন্ধানে নামলেম। যদিও, যাদের সঙ্গে আমি দেখা করলেম তাদের সঙ্গে ব্লাউবের্গ ও আমার অনুসন্ধানের লক্ষ্যভূতা সেই অপরিচিতার কোনো যোগাযোগ ছিল না, তবু এই ভাবে আমি সেবাস্তিয়ানের জীবনের সবচেয়ে দামী একখানা পাতা সংগ্রহ করতে পারলেম। আমার চেয়ে গোছালো চিন্তার লেখক হলে এই পাতাটাকে এই বইয়ের গোড়াতেই গেঁথে দিতেন, কিন্তু আমার সন্ধান স্বয়ং এমন এক বিচিত্র নিজস্ব ধারা আর নিজস্ব আকর্ষণ শক্তি সঞ্চয় করেছে যে অনেক সময় আমি না ভেবে পারিনি যে, আমার সন্ধান (বাস্তবের কাঠামোকে কল্পনা বোনায় ব্যবহার করতে করতে) ধীরে ধীরে স্বপ্নপ্রক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আমি নিজেই স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছি যে, সেবাস্তিয়ানের জীবনচিত্র নির্মাণ করতে আমাকে ঠিক এই ভাবে স্বরের সঙ্গে স্বর

গেঁথে গেঁথেই এগোতে হবে। যেমন করে সুর তৈরি করতে হয়। সেবাস্তিয়ানের যৌবনোন্মেষকালের প্রথম প্রণয়ের ঘটনা জানতে গিয়ে এমন একটা পরিবেশে পড়লেম, যে পরিবেশে সেবাস্তিয়ানের জীবনের শেষ প্রণয়ের প্রতিধ্বনি উঠ্ছে তখনো। মনে হোলো কোনো এক অজ্ঞাত নিয়তি এই প্রথম সুরের সঙ্গে শেষ সুরটা মিলিয়ে দিয়েছে। তাঁর জীবনের হু'টো ধারা পরস্পরের কাছে জিজ্ঞাসার মতো, আর উভয়দিকের জিজ্ঞাসার মিলিত উত্তর তাঁর নিজের জীবনই। আর এ সেই উত্তর যা মানুষের যথার্থ সত্যের সবচেয়ে কাছাকাছি। পাদপ্রদীপের আলো নিভে আসে, পর্দা উঠে যায়; তাঁর বয়স ষোল এবং সেও ষোড়শী। দেখা যায় রুশ দেশের গ্রীষ্মের নৈসর্গিক পটভূমি। কোনো একটা নদীর বাঁক, নরম মাটির খাড়া পাড়, গাঢ় সবুজ এক সারি ফার গাছ, জলের ওপর তাদের ঘন কালো ছায়া বাড়িয়ে দিয়ে অন্য পাড়টাকে ছুঁয়ে রয়েছে। বাঁকের এপার ঢাকা পড়েছে ছায়ায়, ওপার তুলনায় নিচু, রৌদ্রে ঝলমল করছে, মধুর হয়ে উঠেছে, জলার ফুলে আর জলার ঘাসের রূপোলি ঝুঁটিতে ভরে গেছে। সেবাস্তিয়ানের চুল এতো ছোটো ছোটো করে ছাঁটা যে মাথা প্রায় ন্যাড়া। মাথায় টুপি নাই। যেই হেঁট হচ্ছে কিংবা পিছনে এলিয়ে পড়ছে অমনি তার গায়ের ওপর ঢলঢলে রেশমী জামাটা কাঁধের পিছনে খাড়া-হয়ে-ওঠা হাড়ের গায়ে লেপ্টে যাচ্ছে কিংবা লেপটে যাচ্ছে পাঁজরের ওপর। সেবাস্তিয়ান সোৎসাহে একটা চক্চকে সবুজ রঙ্-করা নৌকা বেয়ে চলেছে। মেয়েটি হাল ধরে বসে রয়েছে। ওর ওপর আমরা রঙ্ চড়াবো না। ওর ছবি একটা সীমারেখাই হয়ে থাক। একটা সাদা ফাঁকা জায়গার মতো থেকে যাক, যেখানে শিল্পী এখনো রঙ্ চড়ায়নি। গাঢ় নীল রঙের ফড়িংগুলো মন্থর গতিতে লাফিয়ে লাফিয়ে এখান ওখান ভেসে বেড়াচ্ছে, কখনো বা বসে পড়ছে শালুকের চওড়া পাতার ওপর। খাড়া পাড়ের শক্ত লাল মাটির ওপর খোদাই করা রয়েছে, নাম,

তারিখ, এমন কি মানুষের মুখের প্রতিকৃতিও। রৌদ্রে সেবাস্তিয়ানের সাদা ধব্‌ধবে দাঁত ঝক্ ঝক্ করছে। যেই ঘেমে পিছন ফিরে তাকাচ্ছে অমনি নৌকোটা নলখাগড়ার বনে পিছলে চলে যাচ্ছে রেশমী কাপড়ের পাটখোলার মত খস্‌খস্ শব্দ করে। বলেন সেবাস্তিয়ান, "তুমি হাল ধরতে জানো না মোটেই।"

দৃশ্যান্তর। সেবাস্তিয়ান বেঞ্চের উপর বসে একখানা কালো বাঁধাই করা কপিবুক খুলে উচ্চৈঃস্বরে কী একটা ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করছেন।

পাশের মেয়েটিকে কবিতা আবৃত্তি করে শুনিয়ে চলেছেন। চিত্রকর চিত্রপটে এখনো শূন্য সাদা স্থানটা পূরণ করেননি। শুধু রোদে-পোড়া একখানা লিক্‌লিকে হাত এঁকেছেন—কব্জি থেকে কনুই পর্যন্ত টানা তুলির আঁচড়ে। এই হাতখানার বাইরের দিকের ত্বকের ওপর সূক্ষ্ম রোমের রেখা ঝিক্‌মিক্ করছে।

আবার দৃশ্য বদলায়—যেন বায়রনের স্বপ্নের রাত্রি। তারায় তারায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে আকাশ। এর অনেক বছর পরে সেবাস্তিয়ান লিখেছিলেন যে, তারার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে যেমন এক ধরনের গা-ঘুলিয়ে-ওঠা অনুভূতি হোতো, কোনো পশুর কাটা পেট থেকে বেরিয়ে-পড়া নাড়িভুঁড়ি দেখে যেমন অনুভূতি জাগে এ সেই ধরনের অনুভূতি। কিন্তু যে সময়কার কথা বলছি তখন সেবাস্তিয়ানের এই ধরনের চিন্তার কোনো প্রকাশ ছিল না। ঘন অন্ধকার। কিছুই স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, জায়গাটা সম্ভবতঃ পার্কের একটা গলি। অন্ধকারের ভারী ভারী চাঙড় যেন চাপাচাপি করে জমে রয়েছে। কোথায় একটা পেঁচা ডেকে ওঠে। ঘন কালো অন্ধকারের একটা গহ্বর থেকে সহসা একটা ছোট্ট সবুজ বৃত্ত ভেসে উঠেছে। একটা হাতঘড়ির ডায়াল জ্বল্ জ্বল্ করছে (পরিণত বয়সে সেবাস্তিয়ান ঘড়ির প্রতি বীতরাগ হয়ে গিয়েছিলেন)।

কেউ জিজ্ঞাসা করে, "তোমাকে কি যেতেই হবে?"

শেষ দৃশ্য। একদল বলাকা দেশান্তরী হচ্ছে, তাদের দুটো সারি এক জায়গায় যেন বর্শা ফলকের মুখে এসে মিলেছে। হলুদ হলুদ বাদামী রঙের বার্চবীথির ওপর যে নীলকান্তনীল আকাশ সেই আকাশে ঐ বলাকার কণ্ঠনিঃসৃত কলধ্বনি মিলিয়ে যাচ্ছে। সেবাস্তিয়ান এখনো একা নয়। ছাইছাই সাদা রঙের একটা কাটা গুঁড়ির ওপর বসে রয়েছে। তার সাইকেলটা কাছাকাছি দাঁড়-করানো। কাঁটা ঝোপের মধ্যে এর স্পোকগুলো ঝক্‌ঝক্ করছে। একটা বড় প্রজাপতি, নাম ভানেসা বা ক্যাম্বারওয়েল বিউটি ভেলভেটের মতো ডানা নেড়ে নেড়ে গুঁড়ির একটা কাটা জায়গায় বসে পড়ল। আগামী কাল শহরে ফিরতে হবে, সোমবার তো স্কুল খুলছে!

"এই কি তবে শেষ? কেন বলছ আসছে শীতে আর আমাদের দেখা হবে না?" দু'বার তিনবার জিজ্ঞাসা করেন সেবাস্তিয়ান।

উত্তর মেলে না। "তাহলে একি সত্যি যে, তুমি ঐ ছাত্র ছোঁড়াটার সঙ্গে প্রেমে পড়েছ?" বালিকা বসে আছে, তার আকারটা অস্পষ্ট, শুধু একখানা বাহু আর একটা শীর্ণ বাদামী রঙের হাত চোখে পড়ছে, ঐ হাতে সে সাইকেলের পাম্পটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে। নরম মাটির ওপর পাম্পের হোল্‌ডারটা দিয়ে ইংরেজীতে লেখে 'হ্যাঁ'। ধীরে ধীরে লেখে, যেন ধীরে ধীরে লিখলেই এই কথাটার ক্রূরতাটা কমে আসবে। এমনি ভাব।

ঝুপ করে রঙ্গমঞ্চের পর্দা পড়ে গেল। হ্যাঁ, মাত্র এইটুকুই। খুব ছোট্ট পালা, কিন্তু তা বুক ভেঙ্গে দেওয়া। এরপর যে বালকটি স্কুলের ডেস্‌কে রোজ ঠিক তাঁর পাশেই বস্‌তো, তাকে তিনি আর কোনোদিন জিজ্ঞাসা করতে পারবেন না, "তোর বোন কেমন আছে রে?"

॥ চোদ্দ ॥

পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন যে, যতদূর সম্ভব আমি নিজের আমিটাকে এই বইয়ের আওতার বাইরে রাখার চেষ্টা করেছি। আমি চেষ্টা করেছি আমার নিজের জীবনের কোনো প্রসঙ্গের উল্লেখ না করতে (যদিও মাঝে মাঝে দু-একটা ইংগিত আমার গবেষণার পটভূমিকে কিছুটা পরিষ্কার করে থাকতে পারে)। প্যারিসে পৌঁছে আমি কিছু বৈষয়িক অসুবিধায় পড়লেম, কিন্তু কাহিনীর এই অংশে সেই প্রসঙ্গ সম্বন্ধে কিছু বলা থেকে বিরত রইলেম।

প্যারিসকে আমার স্থায়ী বাসস্থান বলতে পারি। এই ব্যবসায়িক অসুবিধাগুলোর সঙ্গে অবশ্য আমার অনুসন্ধানের কোনো সম্পর্ক নাই, তাই যদিইবা প্রসঙ্গতঃ তাদের উল্লেখ করে থাকি তো তা করেছি এটাই জোর দিয়ে বোঝাতে যে, সেবাস্তিয়ানের শেষ প্রণয় পাত্রীকে খুঁজে বের করার ব্যাপারে আমি এতোই তন্ময় ছিলেম যে, দীর্ঘদিনের অনুপস্থিতিজনিত ব্যক্তিগত অসুবিধাগুলোকে আমি স্বেচ্ছায় সানন্দে উপেক্ষা করেছি।

বার্লিনে প্রাপ্ত সূত্র ধরে যে কাজ আরম্ভ করেছিলেম তার জন্যে আমার কোনো অনুশোচনা নাই। এই সন্ধানের ফলে অন্ততঃ সেবাস্তিয়ানের অতীতের অন্য একটা পরিচ্ছেদের অভাবিত পূর্ণ একটা হদিশ পেয়েছি। ফলে একটা নাম আমার ফর্দ থেকে মুছে গেল। আর, আমার হাতে পড়ে রইল আরও তিনটে সম্ভাব্য নামের সূত্র। প্যারিসের টেলিফোন-ডাইরেক্টরি থেকে উদ্ধার করলেম গ্রাউন (ফন) হেলেন ও রেচনয় পল (মাঝে দু-টা নাই দেখলেম) এই দুটো নামের ঠিকানা। এই ঠিকানাদুটো আমার হাতের ঠিকানাগুলোর সঙ্গে মিলে গেল। সন্ধানপাত্রীর স্বামীর সঙ্গে দেখা করা অস্বস্তিকর

হলেও অপরিহার্য ছিল। তৃতীয় মহিলা লিডিয়া বোহেম্স্কি সম্পর্কে দুটো ডাইরেক্টরিই অবহেলায় দেখলেম। এদের একটা টেলিফোন ডাইরেক্টরি আর একটা রাস্তার নাম ধরে ধরে সাজানো নাগরিকদের লিস্ট। যাই হোক আমার হাতে যে ঠিকানা রয়েছে তাই দিয়েই আমি এর হদিশ করতে পারবো। প্যারিসকে আমি ভালই চিনি। তাই সম্ভব হলে সাক্ষাৎকারগুলোকে একদিনেই সেরে ফেলার জন্য এমন ভাবে সেগুলোকে পরপর সাজিয়ে নিলেম যাতে সময়ের অপচয় সব চেয়ে কম হয়। পাঠকেরা আমার কাজের এই স্থূল ব্যবস্থা দেখে অবাক হতে পারেন ভেবে, বলতে হচ্ছে যে, যেমন চিঠিলেখার প্রতি তেমনি টেলিফোন করার প্রতিও আমার সমান বিতৃষ্ণা।

দরজায় কড়া নাড়তেই মাথায় ঝাঁকড়া চুল, রোগা, লম্বা একটা লোক এসে দরজা খুলে দিলে। গায়ে তাড়াতাড়ি একটা সার্ট গলানো, কলার খুলে নেওয়া সার্টটার গলায় একটা পিতলের বুটি। হাতে দাবা খেলার একটা ঘুঁটি। একটা কালো রঙের মন্ত্রী। ভদ্রলোককে রুশ ভাষায় সম্ভাষণ করলাম।

উনি খুশী হয়ে বললেন, "আসুন, আসুন!" যেন আমার অপেক্ষাতেই ছিলেন।

বলি, "আমার নাম অমুক!"

"আর, আমার", উত্তর আসে, "আমার নাম, পাহ্‌ল পাহলিচ বেচনোই।" বলে হো হো করে হাসলেন যেন এটা হাসির কথা। "অনুগ্রহ করে···" হাতে ঘুঁটিটা বাড়িয়ে দিয়ে একটা খোলা দরজার দিকে ইশারা করলেন। সঙ্গে করে একটা সাদাসিধে ঘরের মধ্যে নিয়ে গেলেন। ঘরের এককোণে একটা সেলাইকল। ঘরের বাতাসে চুল-বাঁধা ফিতে আর গায়ের ভিতরের—জামার এক ধরনের মৃদুগন্ধ। একজন মোটাসোটা লোক তেড়ছা হয়ে একটা টেবিল ঘেঁষে বসে রয়েছেন—টেবিলের ওপর অয়েলক্লথ পাতা, তার ওপর একটা দাবার ছক। ঘুঁটিগুলো আকারে ছকটার তুলনায় বেশ বড়। ভদ্রলোক

একদিকে আড়চোখে ঘুঁটিগুলোকে চেয়ে দেখছেন, আর মুখের এক-কোণে টিপে-ধরা ফাঁকা সিগারেট হোল্‌ডারটা উল্‌টো দিকে উঁচিয়ে রয়েছে। একটি চারপাঁচ বছরের ফুট্‌ফুটে সুন্দর ছেলে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে রয়েছে, তার চারদিকে ছোট ছোট খেলনার মোটরগাড়ী। পাহল পাহলিচ মন্ত্রীকে টেবিলে ছুঁড়ে দিতে তার মাথাটা খসে এলো। কালো ঘুঁটির খেলোয়াড় সযত্নে মন্ত্রীর মাথাটা পেঁচিয়ে আটকালেন। পাহল পাহলিচ বললেন, "বস্থন, ইনি আমার জ্ঞাতিভাই।" কালো ঘুঁটির খেলোয়াড় মাথা হেঁট করেই নীরবে সম্ভাষণ জানালেন। আমি তৃতীয় ও শেষ চেয়ারটিতে বসে পড়লেম। ছেলেটি আমার দিকে এগিয়ে এল, এবং নিঃশব্দে একটা নীললাল পেন্‌সিল দেখালে আমাকে।

কালো ঘুঁটির খেলোয়াড় গম্ভীর স্বরে বললে, "ইচ্ছা করলে তোমার নৌকোটা আমি কাটতে পারতাম, কিন্তু এর চেয়েও ভালো একটা চাল ভাবছি।" তিনি রানীকে তুলে নিয়ে তাকে সন্তর্পণে পুরোনো হলুদ রঙের ঘুঁটির ভিড়ে গুঁজে রাখলেন। এই ঘুঁটিগুলোর মধ্যে একটা আঙুলের টোপ ছিল।

পাহল পাহলিচ বিদ্যুৎগতিতে ছোঁ মেরে রানীর সঙ্গে মন্ত্রীকে তুলে নিয়ে অট্টহাসিতে ভেঙে পড়লেন। সাদা ঘুঁটির খেলোয়াড় শান্ত হয়ে এলে কালো ঘুঁটির খেলোয়াড় বললেন, "এবার তুমি কাদায় পড়েছো দাদা, পারো তো ঠেকাও দেখি ধন!" দুজনে যখন দাবার চাল নিয়ে ব্যস্ত এবং সাদার খেলোয়াড় চালটা ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করছেন তখন আমি ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখলাম। তেলরঙের এক-খানা ছবি চোখে পড়ল। পুরোনো দিনের কোনো রাজকীয় পরিবারের হবে বোধহয়। আর, চোখে পড়ল একটা ছারপোকারঙের বড় বিছানা। খাটের স্প্রিংগুলো ফেঁপে উঠেছে। তিনজনের শোয়ার মতো—স্বামী স্ত্রী ও বাচ্চার। মুহূর্তের জন্য আমার এখানে উদ্দেশ্যটা উদ্ভট পাগলামি বলে মনে হোলো। ছোট্ট ছেলেটা দেখি আমার জন্যে একটা মোটর গাড়ী আঁকছিল। পাহল পাহলিচ বললেন, "কী

করতে পারি বলুন।” (দেখলেম তিনি বাজী হেরে গেছেন, আর কালো ঘুঁটির খেলোয়াড় সমস্ত ঘুঁটিগুলোকে একটা পুরোনো কার্ড-বোর্ডের বাক্‌সে পুরে ফেলছেন, আঙুলের সেই টোপটা ছাড়া)।

খুব হিসেব করে বক্তব্যটা মনে মনে তৈরি করে রেখেছিলেম, আগে থেকেই। বললেম, “আমি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাই। ওঁর সঙ্গে কয়েকজনের বন্ধুত্ব ছিল…আমার কয়েকজন বন্ধুর…” (সেবাস্তিয়ানের নামটা হুট্ করে উল্লেখ করাটা সমীচীন মনে করিনি)।

পাহল পাহলিচ বললেন, “তাহলে আপনাকে একটু অপেক্ষা করতে হবে। উনি বেরিয়ে গেছেন, এই কিছুক্ষণের মধ্যে ফিরে এলেন বলে! ততক্ষণ ছোট্ট এক ঢোক কনিয়াক হয়ে যাক্।”

বাচ্চাটা যখন বুঝলে তার আঁকা ছবিতে আমি যথেষ্ট মনোযোগ দিয়ে ফেলছি তখন সে টলমল করতে করতে তার কাকার কাছে চলে গেলো। কাকা তাকে কোলে তুলে নিয়ে অবিশ্বাস্য ক্ষিপ্রতার সঙ্গে খুব পাকা হাতে একটা মোটর গাড়ী আঁকতে আরম্ভ করলেন। কিছু তো বলতে হবে, তাই বললেম, “আপনি দেখছি শিল্পী!”

পাহল পাহলিচ ছোট্ট রান্নাঘরটাতে গেলাস সাফ করতে করতে হেসে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, “দেখছেন কি, ও একেবারে সর্ববিদ্যা-বিশারদ। ও মাটিতে মাথা রেখে ময়ূর হয়েও বেহালা বাজাতে পারে, তিন সেকেণ্ডের মধ্যে একটা টেলিফোন নম্বরের সঙ্গে আর একটা গুণ করতে পারে, আর নিজের নামের অক্ষরগুলোকে উল্‌টে টানা হাতে নাম সই করতে পারে।”

কোলে বসে বাচ্চাটা তার লিক্‌লিকে নোংরা ছোট্ট পা’দুটো দুলিয়ে বললে, “তাক্‌সিও চালাতে পারে।”

পাহল পাহলিচ গ্লাসগুলো টেবিলে রাখতে কালো ঘুঁটির কাকু বললেন, “আমি কিছু খাচ্ছি না। বরং ছেলেটাকে একটু বেড়িয়ে নিয়ে আসি। ওর জিনিসগুলো কোথায়?” বাচ্চাটার কোটটা

পাওয়া গেল, কালো ঘুঁটির কাকু ওকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। পাহল পাহলিচ মদ ঢেলে বললেন, "গ্লাসগুলো এমনি বলে কিছু মনে করবেন না। রাশিয়াতে আমি বড় লোক ছিলেম। বছর দশেক আগে বেলজিয়ামেও বেশ পয়সা কড়ি করেছিলেম। তারপর সব চলে গেল। যাক্। আপনার উদ্দেশে,..." বলে মদে চুমুক দিলেন। কথা আরম্ভ করার উদ্দেশ্যে জিজ্ঞাসা করি, "আপনার গৃহিণী কি সেলাই ফোঁড় করেন?" তৃপ্তির হাসি হেসে বললেন, "ও হ্যাঁ, পোশাক তৈরির কাজ নিয়েছেন। আর আমি? আমি কম্পোজিটর; সবে বেকার হয়ে গেছি। উনি এলেন বলে! আমি জানতেম না ওঁর জর্মন বন্ধুবান্ধব আছেন!"

বললেম, "যতোদূর জানি, জর্মনীতেই ওদের সঙ্গে এঁর আলাপ হয়, আলশেসেও হতে পারে।" শ্রোতা এতক্ষণ মন দিয়ে তাঁর খালি গ্লাসে মদ ঢালতে ব্যস্ত ছিলেন; আমার কথা শুনে হঠাৎ থেমে আমার মুখের দিকে হাঁ করে চেয়ে রইলেন।

বিস্ময়ের স্বরে বললেন, "কোথাও একটা ভুল করেছেন আপনি। আপনি নিশ্চয় আমার প্রথমা স্ত্রীর কথা বলছেন। বারবারা মিত্রোফান্না প্যারিসের বাইরে কোনোদিন পা দেননি। রাশিয়ায় অবশ্য গেছেন—উনি মার্সাই হয়ে এখানে এসেছেন সেবাস্তোপল থেকে।" গ্লাসটা এক চুমুকে শূন্য করে হাসতে শুরু করলেন।

আমাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে বললেন, "বেশ, বেশ, আচ্ছা আপনার সঙ্গে কী আমার এর আগে দেখা হয়েছে? আমার প্রথম পক্ষকে আপনি কি ব্যক্তিগতভাবে চিনতেন?"

আমি মাথা নাড়লেম।

হঠাৎ বলে বসলেন, "তাহলে আপনার বরাত ভাল। জোর বরাত। আপনার জর্মন বন্ধুরা আপনাকে উলুবনে সাঁতার দিতে পাঠিয়েছে; আপনি কোনোদিন তাঁকে খুঁজে পাবেন না।"

"কেন?" ক্রমশঃ আমার আগ্রহ বাড়তে থাকে।

"কারণ, খুব তাড়াতাড়িই আমাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। সে আজ অনেক বছর আগেকার কথা। সম্পূর্ণ নিখোঁজ হয়ে যায়। কেউ বলে তাঁকে রোমে দেখেছে, কেউ বলে সুইডেনে। আমি অবশ্য তাও বিশ্বাস করি না। এখানেই থাক আর নরকেই থাক, আমার তাতে কিছু আসে যায় না।"

"তাঁকে খুঁজে বের করার কোনো উপায় বাত্‌লে দিতে পারেন?"

"কিছু না।"

"আপনাদের উভয়ের জানা-চেনা কেউ?"

"তারা তো ওর জানা-চেনা, আমার হতে যাবে কেন?" শিউরে উঠে জবাব দিলেন।

"তার কোনো ফটো বা ঐ রকম গোছের কিছু কি আছে আপনার কাছে?"

উত্তর আসে, "আপনি কি চাইছেন বলুন তো? ওর পিছনে কি পুলিস লেগেছে? হতেও পারে। এও শুনলে আশ্চর্য হবো না। ও যে আসলে একটা আন্তর্জাতিক গুপ্তচরী—তা ধরা পড়েছে। মাতাহারির নাম শুনেছেন তো? ও ঐ মাতাহারির টাইপ। একেবারে ঐ টাইপ…কিন্তু ওর মতো একটা মেয়ে আপনার জীবনের ছকে এসে গেলে তাকে ভোলা দুষ্কর। ও আমাকে শুষে ছিবড়ে করে ফেলেছিল—বহুদিক দিয়ে। টাকার দিক থেকে বলুন, মনের দিক থেকে বলুন। আমি ওকে খুন করতে পারতেম যদি আনাতোল না…"

জিজ্ঞাসা করি, "কে আনাতোল?"

"আনাতোল? আনাতোল ঐ মুদ্দফরাসটা। এখানে ও গিলোটিন চালায়।"

আমি জিজ্ঞাসা করি—"ও সব কথা যাক্, উনি কি ১৯২৯-এর জুন মাসে ব্রাউবের্গে ছিলেন?"

"ঠিকই ধরেছেন। স্বামীস্ত্রী হিসেবে ছাড়াছাড়ির ঠিক আগেই। আমরা তখন প্যারিসে থাকি। এর সামান্য কিছুদিন পরেই আমাদের

ছাড়াছাড়ি। লিয়ঁর একটা কারখানায় আমি বছরখানেক কাজও করেছিলেম। এবার আমি ভেঙে পড়লেম। বুঝলেন তো!"

"আপনি কি জানেন যে উনি ব্লাউবের্গে কারুর সঙ্গে?"

"না, আমি তা জানি না। দেখুন, আমার মনে হয় না আমাকে ঠকাতে ও চরম পর্যন্ত গিয়েছিল: অন্তত আমি এই রকমই ভাবতে চেষ্টা করেছিলেম: সব সময় অনেক লেখক ওকে ঘিরে থাকতো, আমার অনুমান তারা ওকে চুমু খেলেও ওর এসে যেতো না; কিন্তু এ সব ব্যাপার নিয়ে ভাবতে বসলে আমার মাথা গোলমাল হয়ে যেতো। মনে পড়ে একবার..."

বাধা দিয়ে বললেম, "বেয়াদপি মাপ করবেন, আপনি কি নিশ্চিত যে আপনি কোনোদিন ওঁর মুখে কোনো ইংরেজ বন্ধুর কথা শোনেননি?"

"ইংরেজ? এই না বললেন, জর্মন? না শুনিনি। আমেরিকান একজন ছিল মনে পড়ে; যতবার নিন্‌কা তার সঙ্গে নাচতো ততবারই সে ঘোরে অবশ হয়ে যেতো; কয়েকজন ইংরেজ থাকলেও থাকতে পারতো। তবে কি জানেন ওর স্তাবকেরা কে কোন্ জাতের তা নিয়ে আমার কোনো কালে মাথাব্যথা ছিল না।"

"ওর নামটা ঠিক কী ছিল বলুন তো!"

"নাম? আমার সঙ্গে যখন তার পরিচয় হোলো তখন তার নাম ছিল 'নিনা তুরোভেৎস'—কিন্তু আপনি..." ইতস্ততঃ করে বললেন, "না, তাকে আপনি খুঁজে পাবেন না। সত্য কথা বলতে, অনেক সময় নিজেই ভেবে বসি ও বোধহয় কোনোদিন রক্তমাংসে বর্তমান ছিল না। ও একটা দুঃস্বপ্ন, কোনো বাজে ফিল্ম দেখে আসার পর দেখা দুঃস্বপ্ন। একি, আপনি কি চলে যাচ্ছেন? ও, এই এল বলে..." আমার দিকে চেয়ে তিনি হাসলেন (মনে হয় তরলপদার্থের মাত্রাটা ওঁর পক্ষে একটু বেশীই হয়ে থাকবে)।

আমায় বললেন, "দেখলেন, ভুলেই গেছি, যে আপনি আমার

বর্তমান স্ত্রীর খোঁজ করছেন না। হ্যাঁ, একটা কথা! আমি বিদেশী কিন্তু আমার কাগজপত্র ঠিক আছে। আমার কাজের ছাড়পত্রখানা দরকার হলে আপনাকে দেখাতে পারি। আর, আপনি যদি তাকে খুঁজে পান তো বলবেন যে, ও জেলে যাবার আগে আমি ওকে শুধু একটিবার দেখতে চাই। নাঃ···না দেখাই ভালো! কী বলেন?" আমরা পরস্পরের সঙ্গে যেন মাত্রাতিরিক্ত ভদ্রতায় বারবার হ্যাণ্ডশেক করলেম: প্রথমে ঘরে, তারপর বারান্দায়, তারপর দরজার মুখে। তিনবারই বললেম, "আপনার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়ে আমি কৃতার্থ।"

নিচে নেমে আসার সময় দেখি, কালো ঘুঁটির কাকাবাবু আর সেই শিশুটি একসঙ্গে ধীরে ধীরে উঠে আসছে। কাকাবাবু বলতে বলতে আসছিলেন, "অনেক কাল আগে এক যে ছিল মোটরের রেসখেলোয়াড়, তার ছিল একটা কাঠবিড়ালি···একদিন···"

॥ পনর ॥

প্রথমেই আমার মনে হোলো আমি যা খুঁজছিলেম তা যেন পেয়ে গেছি। অর্থাৎ সেবাস্তিয়ানের মিস্‌ট্রেস্‌ কে ছিলেন তা জানতে পেরেছি। কিন্তু নিমেষেই আমার বিশ্বাসে চিড় ধরে গেল। তিনি কি ঐ বক্‌বক্‌-চন্দ্রের বউ হতে পারেন? ট্যাক্‌সিতে চেপে পরবর্তী ঠিকানায় যেতে যেতে ভাবছিলেম। আন্দাজের এই সূত্রটা ধরে এগোনো কি ঠিক হবে? পাহল পাহলিচ যে ছবিটা আঁকলেন সেই ছবিটা খুবই একটা মামুলী ছবি। নয় কি? এই ছবিটা একটা খেয়ালী, উচ্ছৃঙ্খল মেয়ে মানুষের ছবি। এই ধরনের মেয়েরা নির্বোধ পুরুষের জীবনকে তছ্‌নছ্‌ করে দেয়। কিন্তু, সেবাস্তিয়ান কি নির্বোধ ছিলেন? ভাবতে গিয়ে মনে পড়ল মামুলী ভালো আর মামুলী মন্দ উভয়ের প্রতিই তাঁর সমান বিতৃষ্ণা ছিল। বিতৃষ্ণা ছিল তাঁর মামুলী সুখ আর মামুলী দুঃখের প্রতিও। এই ধরনের মেয়ে তাঁকে নিশ্চয়ই প্রথম

থেকেই পীড়িত করতো। শুরুতেই এই ধরনের মেয়েতে তাঁর অরুচি জন্মাতো। আর, সত্যিসত্যিই যদি কোনোদিন বোমণ্ট হোটেলে সেবাস্তিয়ানের মতো চুপচাপ স্বভাবের, একলসেঁড়ে, অন্যমনস্ক ইংরেজের সঙ্গে এই মেয়ের পরিচয় ঘটত তাহলে, অবাক্ হয়ে ভাবি, সেই পরিচয়ের ক্ষণে ঐ মেয়ে কী ধরনের কথাবার্তা বলতো তাঁর সঙ্গে ? এটা নিশ্চিত যে, নিজের মতামত জাহির করতে ও মুখ খুলতে না খুলতেই সেবাস্তিয়ান তাকে এড়িয়ে যেতেন। আমি জানি, তিনি বলতেন ; উচ্ছৃঙ্খল মেয়েদের জড় মন। বলতেন যে, সুন্দরী মেয়ে শুধু মজার পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছে এর চেয়ে বিসদৃশ দৃশ্য আর কিছু হতে পারে না। আরো কঠিন করে বলা যায় যে, সেরা সুন্দরীর গা চুঁয়ে চুঁয়ে যখন ন্যাকামির ননী গলে গলে ঝরতে থাকে তখন যদি তার দিকে একটু খুঁটিয়ে নজর দাও তো দেখতে পাবে তার রূপে কোথাও না কোথাও একটা খুঁত রয়ে গেছে। এই খুঁতটাই তার চিন্তার যে খুঁত তারই সংকেত। পাপের আপেলে এক কামড় দিতে হয়তো তাঁর দ্বিধা হোতো না, কারণ, এই পাপ প্রকাশ করার ভাষার প্রশ্নটা না উঠলে শুধু তার ধারনা নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না। আপেলে কামড় দিতে আপত্তি না থাকলেও এই আপেলের রসকে ঘন করে বোতলে পোরা, পেটেণ্ট করা দেখলে তিনি আপত্তি করতেন। ছেনাল মেয়েমানুষকেও তিনি ক্ষমা করতে পারতেন কিন্তু একটা জাল হেঁয়ালিকে সহ্য করতে পারতেন না।

এই সবই ভাবছিলেম। তাই আমি যখন শহরের ফ্যাশান-দোরস্ত অঞ্চলে একটা বড়সড় বাড়ীর মধ্যে ঢুকলেম, তখন আমার পায়ে পায়ে আগ্রহের তাড়াটা ছিল। পরিচারিকা বললে মাদাম বাড়ীতে নাই। বলে, আমার চোখেমুখে হতাশার চিহ্ন দেখেই বোধ হয়, আমাকে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে ভিতরে চলে গেল। ফিরে এসে জানালে ইচ্ছা থাকলে মাদাম ফন গ্রাউনের বান্ধবী মাদাম লেসের্ফ-এর সঙ্গে আলাপ করতে পারি।

মাদাম লেসের্ফ বেরিয়ে এলে দেখলেম, ছোটোখাটো তরুণী, পাত্‌লা শরীর, ফ্যাকাসে মুখ, চক্‌চকে কালো চুল। মনে হোলো, সব জায়গায় সমান ফ্যাকাসে এমন গায়ের চামড়া আমি এর আগে আর কোনোদিন দেখিনি। কালো পোশাক কাঁধ ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে গলা ঘিরে রয়েছে। হাতে একটা লম্বা, কালো সিগারেট হোলডার। বললেন, "আমার বান্ধবীর সঙ্গে দেখা করতে চান, বুঝি?" তাঁর কাচের মতো স্বচ্ছ ফরাসী উচ্চারণে খানদানি য়ুরোপের তরিবৎ। নিজের পরিচয় দিলেম।

বললেন, "আপনার কার্ডখানা দেখলেম। আপনি রাশিয়ান বুঝি?"

খুলে বলি, "আমি এসেছি—কী বলব?—এমন একটা ব্যাপারে এখানে এসেছি যেটা প্রকাশ করতে কুণ্ঠা আসছে। আচ্ছা, আমি যদি ঠিক করে নিই যে, মাদাম গ্রাউনও আমার দেশের লোক তাহলে কি আমার ভুল হবে?"

মৃদু জলতরঙ্গের বাজনার মতো কণ্ঠস্বরে উনি ফরাসীতে বললেনঃ "আজ্ঞে হ্যাঁ, নির্ভেজাল রুশ বলতে যা বোঝেন তিনি পুরো তাই। ওঁর স্বামী ছিলেন জর্মন, কিন্তু তিনিও রুশ ভাষায় কথা বলতেন।"

উত্তর দিই, "ও, 'বলতেন'? অর্থাৎ অতীতে। এটাই শুনতে সবচেয়ে ভাল লাগল।"

মাদাম লেসের্ফ বললেন, "আমার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে পারেন। ব্যাপার যতোই লাজুক, চাপাচুপির হবে ততই তা হবে আমার মনের মতো।"

বলতে লাগলেম, "লেখক সেবাস্তিয়ান নাইট, যিনি এই মাস দু'য়েক আগে মারা গেছেন, আমার আত্মীয়। আমি তাঁর একটা জীবনী লেখার চেষ্টা করছি। ওঁর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিলেন। উনি যখন ১৯২৯-এ ব্লাউবের্গে ছিলেন তখন ওঁর সঙ্গে এই বান্ধবীর পরিচয়। আমি এঁরই সন্ধানে বেরিয়েছি। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই।"

উনি বিস্মিত কণ্ঠস্বরে বলে উঠ্‌লেন, "বাঃ, মজার ব্যাপার তো রহস্যময় ঠেকছে! আচ্ছা, ওঁর অর্থাৎ আমার বান্ধবীর কাছ থেকে আপনি কী শুনতে চান?"

"উনি নিজের খুশিতে যা বলবেন তাই!"

"তবে কি আমি বুঝব?···তবে কি, আপনি বলছেন, উনিই তিনি?"

"খুব সম্ভব···যদিও ঐ নামটা কোনো দিন ওঁর কাছ থেকে শুনেছি বলে মনে পড়ে না। কী নাম যেন?"

"সেবাস্তিয়ান নাইট"

"না শুনিনি। তবু খুবই সম্ভব। উনি যেখানেই থাকেন সেখানেই বন্ধু জুটিয়ে নেন। নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, এ ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে আপনার নিজেরই কথা বলা উচিত। দেখবেন, ভারী চমৎকার মেয়ে!" আমার দিকে সহাস্যে চেয়ে বললেন, "বাঃ, বেশ অদ্ভুত গল্প তো! কিন্তু ওঁকে নিয়ে বইই বা লিখবেন কেন; আর, কী করেই বা মেয়েটির নাম জানলেন?"

ভেঙে বললেম, "সেবাস্তিয়ান একটু চাপা স্বভাবেরই ছিলেন। ঐ মহিলার যে চিঠিগুলো তিনি রেখেছিলেন···না, রাখতে চাননি···চেয়েছিলেন মৃত্যুর পর ও-গুলোকে যেন নষ্ট করে ফেলা হয়!"

খুশীতে উজ্জ্বল হয়ে মহিলা বলে উঠলেন, "ঠিক, ঠিক। আমি ওঁর মনের ভাব বুঝতে পারি। প্রেমপত্র পুড়িয়ে ফেলাই উচিত। অতীতের মতো ভালো জ্বালানি আর কিছুই নাই। তা যাক্, এখন চা খাবেন এক কাপ?"

বলি, "না। যদি জানতে পারতেম মাদাম গ্রাউনের সঙ্গে কখন দেখা হতে পারে।"

"শীগ্‌গির।" উত্তর দিলেন মাদাম লেসের্ফ।

"তিনি ঠিক এই সময়েই প্যারিসে নাই। কিন্তু, আপনি তো

আগামী কাল আসতে পারেন। মনে হয় আগামী কাল এলে তাঁর দেখা পাবেন। উনি আজকের রাত্রেও ফিরে আসতে পারেন।"

আমি বলি, "আচ্ছা, ওঁর সম্বন্ধে আরো কিছু বলতে অনুরোধ করলে আপনি কি কিছু মনে করবেন?"

উত্তর দেন মাদাম লেসের্ফ, "সে আর কি! ও আর এমন কী কঠিন কাজ!" বললেন, "উনি খুব ভালো গাইতে পারেন, 'ৎসিগান গান' ৎসিগান জানেন নিশ্চয়! জিপ্‌সীদের গান। তার ওপর, অসাধারণ, অসাধারণ সুন্দরী।" মুহূর্ত থেমে চোস্ত ফরাসীতে বললেন, "মানুষের কামনাকে উনি খুঁচিয়ে বের করে আনেন।" বলে চললেন, "আমি ওঁকে ভীষণ পছন্দ করি, যখনই প্যারিসে থাকি তখনই এই ফ্ল্যাটের একখানা ঘর নিয়ে নিই। দাঁড়ান, আমি ওঁর ছবি দেখাচ্ছি।"

ড্রয়িং রুমের পুরু কার্পেট পাতা মেঝের ওপর দিয়ে ধীরপদে নিঃশব্দে পিয়ানোর দিকে এগিয়ে গেলেন আর পিয়ানোর ওপর থেকে বড় ফ্রেমে বাঁধাইকরা একখানা ফটো তুলে নিয়ে এলেন। দর্শকদের দিকে পরাঙ্মুখ অপরূপ মুখখানির দিকে মুহূর্তের জন্য অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেম। মনে হোলো, গালের বঙ্কিম সীমা-রেখাটা আর ছায়া ছায়া ভ্রূর তীরের মতো ঊর্ধ্বগতি যেন বিশিষ্ট ভাবে রুশীয়। চোখের নিচেকার পাতার উপর একটা ঝলমলে ভাব, পরিস্ফুট অধরোষ্ঠেও তাই। মনে হোলো ওঁর ভাবটার মধ্যে স্বপ্নালুতা আর চাতুর্য যেন আশ্চর্যভাবে মিশে রয়েছে।

আপন মনে বলে উঠ্‌লেম: "হ্যাঁ....হ্যাঁ...."

"বলছেন ইনিই তিনি!" মাদাম লিসের্ফের কণ্ঠস্বরে কৌতূহল।

উত্তর দিই, "হতে পারে। ওঁর সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ আমার বাড়ল।"

মাদাম লেসের্ফ মুখে একটা চতুর চক্রান্তের ভাব এনে বললেন, "আমি নিজেই বের করার চেষ্টা করবো। কারণ কী জানেন?

আমার মনে হয় গোটা একটা মানুষ নিয়ে বই লেখা আর তাকে কুচি কুচি করে সাজিয়ে নিজের খুশিমতো হাজির করা এদুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার। বই লেখার মধ্যে অনেক বেশী সততা থাকা চাই।"

ওঁকে ধন্যবাদ দিলেম। ধন্যবাদ দিয়ে ফরাসীতে 'পুনদর্শনায়' বলে বিদায় নিলেম। ওঁর হাতখানা এতো ছোট্ট যে চোখে পড়বেই। হয়তো অসাবধানে হাতখানায় একটু বেশী চাপ দিয়ে ফেলেছিলেম। উনি চমকে উঠলেন। চেয়ে দেখি ওঁর হাতের মাঝের আঙুলে ধারালো কাণাওলা বেশ বড় একটা আংটি। আমার হাতেও একটু লেগেছিল। উনি বললেন, "আগামীকাল ঠিক এই সময়? কেমন?" বলে একটু আলতো হাসলেন। বেশ শান্ত ছাঁদের মিষ্টি মানুষ। আসলে এখন পর্যন্ত আমি কিছুই জানলেম না। তবু মনে হোলো, এ-যাত্রা আমার নিষ্ফল হয়নি। যা বাকী রইল তা লিডিয়া বোহেম্‌স্‌কি সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া। এঁর ঠিকানায় হাজির হতে কঁসিয়ের্জ বা গৃহরক্ষী বললেন ভদ্রমহিলা কয়েকমাস আগেই এখানকার বাস তুলে দিয়েছেন। তাঁর ধারণা এখন তিনি রাস্তার উল্‌টো দিকে একটা ছোটো হোটেলে থাকেন। সেখানে জিজ্ঞাসা করে জানলেম সপ্তাহ তিনেক পূর্বে তিনি এই হোটেল ছেড়ে শহরের অপরপ্রান্তে বাসা নিয়েছেন। যিনি আমাকে এইসব খবরাখবর দিলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেম, "উনি কি রাশিয়ান?" উত্তরে বললেন "হ্যাঁ"।

উল্‌টো বলে আসল খবর বের করার শার্লক হোম্‌স্‌ মার্কা কায়দায় জিজ্ঞাসা করলেম, "সুশ্রী চেহারার একটু চাপা রঙের মহিলা?" ও যেন আমাকে অপদস্থ করার জন্যই সোজা উত্তর দিলে: "ঠিকই বলেছেন" (উত্তর আশা করেছিলেম, "আজ্ঞে না, কুশ্রী কিন্তু ফর্সা")। আধ ঘণ্টাটাক পরে 'সাঁতে' জেলখানা থেকে সামান্য কিছু দূরে একটা বিবর্ণ বাড়ীতে প্রবেশ করলেম। ঘণ্টায় নাড়া দিতে একজন বয়স্কা মোটাসোটা মেয়ে লোক এসে সামনে দাঁড়াল। উজ্জ্বল

কমলালেবু রঙের চুলে ঢেউ তোলা, থুত্নির রঙ্ একটু বেগুনি ঢঙের আর, রঙ্-করা ঠোঁটের উপর পাতলা হলেও কালো রোমের একটা রেখা। জিজ্ঞাসা করি, "মাদমোয়াজেল (অর্থাৎ কুমারী) লিডিয়া বোহেম্স্কির সঙ্গে কথা বলতে পারি ?"

রুশ একসেণ্ট সহ বীভৎস ফরাসীতে বললেন, "সে মোয়া—আমিই তিনি !" নিজের প্রায় অজ্ঞাতসারে বিড় বিড় করে বললেম, "যাই, তাহলে জিনিসপত্রগুলো নিয়ে আসি।" বলেই প্রায় ছুটে বাড়ীটা থেকে পালিয়ে এলেম। কখনো কখনো আমার মনে হয় ও বুঝি এখনো সেই দরজায় দাঁড়িয়ে রয়েছে।

পরের দিন মাদাম ফন গ্রাউনের ফ্ল্যাটে হাজির হতে পরিচারিকা আমাকে অন্য একটা ঘরে নিয়ে গেল—ঘরটা এক ধরনের 'বুদোয়া' বা মেয়েদের খাসকামরা। সুন্দর করে সাজাবার প্রয়াসটা লক্ষণীয়। আগের দিন লক্ষ্য করেছিলেম ফ্ল্যাটটা বেশ গরম। আবহাওয়া স্যাঁতসেঁতে থাকলেও বাইরে তেমন ঠাণ্ডা নাই। তাই ভিতরে তাপ সরবরাহের আড়ম্বর যেন একটু বাড়াবাড়ি বলে মনে হয়েছিল। অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করতে হোলো। তাকের উপর কয়েকখানা পুরোনো-পুরোনো-দেখতে ফরাসী উপন্যাস। বেশীর ভাগই পুরস্কার-পাওয়া বই, এর মধ্যে ডঃ আক্সেল মুন্থের বই 'সাঁ মিসেল'। বইখানা দেখে মনে হয় এটা বহুবার পড়া হয়েছে। একটা জম্কালো ফুলদানিতে একতোড়া বেগুনি লাল 'কার্নেশন' ফুল। এদিক ওদিক আরো কয়েকটা ঠুন্কো ধরনের টুকিটাকি—সম্ভবতঃ রুচিসম্মত, হয়তো বেশ দামীও ; কিন্তু সেবাস্তিয়ানের মতোই কাচ ও চীনামাটির জিনিস সম্পর্কে আমারও কেমন বিতৃষ্ণা আছে। আর, এসব ছাড়াও ঝক্ঝকে পালিশ-করা আসবাব ঢঙের একটা জিনিস। মনে মনে ঠাহর করলেম এর ভেতরে সেই ভয়ংকরের চেয়েও ভয়ংকর জিনিস, যার নাম রেডিও সেট। তবু সব মিলিয়ে মনে হোলো হেলেন ফন গ্রাউনের রুচি ও কৃষ্টি আছে।

অবশেষে দরজা খুলল। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ঢুকলেন আগের দিনের সেই ভদ্রমহিলা। শুধু 'ঢুকলেন' বললে ভুল হবে, তিনি কেমন্ত খেতে খেতে ঢুকলেন। কখনো ঘাড় বাঁকিয়ে, কখনো মাথা হেঁট করে কাকে উদ্দেশ করে কী সব বলতে বলতে ঢুকছিলেন। এই 'কেউটা' দেখি একটা ব্যাঙমুখো, কালো বুলডগ। ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ্ করতে করতে জবুথবুর মতো ঢুকছিল। দেখে বোঝা গেল ঢুকতে ওর একান্তই অনিচ্ছা।

উনি আমার দিকে তাঁর ছোট্ট হাতখানা বাড়িয়ে দিলেন—"নীলকান্তর দিকে একটু নজর রাখবেন।" নীল রঙের সোফার ওপর বসলেন, বসে কুঁদো সেই বুল ডগটাকে টেনে তুলে নিলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, "ওঠ্ বুড়ো ওঠ্"।

"হেলেনের বিহনে এটা এমনি করছে।" ওটাকে কুশনে সযত্নে বসিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন,

"দেখুন তো কাণ্ড, আমি ভেবেছিলেম উনি আজ সকালেই ফিরবেন। ওমা, হঠাৎ 'দিজ' থেকে ফোন করে বসলেন। বললেন, শনিবারের আগে নয়—(আজ সবে মঙ্গলবার)।" বলে বললেন, "আমার কাজে আমি বড় লজ্জিত। আপনাকে খবর দিতে পারিনি—ঠিকানা তো জানা নাই। হতাশ হয়ে পড়লেন নাকি?" কোলে একটা ভেলভেটের কুশনে স্থচোলো কনুই দুটো রেখে, দুহাতের মুঠোর ওপর থুত্নিটা বসিয়ে আমার দিকে চেয়ে বললেন,

"বলি, তা, আপনি মাদাম ব্রাউন সম্পর্কে যদি আরো কিছু বলেন তো আমি নৈরাশ্যটা কাটিয়ে উঠতে পারি।"

কেন জানি না, জায়গাটার আবহাওয়ায় কিছু একটা ছিল, যার প্রভাবে আমার কথায় আর ব্যবহারে আপনা থেকেই কৃত্রিমতা এসে পড়ল। স্থচোলো নখওলা একটা আঙুল উঁচিয়ে উনি বললেন, "তা যদি বলেন তো, আরো একটু আছে, আপনাকে অবাক করে দেওয়ার মতো। কিন্তু, আগে একটু চা হোক, কী বলেন?"

বুঝলেম এবার আর চা পর্বের প্রহসনটা এড়াতে পারবো না। উনি বসার সঙ্গে সঙ্গে দেখি পরিচারিকা ঝকৃঝকে চায়ের সরঞ্জামসুদ্ধ একটা পায়ে-চাকা-বসানো টেবিল ঠেলে ঘরের মধ্যে এনে ফেলেছে। "এই যে জীন, এখানে! থাক্ ঠিক্ আছে!"

আমার দিকে চেয়ে মাদাম লেসের্ফ বললেন, "এবার যতটা সম্ভব খুলে বলুন, দেখি। (ফরাসীতে বললেন) 'চায়ে চুমুক দিতে দিতে যতটা বলা যায় তার সবটাই বলুন আর কি!' মনে হচ্ছে, চায়ে একটু ক্রীম চাই, না? অবশ্য যদি ইংলণ্ডে কাটিয়ে এসে থাকেন! আমার কিন্তু আপনাকে দেখে ইংরেজ ইংরেজ মনে হচ্ছে।"

বললেম, "আমি চাই আমাকে দেখে রুশ মনে হোক্।"

"আপসোসের কথা, এক হেলেন ছাড়া আর কোনো রুশকে আমি চিনি না। এই বিস্কুটগুলো দেখতে কেমন অদ্ভুত, তাই না?"

জিজ্ঞাসা করি, "আমাকে যে অবাক্ করে দেবেন বললেন?"

মানুষের দিকে ওঁর চেয়ে থাকার ধরনাটা অদ্ভুত। সোজা চোখে চোখে চেয়ে থাকেন না, চেয়ে থাকেন সামনের লোকের মুখের নিচের দিকটায়—যেন তার থুত্‌নিতে কোথাও এক ফোঁটা এঁটো বা অমনি কিছু লেগে আছে আর সেটা মোছা হয়নি। ফরাসী স্ত্রীলোকদের তুলনায় ওঁর গড়নটা খুব হাল্‌কা। মনে হোলো স্বচ্ছ ত্বকে আর কালো চুলে চোখভোলানো। বললেন, "তবে শুনুন, ও যখন টেলিফোন করলে তখন আমি ওকে কিছু জিজ্ঞেস করেছিলেম, আর……" চুপ করে থেকে আমার ধৈর্যহীনতাকে যেন তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করছেন। আমিই জুগিয়ে দিই, "আর, উনি বললেন, উনি কোনোদিনই ঐ নামটা শোনেননি!"

"হোলো, না! উনি শুধু হাসলেন, আর ঐ হাসির মানে আমার জানা!" যতদূর মনে আছে আমি উঠে দাঁড়ালেম। দাঁড়িয়ে উঠে এদিক ওদিক পায়চারী করতে লাগলেম। শেষে বললেম, "আচ্ছা, এটা কি একটা হাসির ব্যাপার হোলো? উনি কি জানেন

না যে, সেবাস্তিয়ান আর নেই?" কালো ভেলভেটের মতো নরম নরম চোখ দুটো বুজে এল মাদাম লেসের্ফের। বুঝলেম এ এক নীরব 'হ্যাঁ'। পরমুহূর্তেই উনি আবার আমার থুত্‌নির দিকে চেয়ে দেখলেন।

আমি বলি, "আপনি কি ওঁকে ইদানীংকালে দেখেছেন? অর্থাৎ গত জানুয়ারিতে যখন খবরের কাগজে সেবাস্তিয়ানের মৃত্যু সংবাদ বেরোয় তখনকার কাছাকাছি কোনো সময়ে আপনি কি ওঁকে দেখেছিলেন? আচ্ছা, ওঁর কি কোনো কষ্টই হয়নি?"

"কিছু মনে করবেন না ভাই, আপনি অদ্ভুত সরল। যেমন অনেক ধরনের প্রেম আছে তেমন অনেক ধরনের লোকও আছে। ধরে নেওয়া গেল আপনি যাঁকে খুঁজছেন তিনিই হেলেন। কিন্তু কেনই বা ধরে নেবো যে, আপনার লোকটি মারা গেলে উনি ভেঙে পড়বেন? কেনই বা ধরে নেবো যে, তাঁকে উনি এতই ভালবাসতেন? কিংবা এমনো হতে পারে যে, উনি তাঁকে সত্যিই ভালবাসতেন কিন্তু মৃত্যু সম্বন্ধে ওঁর ধারণাটাই এমন যে, ওঁর শোক প্রকাশের ভঙ্গীতে হিস্‌টেরিয়ার কোনো ছাপ নেই? আপনি ওঁর কী জানেন? এটা ওঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমার ধারণা উনি নিজেই আপনাকে এ সম্বন্ধে বলবেন কিন্তু তা শোনার আগে আপনার এ ধরনের ইঙ্গিতটা কি শোভন?"

উদ্‌বিগ্ন হয়ে বলি, "না, না, ইঙ্গিত করবো কেন? আমার কথায় যদি কোনো অশোভন ইঙ্গিত থেকে থাকে তো আমায় মাপ করবেন। যাক্, এবার বলুন ওঁর কথা। আপনি ওঁকে কতদিন ধরে জানেন?"

"তা যদি বলেন তো, বলবো গত কয়েক বছর ওর সঙ্গে আমার খুব কমই দেখা হয়েছে, অবশ্য এই বছরটা ছাড়া—জানেন তো ও খুব ঘোরে—আমরা দুজনে এই প্যারিসেই একই স্কুলে পড়েছি। আমি যতদূর জানি ওঁর বাবা ছিলেন একজন রুশ চিত্রশিল্পী। ঐ হাঁদাটাকে যখন ও বিয়ে করে তখন ও একেবারে বাচ্চা!"

"কে হাঁদা ?" জিজ্ঞাসা করি।

"কেন ? ওর স্বামীটা। সব স্বামীই হাঁদা, কিন্তু ওরটার যেন কোনো তুলনা নাই (বললেন ফরাসীতে)। বিয়েটা ভাগ্যিস বেশী দিন টেকেনি। এই যে···আমার একটা নিন।" বলে তাঁর লাইটারটাও এগিয়ে দিলেন। বুলডগটা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে গোঁ গোঁ করে উঠল। উনি সরে সোফায় পা তুলে গুটিয়ে স্থটিয়ে বসলেন, আমায় বসার জায়গা করে দিতে। নিজের গোড়ালিতে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, "মেয়েদের সম্বন্ধে আপনার তেমন অভিজ্ঞতা নাই, তাই না ?"

উত্তর দিই, "আমার লক্ষ্য মাত্র একজনই।"

উনি বলেই চললেন, "আপনার বয়স কত হবে ? আঠাশ ? ঠিক বলেছি, না ? ভুল ! ও তাহলে আপনি দেখছি আমার চেয়ে বড়। যাক্‌গে। হ্যাঁ, কী যেন বলছিলেম ?..আমি ওর সম্বন্ধে একটু আধটু জানি—কিছু ও নিজেই বলেছে, কিছু আমি নিজেই এখান ওখান থেকে সংগ্রহ করেছি। যে একমাত্র মানুষকে ও ভালবেসেছিল তিনি ছিলেন বিবাহিত। এ ব্যাপারটা ঘটে তার নিজের বিয়ের আগে। ভেবে দেখুন, তখন সে বয়সে নিতান্তই বালিকা ; একেবারেই ছেলেমানুষ। তারপর ওকে আর তাঁর ভালো লাগল না, বা অমনি কিছু একটা ঘটল। এরপর কয়েকবারই সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছে, কিন্তু সে সব ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। (ফরাসীতে বললেন)—'উঁ ফুর দ্য ফাম, নি রেস্যুসিৎ জামে···মেয়ে মানুষের মন, একবার ভাঙলে আর জোড়া লাগে না।'···এরপর আর একটা কাহিনী, এটা সে আমাকে পুরো বলেছে—এর ফলটাও তেমন ভালো নয়।"

বলে হাসলেন। ছোট্ট পাণ্ডুর মুখখানার তুলনায় দাঁতগুলো দেখি আকারে বেশ বড়।

আমাকে খোঁচা দিয়ে বললেন, "দেখে মনে হচ্ছে, আমার বান্ধবী যেন আপনারই হৃদয়েশ্বরী ছিল। হ্যাঁ, দেখুন, জিজ্ঞাসা করতে

পারি কি, আপনি কেমন করে এই ঠিকানায় হাজির হলেন ? অর্থাৎ আপনি কোন্ সূত্রে হেলেনের খোঁজ পেলেন ?”

ব্লাউবের্গ থেকে সংগ্রহ করা চারটে ঠিকানার কথা আমি তাঁকে বললেম। নামগুলোও।

বিস্মিত স্বরে বললেন, “অপূর্ব। এই না হলে উৎসাহ! আপনি কি বার্লিনও ধাওয়া করেছিলেন ? ইহুদী মহিলা বললেন, না ? চমৎকার! আচ্ছা, অন্য আর সবাইকে খুঁজে পেয়েছেন ?”

“আমি একজনকে দেখেছি, এই পর্যন্ত।”

“কাকে ?” এক দমক কৌতুকের হাসির ফাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, “কাকে ? ঐ রেচনোই মহিলাকে ?”

“না, তাঁর স্বামী আবার বিয়ে করেছেন ও তিনি উবে গেছেন।”

মাদাম লেসের্ফ চোখ মুছতে মুছতে আবার একটা তরল হাসির দমকে ভেঙে পড়ে বললেন, “চমৎকার! চমৎকার! মনে মনে দেখছি, আপনি হুড়মুড় করে ঢুকে পড়েছেন, ঢুকেই দেখেন একজোড়া স্বামীস্ত্রী, ওরা আপনার ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানে না। উঃ, এমন ব্যাপার আমি কখ্খনো শুনিনি। আচ্ছা, ওর বৌ কি আপনাকে সিঁড়ি দিয়ে ঠেলে ফেলে দিয়েছিল, বা ঐ রকম অন্য কিছু ?”

আমি ঈষৎ বিরক্তি ভরে বললেম, “থাক ওসব আলোচনা।” এই মেয়েটার মাত্রাতিরিক্ত কৌতুক আমাকে উত্যক্ত করে তুলেছে। দাম্পত্য ব্যাপার সম্বন্ধে মেয়েটার এক ধরনের ফরাসীসুলভ রসবোধ ছিল এ কথা মানি। অন্যসময়ে হলে এই রসবোধের আমি তারিফ করতেম হয়তো, কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে আমার মনে হোলো যে আমার অনুসন্ধানকে তিনি চটুল অশালীন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখায় সেবাস্তিয়ানের স্মৃতি যেন খেলো হয়ে গেল। আমার এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে যেতে হঠাৎ আমার মনে হোলো, বোধহয় এই গোটা ব্যাপারটাই অশালীন; মনে হোলো, একটা ছায়াকে ধরবার চেষ্টা করে চলেছি এবং এই চেষ্টার ফলে সেবাস্তিয়ানের শেষ প্রণয়ের যে ধারণাটা আমার

মনে মনে গড়ে উঠেছিল সেই ধারণাটা পর্যন্ত বুঝি ভেসে চলে যায়। সেবাস্তিয়ানের জন্যে যে সন্ধান শুরু করেছি সেই সন্ধানের এমনি একটা উদ্ভট দিকও যে আছে তা জানতে পারলে সেবাস্তিয়ান নিজেও হয়তো কৌতুক অনুভব করতেন।

জীবনীর যিনি আসল নায়ক তিনি হয়তো এই ঘটনার মধ্যে তাঁর নিজের স্বভাবসিদ্ধ শ্লেষের আর একটা পরিচয় দেখতে পেতেন; আর এতেই দিশাহারা জীবনীকারের প্রচেষ্টা সফল হয়ে উঠবে।

তাঁর বরফ-হিম হাতখানা আমার হাতে রেখে, ভ্রূর নিচে থেকে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "অতোটা স্পর্শকাতর হলে কী চলে?" তাড়াতাড়ি উঠে কোণের সেই মেহগনি দ্রব্যটার দিকে এগিয়ে গেলেন। দেখি হেঁট হয়ে কী করছেন। তাঁর বালিকার মতো পিঠখানা আমার নজরে পড়ল। অনুমান করলেম তিনি কী করতে যাচ্ছেন। প্রায় চেঁচিয়ে উঠে বললেম, "'দোহাই আপনার, ওটা থাক্।"

"থাক্? আমি তো ভেবেছিলেম হালকা কোনো সুরে আপনার আরাম হবে আর কথাবার্তার মেজাজও তৈরি হবে। থাকবে? আচ্ছা থাক্।"

বুলডগটা একবার গা ঝাড়া দিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। কিছুটা তোয়াজ আর কিছুটা অভিমানের সুরে বললেন, "ঠিক আছে।" মনে করিয়ে দিলেম, "আপনি আমাকে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন!" আমার পাশে বসে, একখানা পা মুড়ে উপরে তুলে, স্কার্টের কিনারটা টানতে টানতে বললেন, "হ্যাঁ, বলছিলেম যে, আমি জানি না কে সেই ভদ্রলোক, কিন্তু যতটুকু জেনেছি তাতে মনে হয়েছে ওঁর মতো মানুষকে সামলানোই দায় ছিল। ও বলে ও পছন্দ করতো তাঁর মুখ চোখের ভাব, তাঁর হাতের গড়ন, আর তাঁর কথা বলার ভঙ্গী। তাঁর মতো মানুষ শয্যায় ওর সঙ্গে কেমন ব্যবহার করবে তা জানার কৌতূহলটাও তার ছিল। এর কারণও ছিল। তাঁর চেহারায়

একটা চোখা চোখা ভাব ছিল, আর, কিছু মনে করবেন না, এই ধরনের রুচিবান, বুদ্ধিমান ও আপন দূরত্বে মগ্ন মানুষ যখন একটা চারপেয়ে জন্তুতে পরিণত হয়ে লেজ নাড়তে থাকে তখন সে এক মজার দৃশ্য! কিন্তু কী হোলো আপনার?"

চেঁচিয়ে বললেম, "এসব কী বলছেন আপনি? এসব আবার কোথায় ঘটেছিল? কখন?"

ফরাসী ভাষায় উনি যা জবাব দিলেন তার মর্ম, "কী করে বলবো বলুন, আমি তো আমার বান্ধবীর ক্যালেণ্ডার নই! আপনি জানেন না? বান্ধবীকে নাম তারিখ জিজ্ঞাসা করা আমার ধাতে নাই। আর যদিও সে বলে থাকে তো মনে নাই। আমি যা জানি তাই আপনাকে বলছি। আপনি যা জানলে খুশি হবেন তাতো আর বলতে বসিনি! আর, তিনি নিশ্চয়ই আপনার কোনো নিকট আত্মীয় নন, চেহারায় তো মিল দেখি না—অবশ্য বান্ধবীর মুখে তাঁর যে চেহারার বিবরণ শুনেছি আর আপনাকে এই যা দেখছি তার থেকেই কথাটা বললেম। আপনি একটু হুজুগে হলেও নিতান্তই সুবোধ বালক, আর তিনি, বলতে কি, সুবোধ তো ছিলেনই না, বরং যখন বুঝতে পারলেন তিনি হেলেনের সঙ্গে প্রেমে পড়েছেন তখন রীতিমতো দুঃশীল হয়ে উঠলেন। বান্ধবী আশা করেছিলেন উনি বোধহয় কোলকুকুরের মতো গদগদ হয়ে উঠবেন কিন্তু তিনি তা হলেন না। তিনি বদ মেজাজে সোজা ওকে সস্তা দেমাকী মেয়ে-মানুষ বলে বসলেন, আর ও যে পর্সিলেনের তৈরী পুতুল নয় তা প্রমাণ করবার জন্যে চুমু খেলেন। না, ও কিন্তু পর্সিলেনের পুতুল ছিল না। নিমেষেই তিনি বুঝে ফেললেন ওকে ছাড়া তিনি বাঁচতে পারবেন না। ও নিজেও সঙ্গে সঙ্গে বুঝে ফেললে যে, ওর অরুচি ধরে গেছে ওঁর কথায়—আর সে কী কথা! শুধু নিজের স্বপ্নের কথা, স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন তার ভিতরে স্বপ্ন······এই সবের কথা। আমি কিন্তু দু'জন কারুরই দোষ দিচ্ছি না। হয়তো দু'জনেই

ঠিক, কিংবা কেউই ঠিক নয়—কিন্তু, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, উনি আমার বন্ধুকে যতটা সাধারণ মেয়েমানুষ বলে ঠাউরে ছিলেন ও ততটা সাধারণ ছিল না। ও নিজেও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ধরনের ছিল, আর, তা ছাড়া, জীবনমৃত্যু লোকচরিত্র সম্বন্ধে ও যতোটা জানে বলে ওঁর মনে হয়েছিল আসলে তার চেয়ে এ সবের একটু বেশীই ও জানতো। দেখুন, উনি সেই এক ধরনের মানুষ যাঁরা ভাবেন সব আধুনিক বইই বটতলার বই, সব আধুনিক তরুণতরুণীই বুদ্ধু। এমনি ভাবেন তার কারণ নিজেদের নিজস্ব অনুভূতি আর ধারণা নিয়ে এঁরা এতো মত্ত ও ব্যস্ত যে, অন্যদের বোঝার অবসর নাই এঁদের। ও বলে, তাঁর রুচি আর খেয়ালের কোনো হদিস পাওয়া ভার ছিল, আর ধর্ম নিয়ে উনি যে সব কথা বলতেন তা শুনলে যে কোনো লোক ভয়ে শিউরে উঠবে। আমার বান্ধবী ছিল (ও এখনো তেমনি) খুব হাসিখুশি স্বভাবের মেয়ে, খুব প্রাণময়ী। কিন্তু যখনই তিনি ওর সামনে হাজির হতেন, ওমনি ওর মনে হোতো ও যেন বুড়ী হয়ে পড়েছে, টকে যাচ্ছে। তাছাড়া, তিনি ওর সঙ্গে বেশীক্ষণ কাটাতেন না, দুম করে আসতেন, দুম করে গদির ওপর বসে পড়তেন, বসে ছড়ির মাথায় কাঠে কাটা গোলাপটার ওপর দুহাত রেখে ওর দিকে গুম্ হয়ে চেয়ে থাকতেন। তাঁর হাতে অবশ্য গ্লাভ্‌স দুটো রয়েই যেতো। অল্পদিন পরে ও অন্য এক জনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়ল। এই লোকটা ওকে পুজো করতো বলা চলে। আর, যাঁকে আপনি ভুল করে নিজের ভাই বলে অনুমান করছেন (দয়া করে কপাল কোঁচকাবেন না অমন করে) সেই ভদ্রলোকের তুলনায়—এই লোকটা ওকে অনেক বেশী মন, অনেক বেশী মন, অনেক বেশী ভাবনা উৎসর্গ করেছিলেন—আমার বান্ধবীকে। কিন্তু দু'জনের কারো প্রতি ওর আগ্রহ ছিল না। এঁরা দুজনে কিন্তু দেখা হলেই পরস্পরের প্রতি ভদ্রতায় যেন গলে যেতেন। আর, ও বলেছে, তাই দেখে ওর চীৎকার করে উঠতে ইচ্ছা করতো। ও ঘুরে

বেড়াতে ভালবাসতো, কিন্তু ও যেই কোনো সত্যি সত্যি মনোরম জায়গায়—হাজির হতো সমস্ত উৎপাত থেকে নিজেকে আড়াল করতে, ওমনি উনি এসে হাজির হয়ে চোখের সামনের দৃশ্যটাকে আগলে দাঁড়াতেন, কিংবা ওর সঙ্গে টেবিলে বসেই ওর সমালোচনা শুরু করে দিতেন : ও দেমাকী, ও সস্তা। আবার, সেই এক নিঃশ্বাসেই বলে যেতেন যে, ওকে ছাড়া তিনি বাঁচতে পারবেন না। কিংবা ওর বন্ধুবান্ধবদের সামনেই লম্বা বক্তৃতা ঝাড়তে লাগলেন—পরিহাস-উচ্ছল তরুণ-তরুণীদের সামনে—লম্বা ধোঁয়াটে একটা বক্তৃতা। আর সেই বক্তৃতা হয় ছাইদান নিয়ে কিংবা সময়ের :রঙ্ নিয়ে। ফলে সবাই উঠে যেতো আর তিনি বসে থাকতেন একা! বসে বসে বোকার মতো হাসতেন কিংবা নিজেই নিজের নাড়ী দেখতেন। উনি যদি সত্যিই আপনার কোনো আত্মীয় হন তো খুবই আপসোসের কথা। আপসোসের এই জন্য যে, আমার মনে হয় আমার বান্ধবীর ঐ দিনগুলোর স্মৃতি তেমন কিছু সুখস্মৃতি নয়। ও বলে, শেষকালে তিনি ওর কাছে একটা আপদ হয়ে উঠেছিলেন। এত দূর যে, ও তাঁকে নিজের দেহ ছুঁতে দিতো না, কারণ উত্তেজিত হলেই তাঁর হয় ফিট্ হোতো কিংবা ঐ জাতীয় কিছু একটা হোতো। শেষ কালে একদিন ও যখন জানতে পারলে যে, উনি রাত্রির ট্রেনে আসছেন তখন ও ওর এক অতি বশংবদ ছোকরাকে ডেকে বললে, তাঁর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জানিয়ে দিতে যে, ও আর কোনোদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায় না আর শুধু তাই নয়, যদি তিনি ওর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করেন তো ওর বন্ধুরাও তাঁকে একটা উট্‌কো আপদ ভেবে নিয়ে যা করার তাই করবে। জানি ও অসভ্যের মতো আচরণ করেছিল কিন্তু ও ভেবেছিল আখেরে এটা তাঁরই পক্ষে ভাল হবে। এই ব্যবস্থায় ফল হয়েছিল। অভ্যাসমতো তিনি আর ইনিয়ে বিনিয়ে কোনো চিঠি লিখেননি। যদিও এরকম চিঠি ও কোনোদিনই পড়তো না। আমার কিছুতেই মনে হচ্ছে না, আপনি যার কথা

বলছেন এ সেই লোক। আমি আপনাকে এই সব বললাম এই জন্যে যে, আপনার মনে আমি হেলেনের একটা ছবি তৈরি করতে চেয়েছি। ওর প্রেমিকদের কোনো ছবি তৈরি করতে চাইনি। ও প্রাণে এতো ভরপুর ছিল, মিষ্টি ব্যবহার করতে এতো সহজে তৈরী থাকতো, সহজ জীবনরসে এতোই উপচে পড়তো তার কারণ ওর জীবনরসের উৎস ছিল ওর জীবনদর্শনটাই। আর, এই জীবনদর্শনের মূলে ছিল জীবন সম্বন্ধে প্রায় আধ্যাত্মিক একটা বোধ।" শেষের এই কথাগুলো বললেন অনবদ্য ফরাসীতে—"এই জীবনদর্শনটা কেমন ছিল শুনবেন? যে পুরুষদেরদিকেই ও মন দিতো তারা সবাই ওকে হতাশ করতো। আর, কয়েকজন ছাড়া সমস্ত স্ত্রীলোককে ওর মনে হোতো বিড়ালের মতো। জীবনের সেরা দিনগুলোতে ও এমন একটা জগতে বাস করেছে যে-জগৎ ওকে অনবরত চুরমার করে দেবার চেষ্টা করেছে। ওর সঙ্গে আপনার দেখা হবে তো, হলে বুঝবেন এই জগতের চাপে ও কতটা চুরমার হয়ে গেছে!"

বেশ কিছুক্ষণ দুজনেই নীরব রইলেম। মর্মান্তিক হলেও সেবাস্তিয়ান যে ঐ ব্যক্তি তাতে আমার কোনো সন্দেহ রইল না। যদিও সেবাস্তিয়ানের যে ছবি উনি আঁকলেন—সে ছবিটা রীতি-মতো বীভৎস। কিন্তু এ তো সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ছবি।

বললেম, "আমাকে যেমন করেই হোক ওঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে। এবং তা দুটো কারণে। প্রথমতঃ তাঁর কাছে আমার একটা জিজ্ঞাসা আছে, মাত্র একটা জিজ্ঞাসা। দ্বিতীয়তঃ..." মুখে আর কথা সরল না। ঠাণ্ডা চায়ে চুমুক দিতে দিতে মাদাম লেসের্ফ বললেন, "তাই নাকি? দ্বিতীয়তঃ কী?"

"দ্বিতীয়তঃ আমি ভেবেই পাচ্ছিনে এমন একটা মেয়ে কী করে আমার দাদাকে আকৃষ্ট করলেন। ওঁকে আমি নিজের চোখে দেখতে চাই।"

মাদাম লেসের্ফ বললেন, "আপনি কী বলতে চান যে, আপনার

ধারণায় ও একটা ভয়ংকর বিপজ্জনক মেয়ে? ফরাসীতে যাকে বলে 'ফাম ফাতাল' বা বিষকন্যা? জানবেন ও তা নয়। টাট্‌কা খাঁটি রুটির মতো ও স্বাভাবিক।"

"আমি তা বলছিনে—ভয়ংকরও নয়, বিপজ্জনকও নয়। চালাক বলতে পারেন, বা অমনি কিছু।···সে কথা যাক্‌, ওকে আমায় নিজের চোখে দেখতে হবে।"

মাদাম লেসের্ফ বললেন, "যত বাঁচবেন তত দেখবেন। আমি একটা পরামর্শ দিচ্ছি শুনুন। আমি আগামী কাল চলে যাচ্ছি। হয়তো শনিবারে এসে দেখবেন যে, হেলেন এতো ব্যস্ত—ব্যস্ত ও সব সময়ই—এতো ব্যস্ত যে, আপনাকে পরের দিন আসতে বলবে। হয়তো বেমালুম ভুলে যাবে যে, পরের দিন আমার গ্রামের বাড়ীতে ওর যাওয়া ঠিক হয়ে আছে: অর্থাৎ আপনি তার নাগাল পাবেন না। সবচেয়ে ভালো হবে আপনিও যদি আমার ওখানে আসেন। তাহলে তার সঙ্গে নিশ্চয় আপনার দেখা হবে। তাই বলি কি, আপনি রবিবার সকালে আসুন, আর যতদিন খুশি থেকে যান। আমাদের চারখানা বাড়তি শোবার ঘর আছে। আপনার কোনো অসুবিধে হবে না। আর, বুঝতে পারছেন, আমি যদি গোড়াতেই ওর সঙ্গে একটু কথা বলে রাখি তাহলে ও আপনার সঙ্গে কথা বলার মতো মেজাজেও থাকবে। ঠিক, রাজী তো?" ফরাসী দিয়ে শেষ করলেন।

॥ ষোল ॥

"ভারী অদ্ভুত তো!" আমি ভাবলেম। মনে হোলো কোথায় কী একটা ধাঁচের মিল রয়েছে; যেন নিনা রেচনোই আর হেলেন ফন গ্রাউনের মধ্যে—একজনের স্বামীর আঁকা ছবি আর—আর একজনের প্রিয় বান্ধবীর আঁকা ছবি, এই দুটো ছবির মধ্যে, দুজনের

মধ্যে কাকে বেছে নেবো? নিনার ভিতর যেমন খেলো তার বাইরে তেমনি জাঁক। হেলেন যেমন চতুরা তেমনি হৃদয়হীনা। দুজনেই চটুল, দুজনের কেউই আমার মনোমতো নয়। আর, আমার ধারণা সেবাস্তিয়ানেরও নয়।

এই ফরাসী মেয়েটা তার বান্ধবী সম্বন্ধে যা বললে তা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। সেবাস্তিয়ানকে নিয়ে যে খেলাটা খেলা হয়েছে তার বিবরণ জেনে আমার মনোভাব যাই হোক না কেন, আমার সন্ধানপর্বটা যে সমাপ্তির মুখে এটা জেনে আমি সুখী না হয়ে পারলেম না। পাহল পাহলিচের প্রথমা স্ত্রীকে খুঁজে বের করার অসম্ভব চেষ্টায় আর আমাকে নামতে হবে না—ও মেয়েটা জেলেও থাকতে পারে আবার লস্ এঞ্জেলেস্-এও থাকতে পারে। মনে মনে বুঝলেম এই আমার শেষ সুযোগ। হেলেন ফন গ্রাউনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সম্ভাবনাকে একেবারে সুনিশ্চিত করার জন্যে আমি একটা চূড়ান্ত চেষ্টা করলেম। তাঁর প্যারিসের ঠিকানায় একখানা চিঠি পাঠিয়ে দিলেম যেন তিনি ওখানে পৌছেই চিঠিখানা পান। ছোট্ট চিঠি, শুধু লিখলেম যে, আমি লেস্কোতে তাঁর বান্ধবীর অতিথি হয়ে যাচ্ছি, আর তা তাঁরই সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে। এই কথাগুলোর সঙ্গে আর একটা বাড়তি বাক্য জুড়ে দিয়ে জানালেম যে সাহিত্য সংক্রান্ত একটা জরুরী ব্যাপারে আমি তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চাই। এই শেষ বাক্যটায় সামান্য ধাপ্পা ছিল কিন্তু আমি ভাবলেম উনি টোপটা গিলবেন। আমি ঠিক বুঝতে পারিনি তাঁর বান্ধবী তাঁকে দিজঁতে ফোন করার সময়ে আমার দেখা করার ইচ্ছার কথা তাঁকে জানিয়েছেন কিনা। কিন্তু, আগামী রবিবারে মাদাম লেসের্ফ যদি আমাকে একটা মামুলী খবরের মতো জানিয়ে দেন যে, হেলেন তাঁর ওখানে না গিয়ে সোজা নিস্ চলে গেছেন? সেই সম্ভাব্য নৈরাশ্য এখন থেকেই যেন আমাকে উদ্‌বিগ্ন করে তুলেছে। চিঠিখানা পোস্ট করে অনুভব করলেম যে, যাই হোক

সাক্ষাৎকারটাকে সুনিশ্চিত করার জন্যে যা করা সম্ভব তাই-ই করেছি।

আগের কথা মতো দুপুর নাগাদ লেস্‌কোতে পৌঁছনর জন্যে সকাল ন'টায় বেরিয়ে পড়লেম। ট্রেনে উঠ্‌তে উঠ্‌তে ধক্‌ করে মনে পড়ল সেবাস্তিয়ান যেখানে মরেছেন ও মাটি পেয়েছেন সেই স্যাঁং দামিয়ে-এর ওপর দিয়েই তো যেতে হবে!

এক রাত্রির-ট্রেনে আমি এখানে পৌঁছেছিলেম। সে এক অবিস্মরণীয় রাত। এবার কিন্তু জায়গাটাকে আমি একেবারেই চিনতে পারলেম না। স্যাঁং দামিয়ের স্টেশনের ছোট্ট প্ল্যাটফর্মে মিনিটখানেকের মতো ট্রেনটা থামতে শুধু স্টেশনের নামটাই মনে করিয়ে দিলে—আমি এখানে একবার এসেছিলেম। আমার স্মৃতিপটে যে অতিপ্রাকৃত স্বপ্নছবিটার চিহ্ন এখনো থেকে গেছে তার তুলনায় জায়গাটাকে অনেক সাদামাটা, অনেক স্বাভাবিক বলে মনে হোলো। কিংবা সেই স্বপ্নছবিটার মধ্যেই বিকৃতি এসেছে! ট্রেনটা আবার যখন চলতে শুরু করলে তখন আমার মনের ওপর চাপটা যেন কোনো যাদুমন্ত্রে কমে এল। দু'মাস আগে এই রেলপথটা ধরে আসার সময় আমার মনে হয়েছিল এই পথটা বুঝি ভৌতিক জগতের একটা রেলপথ, আজ আর তা মনে হোলো না। আজ আবহাওয়া পরিষ্কার, যতবার ট্রেন থামছে ততবারই আমি যেন বসন্তের শ্বাস-প্রশ্বাসের উঠানামা শুনতে পাচ্ছি; বসন্তের পূর্ণরূপটা দেখা যাচ্ছে না বটে তবু সে যেন এখনো বিরাজ করছে তাতে সন্দেহ নাই। রঙ্গমঞ্চের উইংসের আড়ালে হিম হাতপায়ে ব্যালে সখীরা যেমন দাঁড়িয়ে থাকে তেমনি বসন্ত যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে আড়ালে। এই উপমাটা সেবাস্তিয়ান নিজেই একবার ব্যবহার করেছিলেন।

মাদাম লেসের্ফ-এর বাড়ীটা আকারে বড় হলেও তা ভগ্ন দশায়। বাগান বলতে গোটা কয়েক নিস্তেজ পুরোনো গাছ। একদিকে মাঠ আর একদিকে একটা পাহাড়, পিঠে তার একটা

ফ্যাক্টরী। জায়গাটার চারপাশের পরিবেশে একটা অদ্ভুত ধরনের অবসাদ, দৈন্য ও ধূলিধূসর ভাব। পরে যখন জানলেম জায়গাটা মাত্র বছর তিরিশেক আগে জমে উঠেছে তখন এর এই ভগ্নদশা দেখে বিস্মিত না হয়ে পারলেম না। সদর দরজার দিকে পা বাড়াতে কে একজন কড়কড় শব্দে কাঁকর বিছানো পথ বেয়ে দ্রুতপায়ে সামনে এসে থমকে দাঁড়িয়ে আমার দিকে একখানা হাত বাড়িয়ে দিলে।

অবসন্ন দৃষ্টিতে আগাপাস্তলা আমাকে দেখে নিয়ে ফরাসী ভাষায় বললেন, "আপনার সঙ্গে আলাপ করতে পেরে আমি কৃতার্থ।" "আমার স্ত্রী আপনার অপেক্ষায় রয়েছেন"—বললেন ইংরেজীতে। পরমুহূর্তে ফরাসীতে ফিরে গিয়ে বললেন, "আমি শরীরে একটা ঘা খেয়েছি তবু আমাকে এই রবিবারেই প্যারিস চলে যেতে হচ্ছে।" মধ্যবয়সী সাধারণ চেহারার এক ফরাসী ভদ্রলোক। ক্লান্ত চোখ, যন্ত্রচালিতের মতো হাসি। আবার আমরা করমর্দন করলেম।

ওধারে বারান্দা থেকে মাদাম লেসের্ফ-এর স্ফটিক [স্পষ্ট] স্বচ্ছ কণ্ঠস্বর ভেসে এল—"ওগো শুনছো, তুমি যে ট্রেণ ফেল করবে!" ভদ্রলোক ইঙ্গিতটা ধরে নিয়ে অতি বাধ্যের মতো হন্তদন্ত হয়ে চলে গেলেন। আজ উনি বাসন্তী রঙের পোশাক পরেছেন: ঠোঁট দুটো প্রসাধনে ঝক্‌মক্ করছে বটে কিন্তু গায়ের স্বচ্ছ বর্ণটা অক্ষুণ্ণ থেকে গেছে তার ওপর কোনো প্রলেপ লাগানোর কথাটা ওঁর চিন্তায় আসেনি। ওঁর চুলের নীল্‌চে রঙ্ রোদ্দুরে আশ্চর্য খুলেছে। হঠাৎ আমার মনে খেলে গেলো, যাই হোক, চেহারাটা বেশ মিষ্টি।

দু'তিনখানা ঘরের ভিতর এদিক সেদিক ঘুরে বেড়াচ্ছি। মনে হোলো, যেন ড্রয়িং রুমটাকে ভেঙে ঘর ক'খানার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আর, মনে হোলো এই ছড়ানো অবসাদগ্রস্ত বাড়ীতে আমরা দু'জনই মাত্র রয়েছি। সবুজ রঙের সিল্ক-মোড়া 'সেটি' থেকে একখানা শাল তুলে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে নিলেন। বললেন, "বেশ ঠাণ্ডা, না? জীবনে যে একটা জিনিসের প্রতি আমার বিদ্বেষ তা এই শীত।

হাতটা ছুঁয়ে দেখুন। এক গ্রীষ্ম ছাড়া সব সময়ই এমনি থাকে। এক্ষুণি খাবার এসে যাবে। আসুন, বসা যাক্।" জিজ্ঞাসা করলেম, "আচ্ছা, তিনি ঠিক কখন আসবেন?"

"আচ্ছা, আপনি কি এক মুহূর্তের জন্যও তাকে ভুলে আমার সঙ্গে অন্য কিছু নিয়ে কথা বলতে পারছেন না?" চোখ মট্‌কে ফরাসীতে বললেন, "জানেন, এটা কিন্তু শিষ্টাচার নয়! (তারপর ইংরাজীতে) আপনার নিজের সম্বন্ধে কিছু বলুন না আমাকে। আপনি কোথায় থাকেন, কী করেন?"

"আচ্ছা, উনি কি বিকেলের মধ্যে এসে পড়বেন?"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি আচ্ছা একরোখা মানুষ তো! সে আসবেই অতো অধীর হবেন না। জানেন তো, যে সব পুরুষ মানুষের মাথা একটা অনড় কিছু দিয়ে ঠাসা থাকে তাদিকে মেয়েরা কিন্তু পছন্দ করে না। আচ্ছা, আমার স্বামীকে কেমন লাগল?"

বললেম, তাঁর স্বামী তাঁর চেয়ে বয়সে অনেক বড়। হাসতে হাসতে বলতে থাকেন, "মন ভালো, তবে বড্ড গায়ে-পড়া! আমি ইচ্ছে করেই ওকে সরিয়ে দিলেম। বছর খানেক মাত্র বিয়ে হয়েছে কিন্তু এর মধ্যেই মনে হচ্ছে যেন আমাদের বিয়ের হীরক জয়ন্তী হয়ে গেছে। তা ছাড়া, এই বাড়ীটা আমার কাছে বিষ। আপনারও তাই মনে হচ্ছে, না?"

আমি বলি, "বাড়ীটা দেখে কেমন সেকেলে সেকেলে মনে হয় বটে।"

"সেকেলে কথাটা কিন্তু খাটে না এখানে। আমি যখন এটাকে প্রথম দেখি তখন বাড়ীটাকে একেবারে আন্‌কোরা নতুন ঠেকেছিল। কিন্তু এর মধ্যেই রঙ্‌ চটে গেছে, ভেঙে ভেঙে পড়ছে। আমি একবার কোন্ ডাক্তারকে বলেছিলেম, বেগুনি পিন্‌ক্ আর ড্যাফোডিল ছাড়া আমি যে ফুলেই হাত দিই না কেন তা শুকিয়ে যায়, অদ্ভুত? না?"

"তখন ডাক্তার কী বললেন?"

"বলেছিলেন, তিনি বোটানির কিছুই জানেন না। পারস্যদেশে এক রাজকন্যা ছিল আমার মতো। তার ছোঁয়ায় রাজপ্রাসাদের বাগান শুকিয়ে গিয়েছিল।"

গোমড়ামুখী বয়স্কা এক ঝি উঁকি মেরে মনিবের দিকে ঘাড় নেড়ে কী একটা ইশারা করলে।

মাদাম লেসের্ফ বললেন, "এই যে আসুন, আপনি এতক্ষণে নিশ্চয় ক্ষিধেয় মরছেন (ফরাসীতে বললেন)। আমি মুখ দেখেই বুঝেছি।"

আমি ওঁর পিছুপিছু যাচ্ছিলাম। উনি দোরগোড়ায় পৌঁছে হঠাৎ থেমে ঘুরে দাঁড়াতেই আমি ওঁর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেম। উনি আমাকে কাঁধে চেপে ধরলেন (ওঁর মাথার চুল আলগোছে আমার গাল ছুঁয়ে গেল। বললেন, "খুব বেসামাল ছেলে তো!··· আমি পিলগুলো আনতে ভুলে গেছি।"

পিলগুলো খুঁজে আনলেন; তারপর আমরা খাবার ঘরের খোঁজে বাড়ীটা চষে বেড়ালেম। শেষকালে পৌছলেমও সেখানে। ঘরখানা অন্ধকার অন্ধকার; বাইরে বেরিয়ে-আসা একটা 'বে'-জানালা। এই জানালাটা কী করি কী করি করে যেন শেষমুহূর্তে সাধারণ জানালার মতো হয়ে এসেছে, কিন্তু তাও যেন দ্বিধাভরে। দুটো পৃথক দরজা দিয়ে দু'জন নিঃশব্দে ঢুকলেন। একজন বৃদ্ধা; জানলাম ইনি সম্পর্কে মঁসিয়ে লেসের্ফ-এর বোন। হাতে হাতে খাবার এগিয়ে দেওয়ার সময় শুধু কয়েকটা ভদ্রতাসূচক আওয়াজ করেই ইনি আলাপ সারলেন। অন্যজন মোটামুটি সুদর্শন চেহারার পুরুষ। পরনে ঢল-ঢলে নিকারবোকার; গম্ভীর মুখ, মাথায় পাত্‌লা চুলে একটা অদ্ভুত ধরনের কটা টানা দাগ। আহার পর্বের মধ্যে তিনি ভুলেও একটি কথা উচ্চারণ করলেন না। মাদাম লেসের্ফ এক বিচিত্র কায়দায় পরিচয় করিয়ে দিলেন। নামধাম না বলে শুধু কয়েকটা দ্রুত ইশারায়। লক্ষ্য করলেম এই ভদ্রলোকটির উপস্থিতিটা তিনি একেবারেই অগ্রাহ্য করলেন। বলতে কি ইনি নিজেই ছাড়াছাড়া ভাব নিয়ে বসেছিলেন।

খাবারের পদগুলোর রান্না ভাল হয়েছিল তবে পদগুলোকে কিছু আগে থাকতে ঠিক করা হয়নি। মদটা অবশ্য ভালই ছিল।

প্রথম দফা কাঁটা চামচের ঠুং ঠাং আওয়াজ বন্ধ হতে ফর্সা ভদ্র-লোকটি সিগারেট ধরিয়ে কোথায় উঠে গেলেন। মিনিটখানেক পরে একটা ছাইদান হাতে নিয়ে ফিরলেন। মাদাম লেসের্ফ এতক্ষণ খাচ্ছিলেন, এবার আমার দিকে চোখ তুলে বললেন:

"কিছুদিন খুব ঘুরলেন, তাই না? আমি কখনো ইংলণ্ডে যাইনি —হয়ে ওঠেনি আর কি! মনে হয় খুব প্রাণহীন জায়গা।" ফরাসীতে বললেন: "ওখানে থাকলেই মানুষকে পাগলের মতো মনমরা হয়ে যেতে হয়, তাই না? তার ওপর আছে কুয়াশা। গান নেই···কোনো কলার চর্চা নাই···" থেমে বললেন, "খেয়ে দেখুন, এ এক অন্য ধরনের খরগোস রান্না; মনে হয় আপনার ভালই লাগবে।"

"হ্যাঁ, একটা কথা, আপনাকে বলতে ভুলে গেছি—আমি আপনার বন্ধুকে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছি যে, আমি এখানে আসছি···অর্থাৎ ঘুরিয়ে তাকে এখানে আসার কথাটা মনে করিয়ে দিয়েছি।"

মাদাম লেসের্ফ ছুরি-কাঁটা নামিয়ে রাখলেন। দেখলেম, তাঁর মুখের ওপর বিস্ময়-মাখা বিরক্তির ছাপ পড়ে গেল। বললেন, "একী করলেন?"

"কিন্তু, এতে কোনো ক্ষতি হবে কি? আপনি কি বলেন···?"

দু'জনেই চুপ। চুপ করে খরগোস রান্নাটা খেয়ে ফেললেম। এরপর এলো চকোলেট দেওয়া ক্রিম। ফর্সা ভদ্রলোক সযত্নে ন্যাপকিনখানাকে ভাঁজ করে রিং-এর মধ্যে পরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে, গৃহকর্ত্রীর উদ্দেশ্যে মাথা হেঁট করে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

মাদাম লেসের্ফ ঝিকে বললেন: "সবুজ ঘরে কফি দেবে।"

সবুজঘরে যে যার স্থানে বসার পর মাদাম বললেন, "আপনার ওপর আমি ক্ষেপে গেছি, জানেন! আপনি বুঝি সব মাটি করে

দিলেন!" জিজ্ঞাসা করি, "কেন? কী এমন করলেম?" উনি মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। ওঁর ছোট্ট জমাট বুকখানা ফুলে উঠ্‌ল (সেবাস্তিয়ান এক জায়গায় লিখেছিলেন যে, শুধু গল্পের বইয়েই মাত্র এমনটি ঘটে, কিন্তু আমি প্রমাণ পেলেম উনি ভুল বলেছিলেন)। তাঁর কিশোরীর মতো ঘাড়ের ওপর একটা নীল শিরা যেন থরথর করে কেঁপে উঠল (অবশ্য হলফ্ করে এটা আমি বলতে পারিনে)। তাঁর চোখের পাতাগুলো যেন প্রজাপতির পাখা। হ্যাঁ, সুন্দরী, নিঃসন্দেহে সুন্দরী।

জিজ্ঞাসা করি, "আপনার কি প্যারিসে জন্ম?"

আমার দিকে না তাকিয়ে জবাব দিলেন, "ধন্যবাদ, এই বোধহয় প্রথম প্রশ্ন করলেন আমার সম্বন্ধে? কিন্তু তাই বলে মনে করবেন না এতে আপনার দোষের ক্ষালন হোলো। এর চেয়ে নির্বুদ্ধিতার কাজ আর আপনি কিছু করতে পারতেন না। বোধহয় চেষ্টা করলে ...ক্ষমা করবেন...আমি এক্ষুণি আসছি।"

আমি একা বসে ধূমপানে মন দিলেম। আড় হয়ে পড়া সূর্যকিরণে এক ঝাঁক ধূলিকণা চিক্‌চিক্ করে উড়ছে। এদের সঙ্গে কয়েকটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী যোগ দিয়ে পাক খাচ্ছে। যেন যে কোনো মুহূর্তে ওরা একটা জীবন্ত ছবির রূপ নিতে পারে এমনিধারা ভাব। আমি আবার বলছি যে, এই পাতাগুলোকে এমন কিছু বিষয় দিয়ে ভারাক্রান্ত করতে চাইনে যা নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত। তবু পাঠক (কে জানে হয়তো সেবাস্তিয়ানের প্রেতও) এই কথা শুনলে কৌতুক অনুভব করবেন যে, মুহূর্তের জন্য আমি এই স্ত্রীলোকটিকে প্রেম নিবেদনের কথা ভাবলেম। ব্যাপারটা সত্যই অদ্ভুত, কেননা শুধু ওঁর কথাই নয়, ওঁর উপস্থিতিও আমাকে ভিতরে ভিতরে উত্যক্ত করে তুলেছিল ইতিমধ্যে। কেমন করে জানি না, আমার নিজের ওপর নিজের শাসনটা শিথিল হয়ে আসছিল। উনি ফিরে আসতেই আমি মনে মনে গা ঝাড়া দিলেম।

"আপনারই হাত যশ বোধহয়। হেলেন বাড়ীতে নাই।" ফিরে এসে বললেন।

"আরো ভালো, হয়ত এখন পথে। আপনি কি বুঝতে পারছেন না ওকে দেখার জন্যে আমি কী ভীষণ অধীর হয়ে উঠেছি।"

মাদাম লেসের্ফ তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, "কিন্তু বুঝতে পারছিনে, এর জন্যে তাঁকে চিঠি লিখতে হবে কেন? আপনি তাকে চেনেন না পর্যন্ত। তাছাড়া, আমি আপনার কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি যে, তিনি আজ এখানে থাকবেন। এর চেয়ে বেশী আর কী চান? আর, আমাকে যদি বিশ্বাস করেননি, যদি আমাকে কোনো ভাবে বাধ্য করতে চেয়ে থাকেন, তা'হলে বলবো (এইটুকু ফরাসীতে বললেন) মঁসিয়, আপনি নিজেকে খেলো করে ফেলেছেন।"

এ-কথার জবাব আমি কিন্তু যথার্থ সারল্যে বললেম, "দেখুন, আমি অতশত ভাবিনি। আমি শুধু ভেবেছিলেম···রুশরা যেমন বলে, মাখন দিলে পরিজ মাটি হয় না, অর্থাৎ অধিকন্তু ন দোষায়।"

উনি বললেন অসহিষ্ণু হয়ে, "রাখুন আপনার মাখন আর রাশিয়ান···আমি এখন কি করি?" আমার হাতের কাছে তাঁর একখানা হাত পড়ে রয়েছে। দেখি সেই হাতখানা খুব মৃদু মৃদু কাঁপছে। পরনে ফ্রকটা খুব পাতলা। আমার মেরুদণ্ড বেয়ে একটা বিচিত্র শিহরণ বয়ে গেল। না, ঠিক ভয়ের শিহরণের মতো নয় তো? হাতখানায় একটা চুমো রাখবো? নিজেকে বেকুব না করে আমি কি খানদানি ভদ্রতার অভিনয় করতে পারবো? উনি দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। "না, আর কিছু করবার নাই! ও যদিই বা আসতো, আপনিই তাতে বাদ সেধেছেন। আর, আসেই যদি তো ভালই! তখন দেখা যাবে। ততক্ষণ আসুন এই বাড়ীটার আশ পাশটা দেখবেন'খন। মনে হয় এই হতভাগা বাড়ীটার ভিতরের চেয়ে তার বাইরে গরম বেশী। ফরাসীতে বললেন, "এই বুকচাপা বাড়ীটায় বাস করা যে কী!···"

বাড়ীটার সীমানার মধ্যেই বাগান আর তার মধ্যে একটা কুঞ্জ। এ দুটো আগেই আমার দেখা। চারিদিক নিস্তব্ধ। গাছগুলোর কালো কালো ডালের এখানে সেখানে সবুজের ছোপ, মনে হোলো ওরা যেন নিজেদের ভিতরের জীবনের দিকে কান পেতে রয়েছে। কী একটা বিস্বাদ বিষণ্ন যেন এই জায়গাটার ওপর চেপে বসে রয়েছে। একটা জায়গায় কোনো অদৃশ্য মালী মাটি কুপিয়ে তুলে ফেলে একটা ইটবেরকরা দেওয়ালের গায়ে ঢিপি করে ফেলে রেখে গেছে। যাবার সময় কোদালটা ভুলে ফেলে গেছে। একটা বিচিত্র ভাবসূত্রে আমার মনে পড়ে গেল কিছুদিন আগের একটা খুনের ঘটনা। মনে পড়ল, শুনেছিলেম আততায়ী লাশটাকে এমনি একটা বাগানে পুঁতে রেখে চলে গিয়েছিল।

মাদাম লেসের্ফ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "নিশ্চয়ই আপনি আপনার সৎদাদাকে খুবই ভালবাসতেন, তা না হলে তাঁর অতীত নিয়ে এতো মাথা ঘামাতেন না। আচ্ছা উনি কী ভাবে মারা গেলেন? আত্মহত্যা?"

"আত্মহত্যা কেন হবে?" উত্তরে বললেম "হার্টের অসুখ ছিল!"

"আমার মনে হচ্ছে আপনি যেন বলেছিলেন উনি গুলিতে আত্ম-হত্যা করেছিলেন। শেষটা এ রকম হলে তা নিঃসংশয়ে রোমান্টিক হোতো, কী বলেন? আপনার বইটা যদি রোগশয্যায় শেষ হয় তা হলে আমি কিন্তু হতাশই হবো। জানেন···ঐখানে ঐ মাটিটাতে গ্রীষ্মকালে গোলাপ হয়! কিন্তু, এর পর আর কোনো গ্রীষ্মে তো আপনি আমাকে আর এখানে দেখবেন না!"

আমি বললেম, "ওঁর জীবনকে কোনো দিক দিয়ে বিকৃত করার কথা আমি চিন্তাও করতে পারি না।"

"ঠিক আছে, আমি একজনকে জানতেম যিনি তাঁর মৃত পত্নীর চিঠিগুলো ছাপিয়ে তার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে বিলি করেছিলেন।

আচ্ছা, আপনি কেন ভাবছেন যে, আপনার ভাইয়ের জীবনের আখ্যান লোকের ভাল লাগবে ?"

"আপনি কি পড়েননি··· ?" যেই কথা আরম্ভ করেছি অমনি চোখে পড়ল একটা ঝক্‌ঝকে মোটর গাড়ী কাদার ছিটে মেখে গেটে এসে দাঁড়াল।

মাদাম লেসেফ´ বলে উঠলেন, "যাক্‌, এবার !···"

উত্তেজিত হয়ে আমি বলে উঠলেম, "বোধহয় তিনিই !"

এক ভদ্রমহিলা গাড়ী থেকে হুমড়ি খেয়ে ছপ করে ছোট্ট এক টুক্‌রো কাদাজলের মধ্যে নেমে পড়লেন।

মাদাম লেসেফ´ বললেন, "হ্যাঁ, সেইই ! আপনি যেখানে আছেন সেখানেই থাকুন।"

হাত নাড়তে নাড়তে উনি ছুটে নেমে গেলেন। আগন্তুকার কাছে গিয়ে তাঁকে চুমু খেয়ে তাঁর সঙ্গে বাঁদিকে একটা ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন! কয়েক মুহূর্ত পরে দেখি ওঁরা বাগানটাকে একচক্র ঘুরে এসে সিঁড়ি বেয়ে উঠছেন। দেখতে দেখতে ওঁরা দু'জন বাড়ীর মধ্যে হারিয়ে গেলেন। নবাগতার বোতাম খোলা ফারকোটটা আর ঝল্‌মলে স্কার্ফটা ছাড়া হেলেন ফন গ্রাউনের কিছুই আমার চোখে পড়ল না।

সামনে একটা পাথরের বেঞ্চি পেয়ে তাতে বসে পড়লেম। আমি উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেম। খুশীও হয়েছিলেম যাক্‌, শিকার তা হলে শেষ পর্যন্ত হাতের মধ্যে এসে পড়ল ! বেঞ্চির ওপর কার একটা বেতের ছড়ি পড়েছিল। সেটা দিয়ে পায়ের কাছে বাদামী রঙের সরেস মাটিটাকে খোঁচাতে লাগলেম। যাক্‌ শেষ পর্যন্ত আমার চেষ্টা সার্থক হয়েছে। আজ রাত্রেই ওঁর সঙ্গে দেখা করে আমি প্যারিস ফিরে যাবো···আর নিতান্ত এক বেমানান খাপছাড়া চিন্তা যেন অতি সন্তর্পণে অন্য চিন্তার ভিড়ে ঢুকে পড়েছে।···আর, আজ রাত্রেই কী ফিরবো ? নাকি মপাসাঁর দ্বিতীয় শ্রেণীর সেই গল্প

"আমি একটা বই ফেলে গেছি"-এর সেই কয়েকটা দম-আটকানো কথা…

কিন্তু আমিও আমার বইটাকে যে ভুলতে বসেছি।…

মাদাম লেসের্ফের গলা শুনলেম, "এই যে এখানে রয়েছেন! আমি ভেবেছিলেম আপনি বুঝি বাড়ী চলে গেছেন।"

"সব ঠিক আছে তো?" জিজ্ঞাসা করি।

"ঠিক আছে?" শান্তকণ্ঠে উত্তর দিলেন, "জানি না কী লিখে-ছিলেন। ও ভেবেছে চিঠিখানা বুঝি একটা ফিল্ম-এর ব্যাপার সংক্রান্ত। এই আলোচনাটার ও একটা নিষ্পত্তি চাইছিল। তাহলে আপনি ওকে ধোঁকা দিয়ে এনে ফেলেছেন। এবার শুনুন, যা যা বলছি তাই করবেন। আজ বা কাল বা পরশু ওর সঙ্গে কোনো কথা বলবেন না। এখানে কয়েকদিন থেকে যান ও ওর মনোরঞ্জনের চেষ্টা করুন। কথা দিয়েছে আমাকে ও সব বলবে; তারপর হয়তো আপনি ওঁর সঙ্গে কথা বলতে পারেন। কী! ব্যবস্থাটা ভাল, না?"

বললেম, "আপনি যে এতোদূর ঝঞ্ঝাট পোয়াচ্ছেন তার জন্যে আপনাকে কী বলে ধন্যবাদ দেবো জানি না।"

আমার পাশে বেঞ্চির ওপর বসলেন। বেঞ্চিটায় জায়গা কম, আর সত্যি কথা বলতে আমার দেহখানাও আয়তনে একটু চওড়ারই দিকে, ওর কাঁধটা আমার কাঁধে ঠেকল। জিভ দিয়ে ঠোঁটটা ভিজিয়ে নিলেম। হয়তো ছড়িটা দিয়ে মাটির ওপর দাগ কাটতে রইলেম। "কী আঁকছেন দেখি!" বলে গলাটা ঝেড়ে পরিষ্কার করলেন। বোকার মতো জবাব দিই, "আমার ভাবনার ছবি।" নরম গলায় বললেন, "জানেন? নিজের নামের অক্ষর গুলিকে উল্‌টে লিখতে পেরেছিলেন বলে একবার আমি একজনকে চুমু খেয়েছিলেম!" আমার হাত থেকে ছড়িটা খসে পড়ে গেল! মাদাম লেসের্ফের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেম। একদৃষ্টে চেয়ে রইলেম তাঁর মসৃণ শাঁখের মতো শুভ্র কপালে, চেয়ে রইলেম তার কালচেবেগুনি রঙের চোখের পাতার

দিকে। উনি চোখের পাতা নামিয়ে নিলেন। সম্ভবতঃ আমার চাউনির ভুল অর্থ করে…। চেয়ে দেখলেম ওঁর পাণ্ডুর বর্ণের একটা জরুল, নাকের পাটি ছুটো পাতলা, নরম। ওপরের ঠোঁটটা একটু কোঁকড়ানো, আর চুল ঘন কালো। মাথা নীচু করলে চোখে পড়ল, গলার রঙ ঘোলাটে সাদা। সরু সরু আঙুলের নখে গোলাপী প্রলেপ। মুখখানি তুললেন; অদ্ভুত কালো ভেলভেট রঙের চোখ মেলে আমার ঠোঁটের দিকে চেয়ে দেখলেন। চোখের মণিছুটো, দেখি, স্বাভাবিকের চেয়ে একটু ওপরে বসানো।

আমি উঠে পড়ি। "কী ব্যাপার?" জিজ্ঞাসা করেন, কিছু ভাবছেন? মাথা নাড়লেম। ধরেছেন ঠিক। কিছু একটা ভাবছিলেম। এই মুহূর্তেই কোনো কিছু একটার মীমাংসা চাই।

ছ'জনে পথ ধরে এগোচ্ছি। "একি আমরা কি ভিতরে যাচ্ছি?" জিজ্ঞাসা করলেন।

ঘাড় নাড়লেম। "কিন্তু আর একটু পরে না হলে তো, ও নীচে নামবে না! কিন্তু এমন মুখগোমড়া কেন?" আমি বোধ হয় কিছু-ক্ষণ থেমে তাঁর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিলেম; এবার তাকিয়ে ছিলেম তাঁর ফিকে হলুদ রঙের টান টান ফ্রক দিয়ে মোড়া ছোট্ট পাতলা দেহটার দিকে।

ভাবনার ভার টেনে টেনে এগিয়ে চলেছি। পায়ের তলায় রোদ্দুরের ছোঁয়ালাগা পথটা যেন ভ্রূকুটি করে রয়েছে আমার দিকে।

মাদাম লেসেফ বললেন ফরাসীতেঃ "কোনো মেয়েরই আপনাকে পছন্দ হবে না।"…

বাইরে উঁচু বারান্দাতে একটা টেবিল আর কয়েকখানা চেয়ার পাতা। যে ফর্সা রঙের চুপচাপ লোকটাকে সেই ছুপুরে খাওয়ার সময় দেখেছিলেম সে দেখি বসে বসে আপনমনে একটা হাতঘড়ির কলকব্জা পরীক্ষা করছে। বসতে যেতেই তার কনুইয়ে ধাক্কা লেগে গেল আর, তার হাত থেকে একটা ছোট্ট স্ক্রু খুলে পড়ে গেল।

মার্জনা চাইতে তিনি বললেন, "ও কিছু নয়"। বললেন রুশ ভাষায়। (তাহলে ইনি রুশ নাকি? ভালই হোলো, আমারই কাজে লাগবেন)। মহিলাটি আমাদের দিকে পিঠ করে দাঁড়িয়ে ছিলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ের নীচে মেঝেতে বসানো পাথরের টালির ওপর পা ঠুকে ঠুকে ঠুক্ ঠুক্ আওয়াজ করছিলেন।

আমার যে নীরব দেশোয়ালি ভদ্রলোক বড় বড় চোখ করে ঘড়ি পরীক্ষা করছিলেন এবার তাঁকে উদ্দেশ্য করে রুশ ভাষায় নিম্নস্বরে বললেম "অা উ নেঈ না শেঈকি পাউক ?—ওঁর ঘাড়ে একটা মাকড়সা রয়েছে না?" ভদ্র মহিলার হাতখানা তড়িতগতিতে তাঁর ঘাড়ের ওপর এসে পড়ল এবং তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। শ্লথমতি দেশোয়ালি ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "স্তোর" অর্থাৎ কী বললেন? পর মুহূর্তে তিনি ভদ্রমহিলার দিকে চেয়ে অস্বস্তির হাসি হেসে ঘড়িটাকে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। ঘুরে দাঁড়িয়ে মাদাম লেসের্ফ ফরাসীতে বললেন, "আমার ঘাড়ের ওপর কী একটা রয়েছে না?" আমি বললেম, "এই মাত্র এই রুশ ভদ্রলোককে আমি বলছিলেম যে আপনার ঘাড়ের ওপর একটা মাকড়সা। আমার চোখের ভুল—ঘাড়ের ওপর এক টুকরো আলো পড়েছিল।" উনি চোখমুখ উজ্জ্বল করে জিজ্ঞাসা করলেন, "গ্রামোফোনটা চালাবো কি?"

"কিছু মনে করবেন না, আমার বাড়ী ফেরার সময় হয়েছে আশাকরি আমাকে মার্জনা করবেন।"

উনি ফরাসীতে বললেন, "কিন্তু আপনি একেবারে পাগল। আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবেন না?"

"হবে, হবে, পরে হবে।" স্বরটা মোলায়েন করে বলি। বাগানের ভিতর পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে বললেন, "কী ব্যাপার বলুন তো?"

আমাদের দিলখোলা রুশ ভাষায় বললেম, "খুব চালাকি করেছেন যা হোক। বন্ধুর সম্বন্ধে কথা বলার ছলে নিজের কথাই বলেছেন

আপনি সারাক্ষণ আমার সঙ্গে। খুবই বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন অবশ্য। এই ধাপ্‌পার খেলাটা অনেকদিনই চলতো যদি রুশ ভাষায় যেমন বলে—যদি না ভাগ্য আপনার কনুইয়ে নাড়া দিতো আর আপনার হাতের ঘোল আর দই যদি চলকে মাটিতে না পড়ে যেতো। আপনার স্বামীর ভাই সম্পর্কের যে লোকটি তার নামের অক্ষর-গুলোকে উল্‌টে লিখতে পারতেন তার সঙ্গে আমার দেখা হয়ে গেছে ঘটনাক্রমে। তাই ছোট্ট একটা পরীক্ষা করে নিলেম। আর, আপনি যখন আমার জনান্তিকে বলা রুশ বাক্যটাকে নিজের অজ্ঞাতসারে লুফে নিলেন…" না। আমি এর একটা কথাও প্রকাশ্যে বললেম না। হেঁট হয়ে সম্ভ্রম জানিয়ে বাগান থেকে বেরিয়ে এলেম। এই বইয়ের একটা কপি ওঁকে পাঠাতে হবে। বইখানা পেলে উনি এসব জানতে পারবেন।

॥ সতের ॥

তাঁর জীবনের ঐ শেষ আর বিষণ্ণতম বছরগুলোতে সেবাস্তিয়ান লিখেছিলেন তাঁর বই 'মৃত্যুপারের পুষ্প'।

বইটার বিষয়বস্তু খুব সোজা। একটা মানুষ মরছে। গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত গোটা বইটার একটাই মাত্র ঘটনা। একটা মানুষের অবসান হয়ে আসছে ধীরে ধীরে। তারই চিন্তা আর স্মৃতি গোটা বইটা ছেয়ে রয়েছে।

লেখকের কথায় ব্যঞ্জনা আরোপের অবিশ্বাস্য ক্ষমতায় আমরা যেন বিশ্বাস করে ফেলি, তিনি মৃত্যুর সত্যকে জানেন আর সেই সত্যটাকে ঘোষণা করতে যাচ্ছেন।

সেবাস্তিয়ানের শ্রেষ্ঠ রচনাটার পাতা ওল্‌টাতে ওল্‌টাতে আমার মনে হয় এর কোথাও না কোথাও চরম সমাধানটা যেন লুকিয়ে রয়েছে। বড্ড তাড়াতাড়ি পড়েছি বলে ধরতে পারিনি; কিংবা

অতিপরিচিতের ছদ্মবেশ-পরা কতকগুলো কথার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে। আমি এমন আর কোনো বই পড়িনি যা পড়ে আমার ঠিক এই ধরনের অনুভূতি হয়। হয়তো রচয়িতার লেখার উদ্দেশ্যই ছিল এই।

'মৃত্যুপারের পুষ্প' বইটার অনেক সমালোচনা বেরুলো। এদের বেশীরভাগ পরিসরে বেশ বড় ও প্রশংসাপূর্ণ। কিন্তু এগুলির মধ্যে এখানে ওখানে একটা ইঙ্গিত বরাবরই উঁকি মেরেছে। লেখক পরিশ্রান্ত, অর্থাৎ রচনাটা কোনো বৃদ্ধের ক্লান্তিকর বাগাড়ম্বর—এই কথাটাই নানান রকমফেরে সমালোচনাগুলোতে উঁকি মেরেছে। এই মন্তব্যের মধ্যে আমি একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ধরতে পারি, যেন ওরা লেখক সম্বন্ধে এমন কিছু ট্র্যাজিক ব্যাপার জানেন যা বইয়ে নাই কিন্তু আড়াল থেকে এই সমালোচকদের দৃষ্টিভঙ্গীকে প্রভাবিত করেছে। একজন সমালোচক এতোদূর পর্যন্ত বলেছেন যে, তিনি বইটা পড়েছেন "মিশ্রিত অনুভবে, কারণ পাঠকের পক্ষে মৃত্যুশয্যার পাশে বসে থাকা আর লেখক ডাক্তার না রোগী তা ঠিক বুঝতে না পারা—একটা বেয়াড়া অভিজ্ঞতা।" প্রায় সব সমালোচনাগুলোতেই বোঝানো হয়েছে যে, বইটা একটু বেশীমাত্রায় বড়, অনেক অনুচ্ছেদ অর্থের দিক থেকে ঘোলাটে এবং ঘোলাটে বলেই বিরক্তিকর। সকলেই সেবাস্তিয়ানের অকপটতার প্রশংসা করেছেন, জানি না কোন্ অর্থে! ভাবছিলেম, সেবাস্তিয়ানের নিজের এই সমালোচনাগুলো কেমন লেগেছিল।

এই বইয়ের আমার কপিটা আমি এক বন্ধুকে পড়তে দিয়েছিলেম। সে বেশ কয়েক সপ্তাহ না পড়ে ফেলে রেখে একদিন এক ট্রেনে সেটাকে হারিয়ে ফেললে। পরে অন্য একটা কপি যোগাড় করেছিলেম কিন্তু এটা আর কাউকে পড়তে দিইনি। সত্যি কথা বলতে, তাঁর সব বইয়ের মধ্যে এটাই আমার সবচেয়ে প্রিয় বই।

॥ আঠার ॥

১৯৩৫-এর বসন্তকালে 'মৃত্যুপারের পুষ্প' বইটার প্রকাশ আর নিনার সঙ্গে তাঁর শেষ সাক্ষাৎকারের চেষ্টা এ দু'টো ঘটনা একই সঙ্গে ঘটেছিল।

যেদিন নিনার চ্যাংড়া ও চুলের বাহারওলা তরুণ ভক্তদের মধ্যে কেউ একজন সেবাস্তিয়ানের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে জানাল যে, নিনা তাঁর কবল থেকে মুক্ত হতে চাইছেন, সেদিন তিনি লণ্ডনে ফিরে এলেন ও ফিরে এসে কয়েকমাস কাটালেন সেখানে। এই সময়ে নিজের একাকীত্ব এড়াবার জন্যে সামাজিক মেলামেশায় নামলেন। তাঁকে এখানে ওখানে দেখা যেতো ; পাত্‌লা শরীর, নীরব একটা বিষাদের মূর্তি, একখানা বড় রুমাল দিয়ে গলা জড়ানো। ডাইনিং রুম যতই গরম থাক্ না কেন রুমাল দিয়ে তাঁর গলা জড়ানো থাকতোই। নিজের অন্যমনস্কতায় গৃহস্বামীকে যারপরনাই উত্যক্ত করে তুলতেন। নিজের আত্মমগ্নতা থেকে কিছুতেই বেরিয়ে আসতে চাইতেন না। পার্টি চলতে চলতে তার মাঝখানে হঠাৎ উঠে চলে আসতেন ; তারপর হয়তো দেখা যেতো তিনি কোনো নার্সারিতে বসে কয়েক টুক্‌রো কাগজ হাতে জুড়ে জুড়ে ছবি তৈরীর কোনো হেঁয়ালি ভেদ করার চেষ্টা করছেন। একদিন হেলেন প্র্যাট চেয়ারিং ক্রসের কাছে ক্লেয়ারকে একটা বইয়ের দোকানে ঢুকিয়ে দিয়ে কয়েক মুহূর্ত পরে যেই নিজের পথ ধরে চলতে আরম্ভ করেছেন অমনি মুখোমুখি সেবাস্তিয়ানের। কুমারী প্র্যাটের সঙ্গে হ্যাণ্ড শেক্ করার সময় তাঁর মুখখানার রঙ্ ঈষৎ লাল হয়ে উঠ্‌ল। এর পর তিনি মিস্ প্র্যাটকে আন্‌ডার গ্রাউন্‌ড্ স্টেশনটা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। কুমারী প্র্যাট মনে মনে ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিলেন সেবাস্তিয়ান আর এক মিনিট

আগে আবির্ভূত হননি বলে। উনি অতীতের কথা একেবারেই উল্লেখ করলেন না বলে মিস্ প্র্যাট ভাগ্যের কাছে যেন কৃতজ্ঞ হয়ে পড়লেন। সেবাস্তিয়ান অতীতের কথা না বলে ফেনিয়ে ফেনিয়ে একটা গল্প বললেন—কেমন করে ছু'জন লোক গতরাত্রে পোকার খেলায় তাঁকে ঠকাবার চেষ্টা করেছিল।

বিদায় নেবার সময় উনি বললেন, "খুব সুখী হলেম আপনার সঙ্গে দেখা হোলো বলে। বোধহয় আমি ওটা এখনই পাবো!"

জিজ্ঞাসা করেন মিস্ প্র্যাট: "কী পাবেন?"

"আমি ওখানেই (তিনি বইয়ের দোকানটার নাম করলেন) যাচ্ছিলেম—কিন্তু দেখছি আমি যা চাইছি তা এই স্টলটাতেই পেয়ে যাবো।"

এই সময় প্রায়ই থিয়েটার ও কনসার্টে যেতেন। মাঝরাতে কফি স্টলে ট্যাক্সি ড্রাইভারদের ভিড়ে দাঁড়িয়ে গরম ছুধ খেতেন। লোকে বলেছে একটা ফিল্ম তিনি তিনতিনবার দেখতে গেছেন।

ফিল্মটার নাম 'মন্ত্রমুগ্ধ বাগান'—একটা বাজে খেলো ফিল্ম। তাঁর মৃত্যুর মাস ছুয়েক পরে যখন মাদাম লেসের্ফ-এর আসল পরিচয়টা পেলেম, তার ক'দিন পরে আমি ঐ ফিল্মটাকে একটা ফরাসী সিনেমা হলে আবিষ্কার করলেম। ফিল্মটার গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত দেখলেম। কী ছিল এই ফিল্ম্টায় যে এটা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল? ফিল্মের মাঝামাঝি কাহিনীটা চলে এল 'রিভিয়েরায়'—এখানে যারা সমুদ্র স্নান সেরে রোদ পোয়াচ্ছিল চকিতে তাদিকে দেখা গেল। এদের মধ্যে কি নিনা ছিল? ওর খোলা কাঁধটা কি চকিতে দেখা গেল? মনে হোলো যে মেয়েটা ঘাড় ঘুরিয়ে ক্যামেরার দিকে চেয়ে দেখলে, তার সঙ্গে বুঝি নিনার মিল আছে। কিন্তু চক্চকে ঘামের প্রলেপ, রোদে-পোড়া তামাটে রঙ্ আর চোখের ওপর রোদ্দুর আড়াল-করা ঢাকা, এগুলো সবাই মিলে এক দিনের চকিতে দেখা মুখের ভোল পালটে দিতে যথেষ্ট। আগস্টে এক সপ্তাহ তিনি

খুবই অসুস্থ হ'য়ে পড়লেন। কিন্তু শয্যা নিতে রাজী হলেন না। যদিও ডাক্তার [ডাঃ ওটস্] সেই রকমই নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১৯৩৫-এর বেশীর ভাগ সময় আমি আমার কোম্পানির কাজের প্রয়োজনে মার্সাইয়ে কাটিয়েছিলেম। ১৯৩৬-এর জানুয়ারির মাঝামাঝি সেবাস্তিয়ানের চিঠি পেলেম। অবাক্ কাণ্ড! চিঠিটা রুশ ভাষায় লেখা।

"বুঝতেই পারছো, আমি এখন প্যারিসে, এখানেই সম্ভবতঃ কিছুকাল স্থির হয়ে থাকবো। যদি পারো তো একবার এসো; না পারলেও আমি কিছু মনে করবো না। তবে, তুমি এলেই ভালো হোতো, কতকগুলো জটিল ব্যাপার নিয়ে হাঁফিয়ে উঠেছি; বিশেষ করে—সাপের খোলসের মতো ছেড়ে-ফেলা অতীতের কতকগুলো চিত্রবিচিত্র খোলস নিয়ে। ফলে, যে কোনো কারণেই হোক সারাজীবন ধরে যে সব অতি সাধারণ মামুলী জিনিসকে উপেক্ষা করে এসেছি আজ আমি তাদেরই মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজছি। যেমন ধরো, আজ আমার জানতে ইচ্ছা করছে এই ক' বছর তুমি কী করছিলে, ইচ্ছে করছে তোমাকে আমার কথা কিছু বলি। আশা করি তুমি আমার চেয়ে বেশী সাকসেস্‌ফুল হয়েছো। আজকাল বুড়ো ডাঃ স্তারভের সঙ্গে প্রায়ই দেখা করছি। ঐ যে ডাঃ স্তারভ মামণির চিকিৎসা করেছিলেন (সেবাস্তিয়ান আমার মাকে মামণি বলে ডাকতেন)। একদিন রাত্রে কারো একখানা পার্ক-করা গাড়ীর ফুট বোর্ডে বিশ্রাম নিতে বসে পড়তে বাধ্য হয়েছি এমন সময় পথে ওঁর সঙ্গে আমার হঠাৎ দেখা। কথাবার্তায় মনে হোলো উনি ভেবেছিলেন মামণির মৃত্যুর পর থেকে আমি বুঝি প্যারিসে গেঁজে যাচ্ছিলেম। আমি অবশ্য তাঁর এই ধারণাকে ভাঙলেম না; কী হবে বিশদ বিবরণ দিয়ে? সে বড় জটিল ব্যাপার। কোনোদিন তোমার হাতে কিছু কাগজপত্র এসে পড়তে পারে: পেলে সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো পুড়িয়ে ফেলো। সেগুলো দৈবাদেশ শুনেছে···(দু' একটা কথার

পাঠোদ্ধার করা গেল না) তাই এবার সেগুলোকে আগুনে পুড়ে মরতে হবে। আমি সেগুলোকে রেখে দিয়েছিলেম: রাত্রির মতো আশ্রয় দিয়েছিলেম। এ ধরনের জিনিসগুলোকে ঘুমুতে দেওয়াই ভালো, কারণ মেরে ফেললে ওরা ভূত হয়ে আমাদের পিছু নেবে। এক রাত্রে কোনো মুহূর্তে নিজেকে আমার অত্যন্ত ক্ষণভঙ্গুর মনে হোলো, তাই সেই মুহূর্তে ওদের মৃত্যু পরোয়ানায় সই করলেম। এই পরোয়ানা দিয়েই তুমি সেগুলোকে চিনতে পারবে।

"আমি আমার পুরোনো হোটেলেই বাস করছিলেম। এবার সেটা ছেড়ে শহরের বাইরে স্যানাটোরিয়াম ধরনের একটা জায়গায় উঠে এসেছি। ঠিকানাটা টুকে নিয়ো। এই চিঠিখানা লিখতে শুরু করেছিলেম প্রায় সপ্তাহ খানেক আগে: আর 'জীবন' এই কথাটা পর্যন্ত লিখেছিলেম অন্য আর একজনকে উদ্দেশ্য করে। তারপর যেন কী করে এই চিঠিখানা তোমার দিকে ঘুরে গেল, যেমন অপরিচিত বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে কোনো লাজুক ব্যক্তি নিমন্ত্রিতদের মধ্যে চেনা কোনো আত্মীয়ের সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে আলাপ জুড়ে দেয়। তাই বলি আমার এই বক্‌বকানি তোমার কাছে উট্‌কো উৎপাতের মতো মনে হলেও—তুমি যেন ত্রুটি ধরো না। আমার এই জানালা দিয়ে দেখতে পাচ্ছি—ঐ যে: বড় ন্যাড়া ডালগুলো তার ছোটো ছোটো ডাল ছড়িয়ে রয়েছে ওগুলোকে দেখতে আমার মোটেই ভাল লাগছে না।"

এই চিঠিখানা পেয়ে আমি ঘাব্‌ড়ে গেলেম। যাবারই কথা। কিন্তু যতটা বিচলিত হওয়া উচিত ছিল ততটা বিচলিত হলেম না। আমি জানতেম না যে ১৯২৬ থেকে সেবাস্তিয়ান কী এক দুরারোগ্য রোগে ভুগছিলেন এবং এই রোগটা গত পাঁচ বছর ধরে ক্রমশঃ মন্দের দিকে এগোচ্ছিল। বলতে লজ্জা, তবু আমি স্বীকার করছি যে, আমার একটা ধারণার ফলে যে উদ্‌বেগটা আমার হওয়া উচিত ছিল তা অনেকটা স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। আমার ধারণা ছিল

সেবাস্তিয়ান স্বভাবতঃই প্রখর স্নায়ুর লোক বলে স্বাস্থ্য মন্দের দিকে ঝুঁকলেই মাত্রাতিরিক্ত নৈরাশ্যে পড়ে যেতেন। আবার বলছি, আমি তাঁর হৃদ্‌রোগ সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও জানতেম না। তাই নিজেকে স্তোকবাক্য দিলেম যে, তিনি যেটুকু ভুগছেন তা তাঁর মাত্রাতিরিক্ত পরিশ্রমের ফলেই। যাই হোক তিনি অসুস্থ এবং আমাকে যেতে বলেছেন; এবং বলেছেন এমন এক স্বরে যে স্বর আমার আছে অভাবিতপূর্ব। মনে হয়েছিল আমাকে তাঁর কোনোদিনই প্রয়োজন হবে না, কিন্তু এখন দেখছি তিনি এ টুকুর জন্যেই অনুনয় করছেন। আমি বিচলিত হলেম, আর বিভ্রান্তও হলেম। যদি আমি তাঁর প্রকৃত অবস্থাটা জানতেম তাহলে নিশ্চয়ই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে গিয়ে প্রথম ট্রেনটাই ধরতেম। চিঠি পেলেম বৃহস্পতিবারে, পেয়েই স্থির করে ফেললেম শনিবারে প্যারিস যাবো। যেন রবিবারেই ফিরে আসতে পারি, কারণ অনুমান করলেম যে, মার্সাইয়ে কোম্পানির যে কাজের তদারকের জন্যে থাকা, সেই কাজটার অবস্থাটা এখন এমন পর্যায়ে এসে গেছে যে, আমার ছুটি নেওয়াটা কোম্পানি চাইবে না। স্থির করলেম যে, লিখে এই অবস্থাটার বর্ণনা না করে শনিবারে তাঁকে একখানা টেলিগ্রাম করবো। শনিবারে এই জন্যে যে, কাজের গতিক দেখে শনিবারেই বুঝতে পারবো প্রথম ট্রেনখানা ধরতে পারবো কিনা।

এই রাত্রিতে আমি একটা অস্বাভাবিক উদ্‌বেগের স্বপ্ন দেখলেম। স্বপ্নে দেখলেম আমি একটা প্রকাণ্ড আবছা ঘরে বসে রয়েছি। আমার স্বপ্নের প্রযোজক আমারই অস্পষ্টভাবে জানা বিভিন্ন বাড়ীগুলো থেকে টুকিটাকি সংগ্রহ করে তাড়াহুড়ো করে ঘরটায় সাজিয়ে দিয়েছে। গৃহসজ্জার এখানে ওখানে ত্রুটি রয়ে গেছে। এমন কি সরঞ্জামগুলোর চেহারাতেও ওলট-পালট ঘটে গেছে। যেমন, তাকটা যেখানে, সেখানে শুধু তাকটাই নয় একটা ধুলোভরা পথও রয়েছে। অস্পষ্টভাবে যেন অনুভব করলেম, এই ঘরখানা একটা

গ্রামের বাড়ীর ঘর কিংবা কোনো গ্রামের চটি। যেন মনে হোলো দেওয়াল আরমেঝেটা কাঠের। সেবাস্তিয়ানের জন্যে অপেক্ষা করছি— খুব দূর কোনো জায়গা থেকে যেন ওঁর আসার কথা আছে। আমি একটা ফলের ঝুড়ি বা ঐ রকম কিছু একটার ওপর বসে রয়েছি। ঘরের মধ্যে আমার মাও বসে রয়েছেন। মা ছাড়া আরও কে হু'জন টেবিলে বসে চা খাচ্ছে: আমরাও বসেছি এই টেবিলে। এদের একজন আমার অফিসের লোক আর দ্বিতীয় জন তাঁর স্ত্রী। এদের হু'জনের কাউকেও সেবাস্তিয়ান চিনতেন না। এই স্বপ্নের অদৃশ্য প্রযোজক শুধু স্থান পূরণ করার জন্যে এদেরকে মঞ্চে বসিয়ে দিয়েছেন।

এ এক অস্বস্তিকর অপেক্ষা, অজ্ঞেয় আশংকায় ভারী। মনে হোলো ওরা আমার চেয়ে বেশী জানে। ঘরখানার দরজা পুরো খোলা রয়েছে কিন্তু একটা কাদামাখা সাইকেলকে কাপড়ের ঘরে ঢোকানো যাচ্ছে না এবং এর জন্যে মা নিদারুণ উদ্‌বিগ্ন হচ্ছেন। কিন্তু কেন এই সামান্য ব্যাপারে মা এতো উদ্‌বিগ্ন হচ্ছেন তা মাকে জিজ্ঞাসা করতেও ভয় পাচ্ছিলেম। দেওয়ালে একটা স্টীমারের ছবি, এই ছবির ঢেউগুলো সারিসারি শুঁয়ো পোকার মতো শোভাযাত্রা করে চলেছে; স্টীমারটা যত তুলছে আমি ততই বিরক্ত হচ্ছি। চেয়ে থাকতে থাকতে মনে পড়ল, দূর দেশ থেকে কেউ আসবে এই অপেক্ষায় এমনি একটা ছবি টাঙিয়ে রাখা একটা মামুলী পুরোনো রেওয়াজ। যে কোনো মুহূর্তে তিনি হাজির হতে পারেন। দরজার লাগাও মেঝেতে বালি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যেন তাঁর পা না পিছলায়। কাদামাখা জিনের রেকাব আর জুতোর গোড়ালির নাল গুলো নিয়ে মা উঠে চলে গেলেন, চেষ্টা করেও লুকোতে পারছেন না সেগুলোকে। অস্পষ্ট মানুষের জোড়া মিলিয়ে গেল: দেখলেম ঘরের মধ্যে আমি একা রয়েছি।

উপরের তলায় গ্যালারির একটা দরজা খুলে গেল। সেবাস্তিয়ান আবির্ভূত হলেন, ধীর পদে সিঁড়ি বেয়ে নামতে লাগলেন। সিঁড়িটা

সোজা ঘরের মধ্যে নেমে এসেছে। চুলগুলো উস্‌কোখুস্‌কো, গায়ে কোট নাই। বুঝলেম অনেক দূর থেকে এসেছেন বলেই একটু ঘুমিয়ে নিয়েছেন। প্রত্যেক ধাপে একটু করে থেমে থেমে নামছিলেন। প্রত্যেকবারই পা বাড়ানোর সময় কাঠের রেলিংয়ে হাত রাখছিলেন। হঠাৎ হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে চিৎ হয়ে গড়িয়ে পড়ে গেলেন। মা এর মধ্যে ফিরে এসেছেন। মা ওঁকে উঠতে সাহায্য করলেন। আমার কাছে এগিয়ে এসে সেবাস্তিয়ান হেসে উঠলেন, কিন্তু আমার মনে হোলো উনি যেন কী একটা লজ্জা গোপন করছেন। ওঁর মুখখানা ফ্যাকাসে, কামানো নয়। তবু দেখে মনে হোলো মোটামুটি বেশ খুশী। মা হাতে একটা রূপোর বাটি নিয়ে বসে পড়লেন। যাতে বসলেন তা একটা স্ট্রেচারের মতো কিছু হবে। বসে পড়তেই দু'জন লোক এসে ওঁকে বয়ে নিয়ে গেল। সেবাস্তিয়ান হেসে আমাকে জানালেন, এই লোক দুটো শনিবার শনিবার এই বাড়ীটায় ঘুমোয়। হঠাৎ লক্ষ্য করে দেখি, ওঁর বাঁহাতে একটা কালো গ্লাভস্, এই হাতের আঙুলগুলো কিন্তু নড়ছে না, যেন এ হাতটা—উনি কোনো-দিনই ব্যবহার করেননি। ভীষণ আতঙ্ক হোলো, ভয়ে গা গুলিয়ে উঠ্‌ল, পাছে ঐ হাতটা দিয়ে উনি আমাকে ছুঁয়ে দেন। এবার বুঝতে পারলেম যে ঐ হাতের কব্জিতে যা আঁটা রয়েছে তা একটা নকল হাত। হয়তো আসল হাতটা কোনোদিন অপারেশন করে বাদ দেওয়া হয়েছিল কিংবা ভীষণ কোনো এক্‌সিডেণ্টে খোয়া গেছে। কেন তিনি আবির্ভূত হয়েছেন আর তাঁর আবির্ভাবের গোটা পরিবেশটা কেন এত ছম্‌ছমে তাও যেন বুঝতে পারলেম। উনি হয়তো আমাকে শিউরে উঠতে দেখেছেন কিন্তু কিচ্ছু না বলে আলতোভাবে চায়ে চুমুক দিতে থাকলেন। মা আবার ফিরে এলেন। এক মুহূর্তের জন্যে। সেলাইয়ের অঙ্গুস্তানা ফেলে গিয়েছিলেন সেটা নিতে। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে গেলেন—লোকগুলোর বড় তাড়া। সেবাস্তিয়ান আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন নাপ্‌তেনি এসেছে কিনা। কোথায় একটা ভোজের

নিমন্ত্রণ আছে সেই নিমন্ত্রণে যাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। আমি এই প্রসঙ্গটাকে চাপা দিতে চেষ্টা করলেম। তাঁর এই বিকল হাতখানা আমার অসহ্য হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই সারা ঘরখানা যেন খোঁচাখোঁচা নখ বের-করা। আমারই এক চেনা মেয়ে (অদ্ভুত! মেয়েটা কেমন যেন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে) একটা নাপতেনির চুপড়ি নিয়ে হাজির হোলো। এসেই সেবাস্তিয়ানের সামনে একটা টুলে বসে পড়ল। ও আমাকে দেখতে মানা করলে তবু না দেখে পারলেম না। দেখলেম ও কালো গ্লাভসের বোতাম খুলল, তারপর সেটা আস্তে আস্তে টেনে খুলতে লাগল। গ্লাভস্‌টা যেই খুলে এল অমনি তা টুক্‌রো টুক্‌রো হয়ে গেল। অনেক ছোট্ট ছোট্ট হাত, ইঁদুরের সামনের থাবার মতো—হাল্‌কা বেগুনি রঙের নরম নরম ছোট্ট ছোট্ট একরাশ হাত ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। কালো-পোশাক-পরা মেয়েটা হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। টেবিলের তলায় ও কী করছে দেখার জন্যে হেঁট হলেমঃ দেখি ও ছোট্ট ছোট্ট হাতগুলো কুড়োচ্ছে, কুড়িয়ে কুড়িয়ে একটা ডিসে রাখছে। মাথা তুলে দেখি সেবাস্তিয়ান নাই। আবার যখন হেঁট হলেম তখন দেখি মেয়েটাও নাই। মনে হোলো এই ঘরটায় আর এক মুহূর্তও নয়। কিন্তু, যেই বেরিয়ে যাবার জন্যে ঘরের খিলটা হাতড়ে খুঁজতে শুরু করেছি অমনি পিছন থেকে সেবাস্তিয়ানের গলার স্বর শুনলেম। মনে হোলো তাঁর এই কণ্ঠস্বর অনেক দূরে ভীষণ অন্ধকার একটা কোণ থেকে ভেসে আসছে। চেয়ে দেখি যেখান থেকে ঐ স্বর ভেসে আসছিল সেই জায়গাটা একটা প্রকাণ্ড মরাইয়ে পরিণত হয়ে গেছে আর সেই মরাই থেকে শস্যের কণা স্রোতের মতো বেরিয়ে আসছে। আমার পায়ের কাছে যে ব্যাগটা পড়ে আছে সেটা ফুটো হয়ে গেছে আর সেই ফুটো থেকে দানাগুলো একটা সরু ধারায় বেরিয়ে আসছে। আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলেম না। যে অসহিষ্ণুতা আমার সর্বাঙ্গে দপ্‌দপ্‌ করে ওঁর কথাগুলোকে চাপা দিয়ে ফেলছিল সেই

অসহিষ্ণুতাকে ঝেড়ে ফেলতে অধীর হয়ে উঠ্ছিলেম। আমি জানতেম উনি আমাকেই ডাকছেন আর এমন কিছু বলছেন যা খুবই দরকারী। শুধু তাই নয়, যেন আরও অনেক দরকারী কিছু বলার অঙ্গীকার রয়েছে ওঁর গলার স্বরে। শুধু যে কোণে উনি বসে বা শুয়ে রয়েছেন সেই কোণটাতে আমার যাওয়ার অপেক্ষা মাত্র। ওঁর পায়ের ওপর ভারী ভারী ছালা পড়ে রয়েছে, তাতেই উনি আট্‌কা পড়েছেন। আমি একটু এগিয়ে গেলেম, অমনি তাঁর কণ্ঠ একটা শেষ সনির্বন্ধ অনুনয়ে চীৎকার করে উঠ্‌ল। এই কথাগুলোকে স্বপ্ন থেকে যখন আলাদা করে বের করে আনলেম তখন তাদের কোনো অর্থ হোলো না বটে কিন্তু স্বপ্নের মধ্যে এই কথাগুলোতে এমন একটা চরম মূল্যের গুরুত্ব, দৈত্য প্রমাণ কী একটা ধাঁধাঁর উত্তর দেবার এমন দুর্বার আবেগের অস্থিরতা ছিল যে, এই কথাগুলো শোনবার জন্যে শেষ পর্যন্ত আমাকেই যেতে হোতো যদি ইতিমধ্যে আমি আবার স্বপ্ন থেকে অর্ধেক বেরিয়ে না আসতেম।

জলের নীচে ফ্যাকাসে বালির ওপর ঝক্‌ঝক্ করা যে সাধারণ নুড়িটাকে কাঁধ পর্যন্ত হাত ডুবিয়ে মুঠোতে ধরা যায় সেটা সত্যিই আকাঙ্ক্ষিত মণিটাই বটে যদিও সূর্যের দৈনন্দিন আলোয় শুকিয়ে যেতে যেতে তা সাধারণ একটা নুড়িই হয়ে পড়ে। তাই মনে হোলো যে আগড়ম বাগড়ম কথাগুলো আমার কানে বাজছিল সেগুলো সত্যসত্যই কোনো একটা আশ্চর্য সন্দেশের বিস্তৃত অনুবাদ মাত্র। চিৎ হয়ে শুয়ে যখন বাইরের পথের পরিচিত শব্দগুলো শুনছিলেম, যখন উপর তলায় রাত্রির উপোস ভঙ্গ কালের অবসর বিনোদনের যে সহায়, বেতার প্রচারিত লঘুসংগীত, তা শুনছিলেম তখন কী একটা ভীষণ আতঙ্কের হিমে আমার শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল, আর সঙ্গে সঙ্গেই স্থির করলেম সেবাস্তিয়ানকে জানাবো আমি আজই যাচ্ছি। এক ধরনের নির্বোধ সাধারণ বুদ্ধির প্রেরণায় (এ ধরনের সাধারণ বুদ্ধি অবশ্য আমার বৈশিষ্ট্য নয়) ভাবলেম আমার অফিসের মার্সাই

শাখাকে জিজ্ঞাসা করে দেখি ওঁরা আমাকে ছুটি দিতে পারবেন কিনা। জিজ্ঞাসা করতে গিয়ে জানলেম আমাকে ওঁরা এখন ছাড়তে তো পারবেনই না এমন কি সপ্তাহের শেষের ছুটিতে আমাকে ছাড়তে পারবেন কিনা তাতেও সন্দেহ। শুক্রবারটা কাজের ধ্বস্তাধ্বস্তিতে কেটে গেল। অনেক রাত্রিতে বাড়ী ফিরলেম। দুপুর থেকে একটা টেলিগ্রাম এসে পড়ে ছিল। স্বপ্নের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ইঙ্গিতের ওপর দিনের মোটা মোটা ভাবনার এমনই শাসন যে স্বপ্নের এই কানে কানে বলা ইঙ্গিতকে আমি সম্পূর্ণ বিস্মৃতই হয়ে গেলেম। টেলিগ্রামখানা ছেঁড়ার সময়ও কাজ সম্পর্কিত কোনো সংবাদ আশা করেছিলেম।···

"সেভাস্তিয়ানের অবস্থা নৈরাশ্যজনক, অবিলম্বে চলে আসুন—স্তারভ"। ভাষাটা ফরাসী। সেবাস্তিয়ানের নামে যে 'ভ'টা এসে গেছে তা এই নামের রুশ বানানের অনুকরণে। কী জানি কেন স্নানের ঘরে ঢুকে আয়নার সম্মুখে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেম। তারপর টুপিটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ছুট্তে ছুট্তে সিঁড়ি ভেঙে নেমে এলেম। যখন ষ্টেশনে পৌছলেম তখন বারোটা বাজতে পনের মিনিট। বারোটা দু মিনিটে ট্রেন, আড়াইটেতে প্যারিসে পৌছচ্ছে।

স্টেশনে এসে দেখি সঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট কাটার মতো পয়সা নাই। মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে নিজের মনে ইতস্ততঃ করতে লাগলেম। বাড়ী ফিরে গিয়ে আরও কিছু পয়সা এনে প্যারিস যাবার যে প্লেনটা প্রথমেই পাবো সেটাতেই চলে যাই। কিন্তু এতো কাছের ট্রেনটার লোভ সংবরণ করা গেল না। সবচেয়ে সস্তা সুযোগটাই গ্রহণ করলেম। জীবনে চলার এটাই আমার নিজের ধারা। ট্রেনটা যেই চলতে আরম্ভ করেছে অমনি বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠ্ল—সেবাস্তিয়ানের চিঠিটা তো ডেস্কের মধ্যে ফেলে এসেছি। সেবাস্তিয়ান যে ঠিকানাটা দিয়েছিলেন সেটা তো মনে নাই!

॥ উনিশ ॥

রেলগাড়ীর কামরাটায় যেমন ভিড় সেটা তেমনি অন্ধকার আর গুমোট। তার ওপর সারি সারি পা দিয়ে ঠাসা। জানালার কাচ বেয়ে বৃষ্টির ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে : ফোঁটাগুলো সোজা গড়িয়ে পড়ছে না, থেমে থেমে ইতস্ততঃ করতে করতে ঝাঁকানি দিয়ে দিয়ে ঝরছে। কালো কাচের ওপর কামরার বেগুনি-নীল রাত্রির বাতিটার প্রতিবিম্ব। ট্রেনটা দুলতে দুলতে গোঙাতে গোঙাতে রাত্রি ভেদ করে ছুটে চলেছে। কিছুতেই মনে পড়ছে না, কী নাম স্যানাটোরিয়ামটার। 'ম' দিয়ে আরম্ভ,…'ম' দিয়ে আরম্ভ…'ম' দিয়ে আরম্ভ…হুড়মুড় করে ছোটার একটানা শব্দের মধ্যে চাকার ঘটাংঘট একাকার হয়ে মিলিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরে চাকাগুলো আবার তাদের ছন্দটা পেয়ে গেল। অবশ্য ডঃ স্তারভের কাছ থেকে ঠিকানাটা পেতে পারবো। স্টেশনে পৌছেই তাঁকে টেলিফোন করবো। কার ভারী বুটওয়ালা একটা পা স্বপ্নের ঘোরে আমার দুপায়ের মধ্যে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করলে, তারপর ধীরে ধীরে গুটিয়ে গেল। "আমি যে হোটেলটায় সচরাচর থাকি" বলতে কোন্ হোটেলটাকে বোঝাতে চেয়েছেন সেবাস্তিয়ান ? প্যারিসে এমন কোনো বিশেষ জায়গা আমার মনে পড়ল না যেখানে সেবাস্তিয়ান কোনোদিন থাকতেন। যাক্ স্তারভ জানবেন কোথায় তিনি আছেন। মার্…মান…মাত্…সেখানে ঠিক সময়ে পৌঁছুতে পারবো তো ? আমার এক সহযাত্রী এক জাতের নাক ডাকার চেয়ে আরো আর্তস্বরের আর একজাতের নাক ডাকায় বদল করার সময় তার পাছা দিয়ে আমার পাছাতে একটা ঠেলা দিলে। আমি কি সময়মতো পৌছে তাঁকে জীবন্ত দেখতে পাবো !…পৌঁছনো…জীবন্ত …পৌঁছনো·· আমাকে ওঁর কিছু বলার ছিল…এমন কিছু যার গুরুত্ব

অপরীসীম…। অন্ধকার, দোল খাওয়া কামরাটায় তিল ধারণের জায়গা নাই, নকল মানুষগুলো মানুষের 'ডামি'গুলো—যেন হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। যে স্বপ্নটা দেখেছিলেম সেই স্বপ্নেরই যেন আর একটা টুক্‌রো। মরার আগে তিনি কী বলতে চান আমাকে? কাচের ওপর বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে পট্‌পট্‌ শব্দ করে যেন থুথু পড়ছে। কখনো ঠুং ঠ্যাং আওয়াজ করে পড়ছে। জানালার এক কোণে এক টুক্‌রো ছায়ার মতো এক পরত বরফ জম্‌ল, তারপর মিলিয়ে গেল। সামনে মনে হোলো কোনো দেহে যেন প্রাণ এল ধীরে ধীরে। কাগজের খড় খড় শব্দ হোলো; অন্ধকারে কেউ কিছু চিবোচ্ছে। একটা সিগারেট জ্বলে উঠ্‌ল। আর একটা গোল আগুন একচক্ষু দৈত্যের চোখের মতো আমার দিকে অনিমেষে চেয়ে রইল। সময়ে আমাকে পৌঁছতেই হবে। চিঠিখানা পেয়েই কেন এরোড্রোমে ছুটে গেলেম না? তাহলে এখন তো সেবাস্তিয়ানের কাছে থাকতেম। কী এমন রোগ যাতে তিনি মরছেন? ক্যানসার? য়্যানজাইনা পেকটোরিস? তাঁর মায়ের মতো? ঐ যারা সাধারণ জীবনযাত্রায় ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামায় না তাদেরই একজনের মতো আমিও তাড়াতাড়ি এক করুণাময়, সান্ত্বনাময়, চোখের জলে ঝাপসাদৃষ্টি ঈশ্বরকে সৃষ্টি করে নিয়ে তাঁর কাছে মুহূর্তের তাগিদে তৈরী একটা প্রার্থনা ফিস্‌ ফিস্‌ করে নিবেদন করে বসলেম। আমি যেন সময়মতো পৌঁছই, আমার পৌঁছনো পর্যন্ত তিনি যেন জীবিত থাকেন, আমাকে তাঁর রহস্যময় কথাটা যেন বলে যেতে পারেন। এখন আর বৃষ্টি নাই—বরফ পড়ছে। কাচের ওপর ধূসর রঙের একটা দাড়ির মতো আকার নিয়ে বরফ জমে গেছে। যে লোকটা চিবোচ্ছিল ও সিগারেট খাচ্ছিল সে আবার ঘুমিয়ে পড়েছে। আমার পা দু'টোকে একটু ছড়িয়ে দেবো? কোনো কিছুর ওপর তুলে দেবো? পায়ের বুড়ো আঙুল চিন্‌চিন্‌ করছিল কিন্তু রাত্রিটা শুধু হাড়ে মাসে ঠাসা। কোথায় পা বাড়াবো? আমার গোড়ালি আর পায়ের ডিমের

তলায় একপ্রস্থ কাঠের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলেম কিন্তু তা মিথ্যেই। মার,···মাতামার,···মার···জায়গাটা প্যারিস থেকে কত দূর? ডঃ স্তারভ। আলেকসান্দার আলেকসান্দ্রেভিচ্ স্তারভ। ট্রেনটা পয়েন্টের ওপর দিয়ে 'স্ক্, স্ক্' করে গড়িয়ে গেল যেন ঐ নামের 'একস্' শব্দটাকে বারংবার উচ্চারণ করে। অজানা কোনো একটা স্টেশন। ট্রেনটা থামতে পাশের কামরা থেকে একটা গলার স্বর ভেসে এল—কে একজন একটা ছেদহীন গল্প বলে চলেছে। দরজার পাল্লা সরানোর শব্দ হোলো। কে একজন আমাদের কামরার দরজাটা বাইরে থেকে ঠেলে খুলে নিরাশ হয়ে ফিরে গেল। নিরাশ। অবস্থা নৈরাশ্যজনক। হোপলেশ কণ্ডিশন্। ওখানে আমার সময়ে পৌছতেই হবে। এই ট্রেনটা স্টেশনে স্টেশনে আসছে আর নড়তে চাইছে না। আমার ডানদিকে যে সহযাত্রী সে একবার ফোঁস্ করে দীর্ঘশ্বাস ফেললে, জানালার কাচটা মোছার চেষ্টা করলে, কিন্তু সেটা ঘোলাটেই থেকে গেল। ওধার থেকে শুধু অস্পষ্ট একটা হলদে আলো চুইয়ে এল। ট্রেনটা আবার চলতে শুরু করলে। শিরদাঁড়া টন্‌টন্ করতে শুরু করেছে, হাড়গুলো যেন সীসের মতো শক্ত হয়ে গেছে। চোখ বুজে ঢুলতে চেষ্টা করলেম, কিন্তু দেখি আমার চোখের পাতার কাণায় ছবি ভাসছে—খুব সরু এক গোছা কিরণ অচেনা কোনো ব্যাকটিরিয়ার মতো ভেসে যাচ্ছে, একই কোণ থেকে বারবার বেরিয়ে এসে। এই আলোর ছটার মধ্যে অনেকক্ষণ আগে ছেড়ে-আসা কোনো স্টেশনের একটা বাতির চেহারাটা যেন দেখতে পেলেম। এরপর ভেসে উঠ্‌ল রঙ। একটা হাল্‌কা বেগুনি রঙের মুখ। ঐ মুখে একটা বড় হরিণ চোখ। আস্তে আস্তে আমার দিকে চোখটা ঘুরল। তারপর এক ঝুড়ি ফুল। তারপর সেবাস্তিয়ানের না কামানো থুত্‌নিটা। এই রঙিন ছবি-দেখানোর বাক্সটার মধ্যে আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল। তাই মন্থরগতি চলচ্চিত্রে ব্যালে নাচিয়ের পায়ের ছাঁদের মতো নানাভঙ্গীর ধীর সন্তর্পণ পা ফেলে

ফেলে পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে এই বাক্সটা থেকে বেরিয়ে এলেম করিডরে। করিডরে উজ্জ্বল আলো কিন্তু করিডরটা ঠাণ্ডা হিম। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে সিগারেট খেলেম, তারপর টলতে টলতে এগিয়ে গেলেম গাড়ীটার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত। ট্রেনের মেঝেতে একটা গর্জন-ভরা নোংরা গর্তের মধ্যে পড়তে পড়তে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার একটা সিগারেট ধরালেম। আজ যেমন তীব্র ভাবে সেবাস্তিয়ানকে জীবিত দেখতে চাইছিলেম তেমন তীব্রভাবে জীবনে কোনো কিছু কোনোদিন চাইনি। চাইছিলেম তাঁর ওপর ঝুঁকে পড়ে তাঁর শেষ কথাগুলো শুনে নিতে। তাঁর শেষ বই, আমার সেদিনের সেই স্বপ্নটা, তাঁর চিঠির রহস্যময় ইঙ্গিত—সব মিলিয়ে আমার এই বিশ্বাস জন্মাল যে, তাঁর মুখ থেকে অসাধারণ কোনো বাণী বুঝি স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে বেরিয়ে আসবে। গিয়ে যেন দেখি সেই মুখে এখনো ঠোঁটদুটো নড়ছে। যেন বেশী দেরি না হয়ে যায়। গাড়ীর দেওয়ালে দুটো জানালার মাঝখানে একখানা ম্যাপ রয়েছে কিন্তু সেই ম্যাপে আমার এই যাত্রাপথের কোনো হদিস নাই। জানালার কাচে আমার মুখের একটি কালো ছায়া পড়েছে। 'ইলে দাঁজেরু', 'এ পেরিকোলোসো'··· ফরাসী ও ইতালিয়ান ভাষায় এই দুটো কথা ভেসে এল মনে···মানে বিপজ্জনক···। রক্তচক্ষু একজন সৈনিক আমার গা ঘেঁষে চলে গেল, ওর জামার হাতায় আমার হাতের চামড়া ঘষে গেল···কয়েক মুহূর্তের জন্যে হাতের সেই জায়গায় চামড়া দপ্‌দপ্‌ করতে লাগল। মনে হোলো আমার গা থেকে স্থূল এই পৃথিবীর ছাপটাকে ধুয়ে মুছে পবিত্রতার দীপ্তি নিয়ে সেবাস্তিয়ানের সম্মুখে হাজির হই। উনি এতক্ষণ মরণের ভাঙনটা পেরিয়ে গেছেন। এখন ওঁর নাকে আমার গায়ের গন্ধ আর প্রবেশ করবে না। না, না, ওঁকে আমি জীবিত দেখবো। স্তারভ যদি নিশ্চিত জানতেন যে, আমার পৌঁছতে দেরি হবে তাহলে নিশ্চয়ই টেলিগ্রামখানা এ ভাষায় লিখতেন না। মন্দ ভাগ্য। টেলিগ্রামটা পৌঁছেছে দুপুরে—ষোল ঘণ্টা ইতিমধ্যে পেরিয়ে

গেছে ; কখন পৌঁছব সেই 'মার' বা 'মাত' বা 'র‍্যাম' বা 'র‍্যাত' না, না, 'র' হবে কেন ? জায়গাটার নামের আগে 'ম' আছে। এক নিমেষের জন্যে ঐ নামটার একটা অস্পষ্ট ছায়া ভেসে উঠলো চোখে, কিন্তু মন দিয়ে তাকে ধরবার আগেই তা মিলিয়ে গেল। তাছাড়া আরও একটা অসুবিধেও তো হতে পারতো ? টাকার অসুবিধে ? স্টেশন থেকে অফিসে ছুটতে হতে পারে কিছু টাকা যোগাড় করার জন্যে। অফিস অবশ্য খুবই কাছে। ব্যাঙ্কটা একটু দূরে। আচ্ছা ভেবে দেখি আমার অসংখ্য পরিচিত বন্ধুদের কেউ কি স্টেশনের কাছে থাকে ? না, এদের সবাই থাকে হয় পাসী'তে কিংবা পোৎ´ছ্য সাঁৎ ক্লুতে প্যারিসের ছুটো রুশ অঞ্চলে। তৃতীয় সিগারেটটাকে ঘষে নিভিয়ে কম-ভিড়ওলা একটা কামরার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লেম। ভাগ্য ভালো আমার সঙ্গে কোনো মালপত্র ছিল না, তা না হলে আগের কামরাটাতেই থেকে যেতে হোতো। কিন্তু গোটা গাড়ীটা মানুষে ঠাসা। তা ছাড়া মন এতোই নিরুৎসাহ যে, ট্রেনটা ঢুঁড়ে বেড়াতে ইচ্ছে হোলো না। ঠিক বুঝতেও পারলেম না যে, যে কামরাটাতে হাতড়ে হাতড়ে ঢুকলেম সেটা আমার সেই পুরোনো কামরা বা নতুন আর একটা। এটাতেও সেই হাঁটু আর পা আর কনুইয়ের ভিড় এবং হাওয়াতে বোধ করি আগেকারটার চাইতে একটু কম ঘামের গন্ধ। লণ্ডনে কেন কখনো সেবাস্তিয়ানের সঙ্গে দেখা করিনি? উনি তো কয়েকবার আমাকে যেতে লিখেছিলেন। আমি কেন গোঁ ধরে ওঁর কাছ থেকে দূরে ছিলেম। অথচ ঐ মানুষ-টাকেই আমি সব মানুষের চেয়ে বেশী শ্রদ্ধা করতেম। যে সব নির্বোধ গাধারা তাঁর প্রতিভাকে উপহাস করতো···বিশেষ করে একজন বুড়োকে জানি···ওর কোঁচকানো-চামড়া ঘাড়টাকে যদি পারতেম মুচড়ে ভেঙে দিতেম মনে মনে রাগে গরগর করতে করতে ভাবলেম। আর ঐযে একটা ভারী না-মানুষ না-প্রাণী আমার বাঁয়ে গড়াচ্ছে, ও একটা স্ত্রীলোক। 'ওডিকলোন' আর ঘাম এ

ছুটোর গন্ধ পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করছে, কে জিতবে তার লড়াই। প্রথমটাই হারল। এই গাড়ীর একটা মানুষও জানেনা সেবাস্তিয়ানের নাইটকে। 'হারানো সম্পদ' বইয়ের সেই আশ্চর্য পরিচ্ছেদটার কী যাচ্ছেতাই অনুবাদ হয়েছে 'কাদরান' কাগজে,। 'কাদরান' কাগজ-টায় না 'লা ভী লিতেরের' কাগজে সঠিক মনে পড়ছে না। হয়তো আমার খুব খুব দেরি হয়ে গেছে—সেবাস্তিয়ান হয়তো ইতিমধ্যে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন আর আমি পাতলা চামড়ার নামমাত্র কুশনে ঢাকা এই অভিশপ্ত বেঞ্চটাতে বসে অস্বস্তিতে কাতরাচ্ছি। চলো, চলো, তাড়াতাড়ি চলো। এই স্টেশনটাতে কী আছে যে থামতে হবে? আর থামবেই যদি তো এতক্ষণ থামা কেন? চলো, চলো হ্যাঁ, এইতো!

ধীরে ধীরে অন্ধকার পাতলা হয়ে ধোঁয়াশায় পরিণত হোলো। আর, জানালার মধ্যদিয়ে একটা বরফে ঢাকা জগৎ অস্পষ্ট রূপরেখা নিয়ে দৃষ্টি পথে হাজির হোলো। আমার রেন কোটটা খুব পাতলা, তাই ভয়ানক শীত করে উঠল। আমার সহযাত্রীদের মুখগুলো ক্রমশঃ পরিষ্কার হয়ে উঠতে লাগল, যেন ওদের মুখ থেকে মাকড়সার জাল আর ধুলোবালির প্রলেপ কে যেন ব্রাশ চালিয়ে চালিয়ে সরিয়ে দিচ্ছিল। আমার পাশের মহিলার হাতে একটা কফিভরা থারমো ফ্লাস্ক; এটাকে সে যেন মাতৃস্নেহে পরম স্নেহভরে নাড়াচাড়া করছে। সমস্ত গাটা কেমন রিরি করে উঠল। গালে দাড়িটা শিরশির করছে। যন্ত্রণা হচ্ছে অসহ্য যন্ত্রণা। মনে হোলো আমার এই খোঁচা খোঁচা দাড়িতে যদি কোনো রকমে সাটিনের ঘষা লাগে তাহলে নির্ঘাৎ অজ্ঞান হয়ে যাবো। কয়েক খণ্ড বিবর্ণ মেঘ; এর মধ্যে এক খণ্ডের রঙ চামড়ার রঙের মতো। সাদা মরুভূমির মতো মাঠের শোকস্তব্ধ নির্জনতার মধ্যে গলতে-শুরু-করা বরফের গালে ম্লান গোলাপী আভা। একটা রাস্তা কোথা থেকে বেরিয়ে পড়ে কয়েক মিনিট ধরে ট্রেনটার সঙ্গে সঙ্গে সরসর করে এগিয়ে চললো। আর ঠিক যেই এই পথটা

একটা বাঁকে ঘুরে গেল, অমনি দেখি একটা লোক সাইকেলে চড়ে বরফ আর কাদা আর ঝিলের ওপর দিয়ে টাল খেতে খেতে চলেছে। কোথায় যায় ও ? কে ও ? কেউ জানবে না কোনোদিন।

মনে হয় ঘণ্টাখানেক বা ঐ রকম, আমি বসে বসে ঢুলেছি কিংবা ঐ সময়টাতে আমি আমার ভিতরের চোখ তুটো বুজে ছিলেম। যখন চোখ মেললেম তখন দেখি আমার সহযাত্রীরা কলরব করছে, হামহাম করে খাচ্ছে। এ সব দেখে আমার ভিতরটা এমন গুলিয়ে উঠল যে, আমি কোনো রকমে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়লেম, বেরিয়ে পড়ে বাকী সময়টা গাড়ীর গায়ে তাকের মতো লাগানো একটা সীটে বসে কাটিয়ে দিলেম। মনটা ফাঁকা হয়ে গেল এই অভিশপ্ত সকালটার মতো। জানলেম ট্রেনটা খুব লেট্ করেছে, রাত্রিতে তুষার ঝড় বা ঐ রকম কিছু একটার জন্যে। তাই যখন প্যারিস পৌছলেম তখন বিকেল পৌনে চারটে বেজে গেল। যেই প্লাটফর্মে নামলেম অমনি ঠাণ্ডায় আমার দাঁতে দাঁত লেগে গেল। মুহূর্তের জন্য পকেটে যে তু'এক আনা পয়সা ঝম্ঝম্ করছিল তাই দিয়ে কোনো কড়া মদ কেনার একটা নির্বোধ ইচ্ছা জাগল কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে। এ রকম কিছু না করে টেলিফোন বুথে ঢুকে পড়লেম। আমার তেলচিটে নোট বইটার পাতা উল্‌টে উল্‌টে ডঃ স্তারভের ঠিকানা খুঁজতে লাগলেম—সেবাস্তিয়ান এখনো জীবিত আছেন কিনা এই ভাবনাটা মনের ভেতর ঠেলে সরিয়ে রেখে দিয়ে। স্তার কাউস··· পাত্‌লা ও পুরু চামড়ার ব্যবসায়ী··· ; স্তারলে, যাতুকর, হিউমারিস্ট এইতো স্তারভ···'যুঁইফুল 61-93'। কয়েকবার ডয়োল করে হয়রান হয়ে গেলেম। মধ্যিখানে এসে নম্বরটা ভুলে গেলেম। আবার নোট বইটা নিয়ে ধ্বস্তাধ্বস্তি, তারপর আবার ডায়াল করা। ডায়াল করে কিছুক্ষণ কান পেতে রইলেম : শুধু গোঁ গোঁ শব্দই উঠছে। মিনিট-খানেক চুপ করে বসে রইলেম। কে একজন দরজাটা তু'ম করে ঠেলে খুলে দিয়ে রাগে বিড় বিড় করতে করতে পিছিয়ে গেল। নম্বরটা

ম্যাপের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল। তাতেও হোলো না। ড্রাইভার তার নিজের ম্যাপ বের করে আনলো। দু'জনে ম্যাপদু'টো মেলাতে বসল। কোথাও আমরা একটা ভুল বাঁক নিয়ে ফেলেছি, এখন অন্ততঃ মাইল দু'য়েক পিছিয়ে যেতে হবে।, আমি আবার কাচে টোকা দিলেম। ট্যাক্সি যেন হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে। ড্রাইভার শুধু মাথা নাড়লে আমার দিকে, ঘাড় ঘোরানোরও প্রয়োজন বোধ করলে না। হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখি প্রায় সাতটা বাজতে চলেছে। তেল নেবার জন্যে একটা পেট্রোল ডিপোতে দাঁড়ালেম। ডিপোর লোকটার সঙ্গে ড্রাইভারের কী একটা গোপনীয় কথা ছিল সেটা সে এই ফাঁকে সেরে নিলে। কোথায় এসেছি বুঝতে পারছিলেম না। কিন্তু রাস্তাটা এবার প্রকাণ্ড বড় মাঠের কোল ঘেঁষে চলেছে, দেখে বুঝলেম আর বেশীদূর নয়। বৃষ্টি নামল। গাড়ীর জানালার গায়ে বৃষ্টির ছাট পড়তে লাগল সশব্দে। ধুয়ে যেতে লাগল। ড্রাইভারকে আবার যেই বললেম আরো একটু জোরে চালাতে অমনি তার মেজাজ বিগড়ে গেল এবং যা উত্তর দিল তা বেশ রূঢ়। সীটের মধ্যে ডুবে বসে নিজেকে মনে হোলো অবশ, অসহায়। কাচের ওপর জলের পর্দার ভিতর দিয়ে দেখতে পাচ্ছি আলোকিত জানালার ভাঙা চোরা দৃষ্টি ছুটে চলেছে পিছনে। সেবাস্তিয়ানের কাছে কি পৌঁছতে পারবো? যদি বা 'স্যাঁৎ দামিয়ে'তে পৌঁছে যাই, সেবাস্তিয়ানকে কী জীবিত দেখতে পাবো? দু'একবার অন্য গাড়ী আমাদিকে ওভার টেক করে চলে গেল। আমি ড্রাইভারকে দেখতে বললেম, ওরা তো আরও জোরে চলেছে। ও কিছু উত্তর দিলে না—হঠাৎ থেমে গিয়ে বিরক্তিতে ফেটে পড়ে, তার অপদার্থ ম্যাপটা খুলে বসলে। জিজ্ঞাসা করলেম আবার ভুল রাস্তায় এসেছি কিনা। চুপ করে রইলেম। ওর মোটা ঘাড়ের দিকে চেয়ে মনে হোলো, ঘাড়টা যেন কোনো আসামীর। আবার চলতে শুরু করলেম। খুশী হয়ে লক্ষ্য করলেম ও এবার বেশ জোরে চলেছে। একটা রেলওয়ে ব্রীজের নীচে দিয়ে গিয়ে একটা

স্টেশনের মুখে এসে ঘঁ্যাচ্ করে গাড়ী থামল। মনে মনে ভাবছি এটাই কি 'স্যাঁং দামিয়ে'? ড্রাইভার তার সীট থেকে বেরিয়ে এসে আমার দিকের দরজাটি হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলে দাঁড়াল? কী ব্যাপার?

বললে, "আপনাকে ট্রেনেই যেতে হবে এবার। আপনার জন্যে তো আমার গাড়ীর বারোটা বাজাতে পারবো না। এই লাইনটা 'দামিয়ে' গেছে। আপনার ভাগ্য ভালো, আপনাকে এখান পর্যন্ত পৌঁছে দিলেম।"

ও আমাকে যতটা ভাগ্যবান ভেবেছিল তার চেয়ে বেশী ভাগ্যবান ছিলেম বলতে হবে,—কয়েক মিনিটের মধ্যে একটা ট্রেন ছিল। স্টেশন মাস্টারকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি দিব্যি গেলে বললেন ন'টার মধ্যে 'স্যাঁং দামিয়ে'তে নিশ্চয়ই পৌঁছে যাবো। আমার যাত্রার এই শেষ পর্যায়টা সবচেয়ে ভয়ংকর। গাড়ীতে আমি একা। আমার অধৈর্যকে ছাপিয়ে একটা অদ্ভুত জড়তা পেয়ে বসেছে আমাকে। পাছে ঘুমিয়ে পড়ি, পাছে স্টেশনটি ফেলে যাই এই ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি। ট্রেনটা থামছে, আর প্রত্যেকবার অন্ধকারে স্টেশনের নাম উদ্ধার করতে করতে আমি প্রায় অসুস্থ বোধ করছি। একবার মনে হোলো আমি যেন অনেকক্ষণ তন্দ্রায় ডুবেছিলেম আর একটা ঝাঁকুনিতে সেই তন্দ্রাটা ছুটে গেল। এটা মনে উদয় হওয়ামাত্র একটা ভীষণ উদ্‌বেগ অনুভব করলেম। ঘড়িতে চেয়ে দেখি—ন'টা বাজতে পনেরো। ছেড়ে এলেম নাকি? য়্যালার্ম সিগ্‌ন্যালটা টানতে যাই আর কি, এমন সময় বুঝলেম ট্রেনটা থেমে আসছে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখি, আলোর ওপর লেখা একটা নাম পিছনে ভেসে গিয়ে থামল: 'স্যাঁং দামিয়ে'। পনেরো মিনিট ধরে অন্ধকার সরু পথ বেয়ে চলেছি, খস্‌খস্ শব্দ শুনে মনে হচ্ছে যেন পাইন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এগোচ্ছি। শেষে পৌঁছলাম 'স্যাঁং দামিয়ে'-র হাসপাতালে। শুনলেম দরজার ওধারে পা টেনে টেনে চলার শব্দ আর হাঁচি। মোটা বুড়ো একটি লোক দরজা খুলে দিলে।

তার গায়ে কোটের বদলে একটা ছাই রঙের সোয়েটার; পায়ে ছেঁড়া ফেল্টের চটি। যেখানে ঢুকলেম সেটা অফিস ধরনের। একটা ইলেকট্রিক ল্যাম্প মিট্‌মিট্‌ করে জ্বলছে, তার একটা দিক ধুলোয় ঢেকে গেছে। লোকটা মিট্‌মিট্‌ করে আমার দিকে চেয়ে দেখলে। ওর ফোলা ফোলা মুখখানা তেল চট্‌চটে ঘুমঘুম ভাবে চক্‌চক্‌ করছে। কী জানি কেন আমিই প্রথম কথা বললেম। ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে।

বললেম, আমি মঁসিয়ে সেবাস্তিয়ান নাইটকে দেখতে এসেছি। নাইট—কে, এন, আই, জি, এইচ, টি—নাইট। 'নাইট' বা রাত্রির যা উচ্চারণ। ঘোঁৎ ঘোঁৎ আওয়াজ করে ধপ্‌ করে ঝুলন্ত বাতিটার নীচে পাতা লেখার টেবিলটায় বসে পড়ল লোকটা।

যেন নিজের মনে বিড় বিড় করে বললেঃ ভিজিটারদের সময় পেরিয়ে গেছে।

বললেম, "আমি টেলিগ্রাম পেয়েছি, আমার দাদা অসুস্থ।" এমন ভাবে কথা বলছি যেন সেবাস্তিয়ান এখনো জীবিত আছেন তাতে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।

জোরে একটা শ্বাস ফেলে জিজ্ঞাসা করলে, "কী যেন নাম বললেন ?"

" 'নাইট—'কে' দিয়ে আরম্ভ। ইংরেজী নাম।"

লোকটা বিড় বিড় করে বললে, "বিদেশী এই নামগুলোর বদলে সব সময় সংখ্যা ব্যবহার করা উচিত। তাতে ব্যবহারটা সোজা হয়ে যায়। কে একজন রোগী গতরাত্রে মারা গেল, দাঁড়ান, তার নাম ছিল..."

ও হয়তো সেবাস্তিয়ানের নামটা বলবে এই ভীষণ আশঙ্কাটা যেন বিদ্যুতের মতো ছোঁয়ায় আমাকে অসাড় করে দিলে।

তা হলে কি সত্যই আমার দেরি হয়ে গেল ?

মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "আপনি কি বলতে চান... ?" লোকটা সব শুনলে না, মাথা নেড়ে ডেস্‌কের ওপর একটা লেজার খাতা খুলে তার পাতা ওল্‌টাতে আরম্ভ করল।

"না", প্রায় গর্জে উঠল, "ইংরেজ ভদ্রলোক মারাযাননি।

'কে', 'কে', 'কে', নামটা স্মরণ করার চেষ্টা করল। আমি জুগিয়ে দিলেম, "কে, এন, আই, জি…"

ফরাসীতে বললে, "আচ্ছা, আচ্ছা, থামুন, 'কে', 'এন', 'কে', 'জি', 'এন…আমি বুদ্ধু নই বুঝলেন! ছত্রিশ নম্বর!"

ঘণ্টাটা বাজিয়ে হাই তুলে একটা আর্ম চেয়ারে ডুবে বসে পড়ল। বেসামাল অধৈর্যে কাঁপতে কাঁপতে আমি ঘরের এদিক থেকে ওদিক পায়চারী করতে লাগলেম। শেষে এক নার্স ঢুক্‌ল, বুড়ো নাইটগার্ড আঙুল বাড়িয়ে তাকে দেখিয়ে দিলে।

নার্সকে বললে, "ছত্রিশ নম্বর।"

সাদা ধব্‌ধবে একটা গলির মতো বারান্দা পেরিয়ে ছোট্ট একটা সিঁড়ি বেয়ে নার্সের পিছু পিছু যাচ্ছি। জিজ্ঞেস না করে পারলেম না, "কেমন আছেন তিনি?"

উত্তর দিলে, "জানি না।" আর, একজন নার্সের কাছে পৌঁছে দিলে। আগের বারান্দার ঠিক অবিকল নকল—আর একটা গলির মতো বারান্দার মুখে ছোট্ট একটা টেবিলে বসে ইনি বই পড়ছিলেন। আমার সঙ্গের নার্স বললে, "ছত্রিশ নম্বর", বলেই কেটে পড়ল। এই নার্স বললেঃ "ইংরেজ ভদ্রলোক ঘুমোচ্ছেন।" চেয়ে দেখি, মেয়েটার মুখখানা গোল—মুখের ওপর খুব ছোট্ট চক্‌চকে একটা নাক বসানো। জিজ্ঞাসা করলেম, "আগের চেয়ে ভাল আছেন তো? দেখুন, আমি ওর ভাই, টেলিগ্রাম পেয়ে এসেছি…"

"মনে হয়, আগের চেয়ে একটু ভালো আছেন", নার্স মৃদু হেসে বললে। মনে হোলো এর চেয়ে মিষ্টি হাসি আমার কল্পনার অতীত। "গতকাল সকালে খুব খারাপ একটা হার্ট য়্যাটাক গেছে এখন ঘুমোচ্ছেন।"

"শুনুন" বলে আমি তাঁর হাতে একটা দশ বা কুড়ি ফ্রাঁ গুঁজে দিলেম। "আমি আবার কাল আসবো, কিন্তু আজ ওঁর কেবিনের

মধ্যে একবার যেতে চাই আর সেখানে অন্ততঃ মিনিট খানেক থাকতে চাই।"

নার্স আবার সেই হাসি হেসে বললে, "কিন্তু, দেখবেন যেন জাগিয়ে দেবেন না।"

"না, না, জাগাবো না। আমি শুধু তাঁর কাছে মিনিট খানেক বসে থাকবো।"

"জানিনে কী কতদূর হবে?" বললে—"একবার অবশ্য উঁকি মেরে দেখতে পারেন, কিন্তু খুব সাবধান!"

আমাকে সঙ্গে করে একটা দরজার কাছে নিয়ে গেল। দরজার গায়ে নম্বর—ছত্রিশ। একটা ছোট্ট ঘরে ঢুকলেম—ঘরে একটা বিছানা। ভেতরের দিকে আর একটা দরজা ভেজানো। নার্স এই দরজা খুব সন্তর্পণে ঠেলে ধরল। এক নিমেষের মতো আমি একটা অন্ধকার ঘরের মধ্যে চেয়ে দেখলেম। প্রথমে আমার কানে যা বাজল তা নিজের বুকের ঢিপ্ ঢিপ্ শব্দ। কিছুক্ষণ পরে ঠাহর করতে পারলাম যে, খুব দ্রুত আর মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাস উঠ্ছে। চোখের দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণ করে চেয়ে দেখলেম—পর্দা বা ঐ রকম কিছু একটা দিয়ে বিছানার অর্ধেকটা ঘেরা। বিছানাটা এমন অন্ধকারে পাতা যে, সেবাস্তিয়ানকে চেনার উপায় নাই। "ঐ যে ঐখানে"—ফিস্‌ফিস্ করে বললে নার্স। "আমি দরজাটা ইঞ্চি খানেক খুলে রেখে দিয়ে যাচ্ছি। আপনি এইখানে ঐ কোচটাতে মিনিট খানেক বসতে পারেন।" একটা নীল ঢাকাওলা আলো জ্বেলে আমাকে বসিয়ে রেখে নার্স চলে গেল। বোধশূন্যভাবে যন্ত্রচালিতের মতো পকেট থেকে একটা সিগারেট কেস বের করে আনার চেষ্টা করলেম। হাত দুটো তখনো কাঁপছিল। তবু আশ্বস্ত অনুভব করলেম। যাক্, উনি জীবিত রয়েছেন। শান্তিতে ঘুমোচ্ছেন। তাহলে হার্টটাই ওঁকে কাবু করে ফেলেছে—ওঁর মায়ের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। আগের চেয়ে একটু ভালো, আশা আছে। ওঁকে বাঁচাবার জন্যে পৃথিবীর

সমস্ত হার্ট স্পেশালিস্টকে নিয়ে আসবো। ঐতো পাশের ঘরে রয়েছেন। ঐ তো মৃদু শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ। আশ্বাস, শান্তি আর, এক ধরনের অদ্ভুত আরাম অনুভব করলেম। ঐ শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দে কান পেতে দু'হাত একত্র করে বসে থাকতে থাকতে মনে পড়ল অতীতের বছরগুলো। যদিও এই বছরগুলোতে আমাদের মধ্যে দেখা হয়েছে খুব অল্পবার এবং তা খুবই অল্প সময়ের জন্য। এখন অন্তরে অন্তরে স্থির করলেম একবার যদি ওঁর শোনার ক্ষমতা ফিরে থাকে, তাহলে আমি ওঁকে বলবো যে, উনি পছন্দ করুন আর নাই করুন, এবার থেকে আর কোনোদিন তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে থাকবো না। যে স্বপ্নটা দেখেছি, যে মহামূল্য সত্যটা তিনি মরার আগে আমাকে বলবেন বলে বিশ্বাস করেছি তারা এখন সব অলীক, ছায়া বলে মনে হোলো। কোনো আরো সহজ, আরো মানবিক অনুভবের উষ্ণ স্রোতে ডুবে গেল। যেন ঐ আধখানা দরজার ওধারে ঘুমন্ত মানুষটার দিকে উপচে পড়া ভালোবাসার ঢেউয়ে নিমজ্জিত হয়ে গেল। ভাবছি, কী করে আমরা পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেম! প্যারিসে আমাদের যখন অল্প সময়ের জন্যে দেখা হোতো তখন সব সময়ই কেন আমি মুখ গোমড়া করে বেকুবের মতো ব্যবহার করেছি? এখন বরং চলে যাই, হোটেলে রাতটা কাটাই। ওরা তো আমাকে এই হাসপাতালেই একটা ঘর দিতে পারতো—যতক্ষণ না ওঁর সঙ্গে দেখা হয়—অন্ততঃ ততক্ষণ পর্যন্ত! নিমেষের জন্যে মনে হোলো ঘুমন্ত মানুষটির শ্বাস-প্রশ্বাসের তালটা যেন হঠাৎ কেটে গেল। মনে হোলো, জেগে উঠছেন, দাঁতে দাঁত ঘষার মৃদু শব্দ করে আবার ঘুমিয়ে পড়তে চলেছেন। আবার শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়মিত শব্দটা শোনা গেল, কিন্তু তা এতো অস্পষ্ট যে ঐ শব্দটা আমি আমার নিজের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দের থেকে আলাদা করতে পারছি না। সুযোগ পেলে আমি ওঁকে কতো কথাই না বলবো। বলবো ওঁর বইগুলো সম্বন্ধে। 'তিনপলা মণি', 'সাফল্য', 'মজার

পাহাড়', 'কালো এলবিনো', 'চাঁদের ওপিঠ', 'হারানো সম্পত্তি' আর 'মৃত্যুপারের পুষ্প' এইসব বইগুলো সম্পর্কে। এই বইগুলো আমার কাছে এতো পরিচিত যে, মনে হয় ওগুলো যেন আমার নিজেরই লেখা। উনিও হয়তো অনেক কথা বলবেন নিজের সম্বন্ধে। ওঁর জীবনের কতটুকুই বা জানি। ঐ যে দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে রয়েছে ঐ দরজাটার ফাঁকটুকুই সবচেয়ে সেরা সংযোগ। সেবাস্তিয়ান সম্পর্কে আগে যা জেনেছিলেম তার চেয়ে যেন অনেক বেশী জানিয়ে দিচ্ছে ঐ ধীর মন্থর শ্বাস-প্রশ্বাস। যদি এখানে বসে সিগারেট খেতে পারতেম তাহলে যেন আমার সুখের ষোলকলা পূর্ণ হোতো। যেই একটু নড়ে বসলেম অমনি কোচের একটা স্প্রিং শব্দ করে উঠল। এই শব্দে ওঁর ঘুম ভেঙে যেতে পারে ভেবে আশঙ্কিত হয়ে উঠলাম। না। ধীর মন্থর শব্দটা অব্যাহত গতিতে বয়ে চলল : যেন একটা সরু পায়ে চলার পথ সময়কে পাক দিয়ে ঘুরে চলেছে ; একবার গহ্বরে নেমে পড়ছে আবার পরমুহূর্তে ওপরে জেগে উঠছে। এই রকম অব্যাহতভাবে এগিয়ে চলেছে একটা বিশেষ ধরনের প্রাকৃতিক অঞ্চলের ওপর দিয়ে। এই অঞ্চলটা নৈঃশব্দ্যের প্রতীক দিয়ে তৈরী—অন্ধকার দিয়ে, ঐ পরদাটা দিয়ে আর আমার কনুইয়ের কাছে যে নীল আলো তার আভাটা দিয়ে।

আমি এবার উঠে পড়লেম। উঠে, পা টিপে টিপে—গলির মতো বারান্দায় চলে এলেম।

নার্স বললে, "ওঁকে জাগিয়ে দেননি তো ? যত ঘুমোবেন ততই ভালো।"

জিজ্ঞাসা করলেম "আচ্ছা বলুন তো, ডঃ স্তারভ কখন আসেন ?"

"কোন্ ডাক্তার ? ও, রাশিয়ান ডাক্তারের কথা বলছেন ? না, ওকে দেখছেন ডঃ গীনে। আপনি তাঁকে কাল সকালে এখানে পাবেন।"

আমি বললেম, "দেখুন কাছাকাছি কোনো জায়গায়—রাতটা কাটাতে চাই। আচ্ছা, এখানে কি ?"

নার্স তার মিষ্টি মিহি স্বরে বলে চলে, "আপনি ডঃ গীনের সঙ্গে এখনই দেখা করতে পারেন। ঐ তো পাশের বাড়ীতে থাকেন। ও, আপনি ওঁর ভাই বুঝি? কাল ইংলণ্ড থেকে ওঁর মা আসছেন, না?"

"মা? মা কী করে আসবেন? তিনি তো কয়েক বছর আগেই মারা গেছেন! আচ্ছা বলুন তো, দিনের বেলায় উনি কেমন থাকেন? কথাবার্তা বলেন? কষ্ট পান?"

ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে নার্স। "কিন্তু", বললে, "আমি বুঝতে পারছি না…আচ্ছা, আপনার নামটা বলবেন?"

"দেখলেন! আমি তো সব খুলে বলিনি। উনি আসলে আমার বৈমাত্রেয় ভাই। আমার নাম (আমার নামটা বললাম)।"

"আহাহাহা…" ডুকরে উঠলেন নার্স। তার মুখখানা টক্‌টকে লাল হয়ে গেল। "হা অদৃষ্ট! রুশ ভদ্রলোক গতকাল মারা গেছেন, আর আপনি যাঁকে দেখছেন তিনি মাঁসিয়ে কোযান।…"

শেষ পর্যন্ত সেবাস্তিয়ানের সঙ্গে আমার দেখা হোলো না। অন্ততঃ জীবিত সেবাস্তিয়ানের সঙ্গে দেখা হোলো না। কিন্তু যে কটা মুহূর্ত আমি ঐ শ্বাস-প্রশ্বাস তাঁর মনে করে কান পেতে ছিলেম ঐ কটা মুহূর্তে আমার জীবন বদলে গেল—। মৃত্যুর আগে সেবাস্তিয়ান আমার সঙ্গে কথা বলে গেলে যেমন বদলে যেতো তেমনি ধারাই বদলে গেল। কী রহস্য—তিনি উদ্‌ঘাটন করে যেতেন জানিনে, কিন্তু একটা রহস্য আমার কাছে স্বতঃই উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। আমরা যাকে আত্মা বলি তা বাঁচার একটা ধরনমাত্র।—একটা স্থায়ী অবস্থা নয়। যে কোনো আত্মাই তোমার হয়ে যেতে পারে যদি তুমি তার দোলাচল ছন্দটা খুঁজে পাও আর তার ছন্দে নিজেকে মিলিয়ে দাও। পরলোকে অস্তিত্বের মানে হয়তো নিজের নির্বাচিত কোনো এক বা একাধিক আত্মার ছন্দে সজ্ঞানে ছন্দ মিলিয়ে বাঁচার সামর্থ্য। আত্মারা জানে না যে, একের ভার অন্যে তুলে নিতে পারে—অর্থাৎ তার ভার বদলাবদলি করে নিতে পারে। অর্থাৎ আমিই

সেবাস্তিয়ানের নাইট। আমি অনুভব করছি আমি যেন একটা আলোকোজ্জ্বল মঞ্চে তাঁর ভূমিকায় দাঁড়িয়ে রয়েছি। ওঁর চেনা লোকেরা আসে আর যায়—। যাঁরা ওঁর বন্ধু ছিলেন, পণ্ডিত, কবি, চিত্রকর, তাঁদের ছায়ামূর্তিরা আসেন আর যান। নীরবে, সাবলীল ভঙ্গীতে রুচিসুন্দর সব উপহার নিয়ে প্রবেশ করেন, আর তাকে ওগুলো দিয়ে চলে যান। ওঁদের সঙ্গে গুড্ম্যান এসেছেন, তাঁর পায়ের চ্যাপ্টা চেটোর ওপর ঐ তো দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তাঁর ঝুটো কলারটা ঝুলে পড়েছে, ওয়েস্ট কোট থেকে বেরিয়ে। ঐ তো ক্লেয়ার, মাথাটা একটু কাৎ করে দাঁড়িয়ে আছেন, আর ওঁর কে একজন কুমারী বন্ধু এসে ওঁকে ধরে নিয়ে গেল। উনি কাঁদছেন। ওঁরা সবাই সেবাস্তিয়ানের চারদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঘুরে বেড়াচ্ছেন আমার চারদিকে। ওঁর ভূমিকায় যে-আমি সেই আমার চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। আর এই মঞ্চের উইংসে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সেই চেনা বাজীকর তাঁর খরগোসটাকে লুকিয়ে নিয়ে।

ঐ বসে রয়েছেন নিনা—টেবিলে, মঞ্চের সবচেয়ে উজ্জ্বল কোণটায়; তাল বা নারকেল ধরনের একটা আঁকা গাছের নীচে। তাঁর সম্মুখে মদের গ্লাস, সেই গ্লাসে রয়েছে সিঁদুর রঙের জল। নানা পোশাকের এই মুখোস নাচ শেষ হয়ে আসছে। টাক মাথা বেঁটে প্রম্পটার বইখানা বন্ধ করে, ধীরে ধীরে নিভে যায় আলো। শেষ, সব শেষ। ওঁরা যে যাঁর দৈনন্দিন জীবনে ফিরে যান (ক্লেয়ার ফেরেন তাঁর ছেড়ে-আসা কবরে) কিন্তু নায়ক থেকে যান, কারণ, যতো চেষ্টাই করিনে কেন, আমার ভূমিকাটা আমি ছাড়তে পারিনে। সেবাস্তিয়ানের মুখোসটা আমার মুখে কামড়ে বসে গেছে। এই মেক্আপটা ধুয়ে উঠিয়ে ফেলা যাবে না। আমিই সেবাস্তিয়ান, সেবাস্তিয়ানই আমি; কিংবা আমরা দুজনেই এমন একজন যাকে আমরা দুজনের কেউই জানিনে।

●

ভ্লাদিমির নাবোকভ

কোন এক সময় হারভার্ডের তুলনামূলক প্রাণী-তত্ত্বের মিউজিয়মের (Harvard Museum of Comparative Zoology) প্রজাপতি বিভাগের কিউরেটর ছিলেন নাবোকভ। প্রত্যেক গ্রীষ্মে নাবোকভ-দম্পতি বেরিয়ে পড়তেন প্রজাপতির সন্ধানে।

তাঁর এই সন্ধান কেবল সীমাবদ্ধ থাকেনি তাঁর কর্মের মধ্যে, তিনি সাহিত্য স্বষ্টির মধ্যেও এই প্রজাপতি-সৌন্দর্য সন্ধান করে ফিরেছেন। তাঁর রচিত সাহিত্য সূক্ষ্মতায়, কোমল মাধুর্যে যথার্থই এক বিস্ময়কর শিল্পকর্ম হয়ে উঠেছে। তিনি জাতিতে রাশিয়ান। জন্ম হয়েছিল তাঁর ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত নেভা নদীর কূলে, চেখভ ও অন্যান্য দিক্‌পাল রুশ সাহিত্য-শিল্পীদের স্মৃতি-বিজড়িত আশ্চর্য সুন্দরী নগরী সেণ্ট পিটার্সবুর্গএ।

নাবোকভ বিপ্লবের ঝড়ে স্বদেশ থেকে ছিন্নমূল হয়ে এলেন ইউরোপে। শিক্ষা করলেন ফরাসী, জার্মান, ইংরেজী ভাষা। রচিত হল তাঁর সাহিত্য—বিভিন্ন ভাষায়। কর্মসূত্রে তিনি দীর্ঘকাল যুক্ত রইলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। বর্তমানে তিনি আমেরিকান যুক্ত রাষ্ট্রের নাগরিক। তাঁর ইংরেজী রচনা বোধ করি ইংরেজী-সাহিত্য-শিল্পের মধুরতম নিদর্শন। তাঁর 'লোলিতা' উপন্যাস বহু বিতর্কিত এবং আলোড়ন স্বষ্টিকারী গ্রন্থ। নাবোকভের রচনার বৈশিষ্ট্য বিষয় বস্তুর গুরুত্বে নয়, শিল্প নির্মিতির মধ্যেই তাঁর সাহিত্য-স্বষ্টির মূল সার্থকতা নিহিত।

দেবব্রত রেজ

[জন্ম : ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দ]

জীবনের গভীর স্রোতে যাঁরা অবগাহন করেছেন, তাঁরা ভাবনার চপল-স্রোতে কখনও ভেসে যেতে চান না। সাহিত্যের দরবারে শ্রীযুক্ত রেজ আজ পর্যন্ত যে ক'টি মাত্র সৃষ্টির সম্ভার সাজিয়ে দিয়েছেন, তাতে গভীর জীবন থেকে তুলে নিয়ে আসা ফসলেরই সন্ধান আমরা পেয়েছি। অগভীর জীবনের খেলাঘরে আমরা কখনও তাঁকে অকারণ-বিচরণ করতে দেখিনি।

পরিশীলিত বুদ্ধি আর জীবন-সন্ধানী দৃষ্টির অধিকারী শ্রীযুক্ত রেজ ছাত্রাবস্থা থেকেই কৃতকীর্তি। শিক্ষা-জীবনে তিনি একাধিকবার প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিলাভ করেছেন। কর্মজীবনে তিনি সরকারী চাকুরী করেছেন দীর্ঘদিন। বর্তমানে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইন্‌স্টিটিউটে বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ অনুবাদের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন।

রুশ, জার্মান, ফরাসী প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় সুপণ্ডিত এই মানুষটি অনুবাদের ক্ষেত্রে যেমন অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন তেমনি তাঁর মৌলিক গ্রন্থগুলিও সাহিত্য-জগতে এক নূতন সম্ভাবনা ও প্রতিশ্রুতির স্বাক্ষর বহন করছে।

আমাদের প্রকাশনায়

।। অনুবাদকের আরও কয়েকখানি গ্রন্থ ।।

দস্তয়েভ্‌স্কি

রচিত

'খোজাইকা'

উপন্যাস-এর বাংলা

অনুবাদ

দেবব্রত রেজ

অনূদিত

বাড়ীউলি

[৪·০০]

গ্রন্থখানি সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত :

…করুণ-মধুর রোমাঞ্চকর কাহিনী। চমৎকার।… [যুগান্তর]

…প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠককে বিচিত্রভাবে আবিষ্ট করে টেনে নিয়ে যায়। প্রত্যেকটি চরিত্র, তাদের কথাবার্তা বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ। রচনার অন্তঃসলিলা চিন্তাস্রোতকে অবিকল ও অবিকৃত রেখে অনুবাদ করা বিশেষ কৃতিত্বের ও রস-গ্রাহিতার পরিচায়ক। শ্রীযুক্ত রেজের এই অনবদ্য অনুবাদের জন্য তাঁকে অভিনন্দন না জানালে মনের দীনতার পরিচয়ই দেওয়া হবে।…[দৈনিক বসুমতী]

…'বাড়ীউলি' 'দস্তয়েভ্‌স্কি'র 'খোজাইকা'র অনুবাদ। একটি জটিল সম্পর্ক, যে জটিল সম্পর্কে মানুষের আত্মাকে প্রভাবিত করে, তেমনি একটি সম্পর্ক-বিচারই দস্তয়েভ্‌স্কির এই উপন্যাসের উপজীব্য। অনুবাদকের দায়িত্ব রীতিমত কঠিন, শ্রীরেজ সে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছেন।… [আনন্দবাজার]

দেবব্রত রেজ

প্রাণ-পাথেয়

(উপন্যাস)

[৭·৫০]

গ্রন্থখানি সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত :

···উপন্যাসখানি অসামান্য। এর মধ্যে লেখকের যে মনীষা ও মননশীলতার পরিচয় পাওয়া গেল তার তুলনা বাংলা উপন্যাসে আধুনিক কালে কদাচিৎ চোখে পড়ে। লেখকের ভাষা কাব্য-সুরভিত। 'প্রাণ-পাথেয়' বাংলা সাহিত্যের একখানি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস, এবং লেখকের কাছে বাংলার কথাসাহিত্য অনেক কিছু প্রত্যাশা করতে পারে।··· [শনিবারের চিঠি]

···লেখায় আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়।···[আনন্দবাজার]

...The author, has already made his mark in Bengali literature...He has presented the lively picture of a society where men and women approach life with their own strong desires... [Amrita Bazar]

দেবব্রত রেজ

স্বপ্নলোকের চাবি

(উপন্যাস)

[৩·৫০]

গ্রন্থখানি সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত :

…একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বিরল শ্রেণীর উপন্যাস। কি বিষয়বস্তু, কি ভাষা, কি বর্ণনারীতি—সকল দিক থেকেই ঈদৃশ উপন্যাস সচরাচর খুব কমই দৃষ্ট হয়।…স্বপ্নাবিষ্টের মতই পাঠককে টেনে নিয়ে যায় এই কাহিনী। গ্রন্থখানিকে রুচিসম্মত একটি অভিনব অবদান বলা যায়।… [বসুমতী]

…উপন্যাসখানি সাধারণ উপন্যাসের চেয়ে স্বতন্ত্র। এর কাহিনী গতানুগতিক বা সংলাপধর্মী নয়, বিশ্লেষণমূলক।… [যুগান্তর]

